# আমি সিরাজুল আলম খান

একটি রাজনৈতিক জীবনালেখ্য

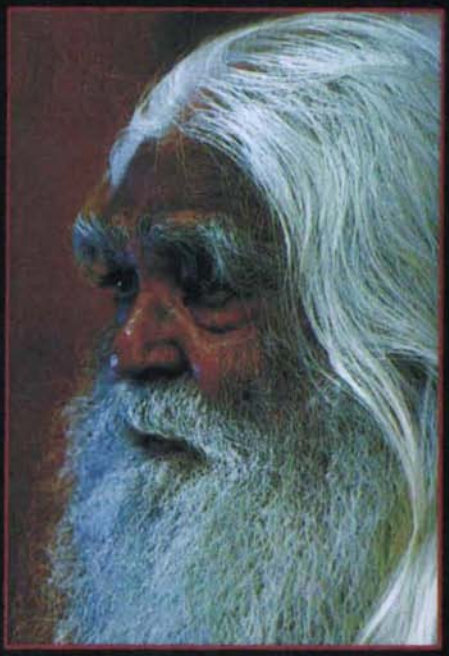

শামসুদ্দিন পেয়ারা

# আমি সিরাজুল আলম খান

## একটি রাজনৈতিক জীবনালেখ্য

শামসুদ্দিন পেয়ারা

মাওলা ব্রাদার্স

প্রকাশনার সাত দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© লেখক

দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ
মার্চ ২০১৯
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৯

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৮০৭৭১ ৯৫৬৮৭৭৩
ই-মেইল : mowlabrothers@gmail.com

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

প্রচ্ছদচিত্র
রফিকুর রহমান

মুদ্রণ
এম বি প্রিন্টার্স
২৮ টিপু সুলতান রোড ওয়ারী ঢাকা ১১০০

দাম
তিনশত আশি টাকা মাত্র

ISBN 978 984 410 123 4

AMI SERAJUL ALAM KHAN : EKTI RAJNOITIK JEEBONALEKHYO (a political memoir) as told to Shamsuddin Peara. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39/1 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Dhruba Esh. Price : Taka Three Hundred and Eighty only.

উৎসর্গ

সেই সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের
যাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে
জীবন বাজি রেখে শত্রুর মোকাবেলা করেছেন

# সূচিপত্র

*ভূমিকা* ৯
*আমার সীমাবদ্ধতা* ১৫

ছাত্রলীগে কেন ও কীভাবে এলাম ২৯
সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন ৩১
আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা ৩৩
নিউক্লিয়াস : স্বাধীন বাংলার শক্তিকেন্দ্র ৩৭
ইপিএলএফ-এর লিফলেট ৪২
কারাজীবন ৫০
ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন ৫২
৬-দফা আন্দোলন ৬১
রাজনৈতিক মেরুকরণ ৬৪
হরতাল পরিচালনা ৭০
স্বাধীনতার প্রস্তুতিপর্ব ৭৯
১১-দফা আন্দোলন ৮৫
'নিউক্লিয়াস' ও ছাত্র যুব-সংস্কৃতিসেবীরা ৯৮
সামরিক শাসন জারি ১০১
শ্রমিকদের মধ্যে কাজ ১০৩
ডাকসু নির্বাচন ১৯৭০ ১০৬
ছাত্রলীগের দুই ধারা ১০৭
জয়বাংলা স্লোগান : পক্ষ-বিপক্ষ ১০৮
জাতীয় পতাকা ১১৫
স্বাধীনতার ইশতেহার এবং জাতীয় সঙ্গীত ১১৮
স্বাধীনতার ইশতেহার : জয়বাংলা ১২১
শ্রমিক লীগ গড়ে তোলা ১২৪
১৯৭০ এর নির্বাচন ও তার পর ১২৯

৭ মার্চের ভাষণ ১৩৬
চরম আর্থিক সংকট ১৪১
১৫-দফা সুপারিশমালা ১৫৪
ছাত্রলীগের দ্বিধা-বিভক্তি ১৫৭
জাসদের আদর্শ ১৬৪
ছাত্রলীগের বিভক্তির মধ্য দিয়ে নতুন রাজনীতির যাত্রা শুরু ১৬৮
বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা ১৭২
জাসদ রাজনীতিতে তাহেরের অন্তর্ভুক্তি ১৭৮
আমার গ্রেপ্তার ও মুক্তি ১৮১

**পরিশিষ্ট**

পরিশিষ্ট : ১ ॥ সিরাজুল আলম খান সম্পর্কে আ স ম রব ১৮৫
পরিশিষ্ট : ২ ॥ প্রশ্নোত্তর : আমেরিকায় শ্যামলিপি শ্যামার সঙ্গে ১৯৮
পরিশিষ্ট : ৩ ॥ প্রশ্নোত্তর : শামসুদ্দিন পেয়ারার সঙ্গে ২১২

## পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আমি সিরাজুল আলম খান : একটি রাজনৈতিক জীবনালেখ্য বইটি প্রকাশের পর প্রথম সংস্করণটির সব কপি দ্রুত বিক্রি হয়ে যায়। পাঠক মহলে এ বইয়ের চাহিদা থাকার কারণে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ জরুরি হয়ে পড়ে।

প্রথম সংস্করণে যে সব ছোটখাট বানান ভুল থেকে গিয়েছিল পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণে সে সবের পরিমার্জনা করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণে যে দু'জনের শ্রমের স্বীকৃতি দিতে ভুল করেছিলাম তারা হলেন মাকসুদাহ ফেরদাউস খান এলিজা ও মুনিয়াহ্ ফেরদাউস খান। এছাড়া সাংবাদিক খোন্দকার আতাউল হকের সহযোগিতার কথাও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

১৯ মার্চ ২০১৯ **শামসুদ্দিন পেয়ারা**

## প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এ বইয়ের মধ্য দিয়ে আমার একটি স্বপ্ন পূরণ হলো। আমার মতো ১৯৬০-'৭০ দশকের 'মুক্তিযুদ্ধ জেনারেশন'-এর কয়েক লক্ষ তরুণের স্বপ্নের সারথী ছিলেন সিরাজুল আলম খান। আমাদের স্বপ্ন ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে মুক্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, যার শুরু ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। মোস্তফা, বাবুল, ওয়াজিউল্লাহর রক্ত সে সময়ের তরুণদের পাকিস্তান

সংক্রান্ত বিভ্রান্তি ঘুচিয়ে দেয়। তারা বুঝতে পারে, পাকিস্তান যুক্তিনির্ভর কোনো মানবিক রাষ্ট্র নয়। যে সাম্প্রদায়িক ঘৃণাকে ভিত্তি করে এর জন্ম, ভারত থেকে আলাদা হয়েও তার সে চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও ঘৃণা নতুন মুখোশ পরে জাতিগত সাম্প্রদায়িকতা ও ঘৃণার রূপ নিয়েছে। এই পাকিস্তানের সঙ্গে একত্রে বসবাস সম্ভব নয়।

এ কথা সবার আগে যাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সে সময়ে জনপ্রিয়তার সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উপরে উঠতে থাকা বাঙালি নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও তরুণ ছাত্রনেতা সিরাজুল আলম খান। শেখ মুজিবের ওপর পাকিস্তান সরকার শুরু থেকে খড়গহস্ত ছিল। ফলে তাঁর পক্ষে সরাসরি এ বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া তিনি যে জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেবার উপযুক্ত হয়ে উঠছিলেন তারা, অর্থাৎ বাংলার মুসলিম জনগণ, তখনও পাকিস্তানের অখণ্ডতার স্বপ্নে বিভোর। শোষণ, নির্যাতন, সামরিক একনায়কত্ব— ইসলামের নামে হলে সেটা তখনও তাদের কাছে 'জায়েজ'! এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ছাত্রসমাজ। তারা ইতোমধ্যে ১৯৫২ সালে একবার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি আদায় করতে গিয়ে পাকিস্তানিদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে। বুঝেছে, এ বর্বর পশুদের কোনক্রমেই 'ভাই' বলে মেনে নেওয়া যায় না।

তারপর ১৯৫৮ সালে এই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গণতন্ত্র হত্যা করে দেশে সামরিক একনায়কত্ব কায়েম করে। বাঙালি বুঝলো, এদের হাতে গণতন্ত্রও নিরাপদ নয়। অতঃপর ১৯৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন। রাজপথে ঝরলো গণতন্ত্র ও ন্যায়নীতির পক্ষে উচ্চকণ্ঠ নিরীহ ছাত্রদের বুকের রক্ত।

একদিকে এই নির্যাতন, অন্যদিকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা পূর্ব বাংলার সম্পদের যথেচ্ছ লুণ্ঠন—দেশের রাজনীতিসচেতন ও মুক্তচিন্তার অধিকারী ছাত্র ও তরুণদের মনে এ ধারণা জন্ম দিতে শুরু করে যে, পূর্ব পাকিস্তান আসলে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ ছাড়া আর কিছু নয়।

এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েমের লক্ষ্যে ছাত্রসমাজকে একমত ও ঐক্যবদ্ধ

করে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য সংগঠিত করে তোলার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন সে সময়কার (১৯৬২-'৬৩) পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল আলম খান। তিনি তাঁর যোগ্য সঙ্গী হিসেবে পান আরও দুই নিবেদিতপ্রাণ ছাত্রলীগ নেতা ও কর্মী আবদুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমেদকে। তিনজনে মিলে গড়ে তুললেন গোপন সংগঠন 'নিউক্লিয়াস' বা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'। উদ্দেশ্য, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে মুক্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েম করা।

সে ছিল এক দুঃসাহসিক ও বিপদসঙ্কুল অভিযাত্রা। চারদিকে পাকিস্তানিদের চর। জনগণ পাকিস্তানের আবহে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। ছাত্ররা পাকিস্তানি শাসনে ক্ষুব্ধ, কিন্তু তারা তাদের এই ক্ষোভকে 'স্বাধীনতা আন্দোলন' পর্যন্ত নিয়ে যাবার কথা তখনও ভাবতে শেখেনি। তাছাড়া, সরকারের পক্ষে পাকিস্তানপন্থী ছাত্রদের একটি বিরাট অংশ তো ছিলই।

এহেন পরিস্থিতিতে, সিরাজ-রাজ্জাক-আরেফের 'স্বাধীন বাংলা 'নিউক্লিয়াস' দেশব্যাপী ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করার এক কঠিন কর্মযজ্ঞে নিজেদের নিয়োজিত করে। সিরাজুল আলম খান ছিলেন এই কর্মযজ্ঞের মূল প্রেরণাদাতা, পথপ্রদর্শক ও সংগঠক। কী করে তিনজনের সেই ক্ষুদ্রাকার 'নিউক্লিয়াস' ক্রমে 'বিএলএফ' ও 'জয়বাংলা বাহিনী'তে পরিণত হয়ে 'মুজিব বাহিনী' তথা 'মুক্তিবাহিনী'তে রূপ নেয়; তার আগে কী করে এ দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক সিরাজুল আলম খানের নিয়ত-সৃজনশীল অথচ দৃশ্যপটে অনুপস্থিত নেতৃত্বের জাদুর কাঠিতে উজ্জীবিত হয়ে ৬-দফা ও ১১-দফা আন্দোলনে ও সশস্ত্র স্বাধীনতাযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়—ঘটনার পেছনের সেই ঘটনাগুলোর বিশদ বর্ণনা রয়েছে এ বইয়ে। বর্ণনা করেছেন ওসব আন্দোলনের মুখ্য কুশীলব সিরাজুল আলম খান নিজেই।

তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৬৬ সালে। যখন আমি চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ঢাকায় ছাত্রলীগ সম্মেলনে প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে আসি। আমার বন্ধু আফতাবের কাছে শুনলাম ছাত্রলীগের যা কিছু বক্তব্য-ঘোষণা, বক্তৃতা-সিদ্ধান্ত—সব তিনিই ঠিক করে দেন। ছাত্রলীগ চলে মূলত তাঁরই প্রত্যক্ষ ও নেপথ্য নির্দেশনায়। তাঁর মূল লক্ষ্য পূর্ব

পাকিস্তানকে স্বাধীন করা। তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন। আর ছাত্রলীগের 'হার্ডকোর' সদস্যদের কাছে তিনি 'ছাত্রলীগের মাও সে-তুং' নামে পরিচিত। তখন মাও সে-তুং-এর যুগ। চারদিকে বিপ্লবীরা স্লোগান দেয় : 'মুক্তি আসে কোন পথে, ব্যালটে না বুলেটে?'—'বুলেটে বুলেটে'।

১৯৬৮ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার অল্প কিছুদিনের মধ্যে ১১-দফা আন্দোলন শুরু হয়। সে আন্দোলনে অংশগ্রহণের সূত্রে আমি তাঁর সান্নিধ্যে আসি। ইকবাল হলের ক্যান্টিনে ও মধ্যরাতে নীলক্ষেতের আনোয়ার হোটেলে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সে সম্পর্ক গাঢ়তর হয়। শুরুতে ছাত্রলীগের একটা-দুটো লিফলেট তিনি আমাকে দিয়ে লেখাতেন। রুমি ভাই (মাসুদ আহমেদ রুমি) তা দেখে দিতেন। তারপর দ্রুত চলে আসে ইয়াহিয়ার মার্শাল ল', ১৯৭০-এর নির্বাচন, ভুট্টো-ইয়াহিয়া-জান্তার ষড়যন্ত্র, আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি, ২৫ মার্চের রক্তস্নাত কাল রাত এবং স্বাধীনতার সশস্ত্র যুদ্ধ। এই সময়গুলোতে আমি সিরাজ ভাইয়ের অমানুষিক পরিশ্রম করার ক্ষমতা এবং কর্মীদের অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করার অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে পরিচিত হই। তাঁর নেতৃত্বেই আমরা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করি। সত্যি কথা বলতে কী, বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীন আহমদ ছাড়া আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের আর কেউ বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পক্ষে দৃঢ়মত ছিলেন না।

দেশ স্বাধীন হবার পর আমরা তাঁর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল' প্রতিষ্ঠা করি এবং বাংলাদেশকে গণতন্ত্র, ন্যায়নীতি ও আইনের শাসনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে লিপ্ত হই। আমাদের সে চেষ্টা শেষাবধি সফল হয়নি। তবে সিরাজুল আলম খানের সমাজ পরিবর্তন ও নতুন সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন থেমে যায়নি। আজও তিনি স্বপ্ন দেখেন সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিত্বময় একটি শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের। তাঁর সে স্বপ্ন ও প্রচেষ্টার কথা এ বইতে লেখা হয়নি। সে কথা অন্য কেউ লিখবেন। এ বইতে ১৯৮১ সালের ১ মে তাঁর কারামুক্তি পর্যন্ত সময়ের ঘটনা ও কার্যাবলি লিপিবদ্ধ আছে।

এই মুখবন্ধটি ছাড়া এ বইতে আমার নিজের লেখা কোনোকিছুই নেই। তিনি বলেছেন, আমি লিপিবদ্ধ করেছি। মুখের ভাষাকে লেখার

ভাষায় রূপ দেবার জন্য ছোটখাটো কোনো শব্দ যোগ বা বাক্যের বিন্যাস করতে হলে, তা করেছি। তার বেশি নয়। বরাবর প্রচারবিমুখ ও মঞ্চের আড়ালে থেকে ঘটনা নিয়ন্ত্রণে দক্ষ সিরাজুল আলম খান নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে আগ্রহী নন। পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে সেটাই দেখে আসছি। কিন্তু এটা যে উচিত নয়, তা আমরা কখনও তাঁকে বোঝাতে পারিনি। ১৯৮২ সালের শেষের দিকে প্রধানত আমার উদ্যোগে আফতাব উদ্দিন আহমদ, একরামুল হক, রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাক, রায়হান ফিরদাউস মধু, বদিউল আলম, মোশারফ হোসেন, মিয়া মোশতাকসহ আমরা কয়েকজন সিরাজ ভাইয়ের কাছে যাই একটি আত্মজীবনী লেখার ব্যাপারে তাঁকে রাজি করাতে। ঠিক করলাম তিনি বলবেন, আমি লিখবো। তিনি রাজি হলেন না। বললেন, সব কথা বলার সময় এখনও আসেনি। আমরা বললাম, ঠিক আছে আপনি বলুন, আমরা লিখে রাখি। যখন সময় হবে বলে মনে করবেন, তখন প্রকাশ করা হবে। এতেও তিনি রাজি হলেন না। এর মধ্যে অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে। একরাম ও আফতাব আজ পরলোকে। আমাদেরও সময় প্রায় শেষ। এ ব্যাপারে সবার আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসে। তবে সবাই ছেড়ে দিলেও আমি হাল ছাড়ি নি। কিছুদিন পরপরই তাঁকে তাড়া দিতাম, দাদা রাজনৈতিক স্মৃতিচারণের কী হলো?

এর মধ্যে একবার তিনি বেশ কঠিন অসুখে পড়লেন। আমি অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে গিয়ে তাঁকে ধরলাম। এবারে তিনি যেন একটু নরম হলেন। আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি কিছু প্রশ্ন আপনাকে দেবো। আপনি মুখে মুখে তার উত্তর দিবেন। আমি টুকে নেবো। সেটাই বই হয়ে বের হবে। এতে তিনি রাজি হলেন। কয়েক রাত জেগে প্রায় একশত প্রশ্ন তৈরি করে তাঁকে দিলাম। বললেন, দেখি। কয়েকদিন পর গেলাম। এর মধ্যে তিনি মত পাল্টেছেন। এই ফর্ম্যাটে তিনি রাজি নন। হতাশ হয়ে ফিরলাম, কিন্তু হাল ছাড়লাম না।

২০১৭ সালে তিনি হিপ-বোন রিপ্লেসমেন্ট করিয়ে দেশে ফেরার পর আবারও তাঁর কাছে গেলাম। বললাম, এবার কী বলার সময় হয়েছে? দয়া করে বইটি কী লিখবেন? তিনি হেসে উত্তর দিলেন, 'লিখবো। কোনদিন আসবে বলো?' আমি বললাম, 'এক্ষুণি। এ মুহূর্ত থেকে।' ৬ এপ্রিল ২০১৮ থেকে আমি তাঁর বক্তব্যের নোট নিতে শুরু

করলাম। প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা করে। ২১ দিন পর, ২৬ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে নোট নেওয়া শেষ হলো।

এই বই সিরাজুল আলম খানের আত্মজীবনী নয়। বাংলাদেশের একটা বিশেষ সময়ের (১৯৬২-১৯৭৫) রাজনীতিকে তিনি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন তার ধারাবর্ণনা। অনেক বিষয় আমি ইচ্ছে করে তাঁকে জিজ্ঞেস করিনি। তিনিও ইচ্ছে করেই অনেক বিষয় এড়িয়ে গেছেন বা বলেননি। যাঁরা সে সময়ের রাজনীতি সম্পর্কে জানতে চান, তাঁদের জন্য সিরাজুল আলম খানের এই রাজনৈতিক আত্মকথন ইতিহাসের এক বদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করে দেবে, যা দিয়ে এমন সব বিচিত্র বর্ণচ্ছটা দৃশ্যমান হবে যা এর আগে কখনও হয়নি। আজকের তরুণদের জন্য এটা বাংলাদেশের সবচেয়ে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্যবহুল রাজনৈতিক ইতিহাস। এ বই আমাদের অতীত-পর্যবেক্ষণের দূরবীণ। পাঠক এ বইয়ের প্রতি পাতায় বাংলাদেশের অঙ্কুরোদ্গম দেখতে পাবেন।

কাজটি শেষ করার পর আমার অনুজপ্রতিম বন্ধু ও কৃতী সাংবাদিক স্বপন দাশগুপ্তকে বলতে সে বললো, মাওলা ব্রাদার্স-এর স্বত্বাধিকারী আহমেদ মাহমুদুল হকের সঙ্গে তার হৃদ্যতা আছে। তিনি হয়তো বইটি ছাপাতে রাজি হবেন। সে একদিন আমাকে বাংলাবাজারে মাওলা ব্রাদার্স-এ নিয়ে গেল। আহমেদ মাহমুদুল হক বইটি ছাপতে রাজি হলেন।

পুরো পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ ও সম্পাদনা করে কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন অধ্যাপক মোরশেদ শফিউল হাসান। ড. মোরশেদ আমার ছোট ভাইয়ের বন্ধু, আমারও অত্যন্ত স্নেহভাজন, ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে অস্বস্তিতে ফেলতে চাই না।

কম্পোজ, সম্পাদনা ও প্রুফ কারেকশনের নানা রোডব্লক পেরিয়ে অবশেষে বইটি যে দিনের আলো দেখতে পেলো তা সম্ভব হয়েছে স্বপন দাশগুপ্ত ও আহমেদ মাহমুদুল হকের কারণে। দুজনের প্রতিই আমি কৃতজ্ঞ।

ফেব্রুয়ারি ২০১৯ **শামসুদ্দিন পেয়ারা**

# আমার সীমাবদ্ধতা

আমার সঙ্গে শামসুদ্দিন পেয়ারার যেটুকু কথোপকথন, তা থেকে বড় আকারের (২০০ পৃষ্টার বেশি) একটি বই হবে, সেটা আমার ধারণায় ছিল না।

স্কুল জীবনের কথা বাদ দিলেও কলেজ জীবন থেকে রাজনীতিতে আমার চলাফেরা শুরু। এ চলাফেরার প্রথমদিকে আমি কল্পনাও করিনি আমাকে বড় ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে হবে। শৈশব-কৈশোরে আমার বাবার কাছ থেকে যেসব কথাবার্তা শুনেছি সেটাই রাজনীতিতে আমার জড়িত হওয়ার প্রধান কারণ। সেসব কথা প্রাথমিকভাবে আমার রাজনৈতিক জীবন গড়ে উঠতে কিছুটা হলেও সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। ছোটবেলায় বাবার কাছে শেখা 'ডিসিপ্লিন' জিনিসটা আমার পুরো জীবনকে প্রভাবিত করেছে প্রবলভাবে।

স্কুল জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারি পালন উপলক্ষে আমাকে ও আমার বড় ভাইকে প্রভাত ফেরীর দুই সারির সম্মুখভাগে থাকতে হতো। কলেজের নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের পছন্দ অনুযায়ী এটা করা হতো। কী কারণে খুলনা জেলা স্কুল ও ঢাকা কলেজের ছাত্রাবস্থায় একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাত ফেরীর সময় গান গাওয়ার জন্য সিনিয়ররা আমাকে দায়িত্ব দিতেন, সেটা আমি অনেক পরে বুঝেছি।

১৯৫৮ সালে আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখনই আইয়ুব খানের মার্শাল ল' জারি হয়। ১৯৫৯ সালে সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার পর

লম্বা ছুটিতে আমি দিল্লি বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমার বয়স তখন আঠার। ১৪ আগস্ট দিল্লিতে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে নিজেকে খুবই অসহায় মনে হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান নামের একটি প্রদেশের নাগরিক হওয়াটা যে কতো অসম্মানের বা অপমানজনক, সেদিন তা বুঝতে পেরেছিলাম।

চিন্তার জগতে আমাকে 'স্বাধীনতা' বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করেছিল তৎকালীন আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রাম, কিউবার বিপ্লবী আন্দোলন, ভিয়েতনামে আমেরিকার বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের লড়াই এবং ইন্দোনেশিয়াসহ পৃথিবীর নানা দেশে নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলন-সংগ্রাম। এসব ঘটনার প্রেক্ষাপটে 'পূর্ব বাংলা'র (পূর্ব পাকিস্তান) 'স্বাধীনতা'র বিষয়টি এক সময় আমার মাথায় ঢুকে পড়ে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর 'ভারতীয় বাঙালি' ও 'পাকিস্তানি বাঙালি' অথবা 'হিন্দু বাঙালি' ও 'মুসলমান বাঙালি'–বাঙালি জাতিসত্তার এই খণ্ডিত পরিচয়কেই অনেকে তার চূড়ান্ত বা শেষ পরিচয় বলে ধরে নিয়েছিল। উপমহাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক জগৎ এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের গবেষকদের মনেও এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। বাঙালি যে আবার কোনোদিন নিজ পরিচয়ে পৃথিবীর বুকে অবস্থান করে নিতে পারে এটি ছিল তাদের কাছে কল্পনাতীত ব্যাপার। যদিও রবীন্দ্রনাথ, লালন শাহ্, শরৎচন্দ্র, নজরুলসহ অনেক মনীষী-লেখক-কবি তাঁদের দর্শন ও সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে বাঙালির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেছিলেন। ১৯৩৪ সালে বিহার প্রদেশে অনুষ্ঠিত 'প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন'-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ ভারতের অংশ হলেও কার্যত বাংলা ও বাঙালি সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন দেশ এবং ভিন্ন সংস্কৃতির অধিকারী।' এর পরেও বহুকাল বাঙালিকে তার জাতিসত্তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তার সূচনা হয়েছে।

১৯৬২ সাল। আমার বয়স তখন ২১ বছর। ঘটনাক্রমে একদিন আমি, আবদুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমেদ একসঙ্গে কথাবার্তার বলার সময় 'স্বাধীনতা'র প্রসঙ্গটি আমাদের আলোচনায় আসে। এভাবে অভিজ্ঞতা ছাড়া শুধুমাত্র তারুণ্যের স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষাকে সম্বল করে শুরু

৪৭। স্বাধীনতার জন্য আমাদের পথচলা। আমরা দশ বছরের মধ্যে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করবো এ সংকল্প নিয়ে কাজ শুরু করি। কিন্তু নয় বছরের মাথায়ই ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। আমাদের এ নয় বছরের পথপরিক্রমাকে আজকের হিসেবে মনে হবে কয়েক যুগ।

'নিউক্লিয়াস' (স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ) নামক একটি সংগঠনের মাধ্যমে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। সে সময় আমার, রাজ্জাকের ও আরেফের বয়স ছিল যথাক্রমে ২১, ২০, ১৯। 'নিউক্লিয়াস'-এর রাজনৈতিক উইং হিসেবে আমরা 'বিএলএফ' (বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স) গঠন করি। পরবর্তীতে শেখ ফজলুল হক মনি ও তোফায়েল আহমেদ বিএলএফ-এ যুক্ত হন। কাজী আরেফ আহমেদ ছিলেন বিএলএফ-এর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলে 'নিউক্লিয়াস'-এর এই রাজনৈতিক উইং 'বিএলএফ' এবং সামরিক উইং 'জয়বাংলা বাহিনী'। 'বিএলএফ'-এর সদস্যসংখ্যা ছিল তখন ৭ হাজারের মতো।

'নিউক্লিয়াস', 'বিএলএফ' ও 'জয়বাংলা বাহিনী' গঠনের মাধ্যমে আমরা ছাত্র-যুবকদের মধ্যে স্বাধীনতার লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রামের মন-মানসিকতা গড়ে তুললাম। আমাদের সেই প্রয়াস-প্রস্তুতি ও চলমান ঘটনাবলির পাশ কাটিয়ে আমাদের দেশের একচোখা বুদ্ধিজীবীরা ৭১-এর ২৫ মার্চের আগের দিনও বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে পেলেন না। এটা আমাদের জন্য এক লজ্জাকর কাহিনি।

শুধু বুদ্ধিজীবীরাই নন, আওয়ামী লীগসহ এদেশের ছোট-বড় কোনো রাজনৈতিক দলই মার্চ মাসের আগে স্বাধীনতার বিষয়টিকে সমর্থন করেনি; এমনকি তাদের রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যেও 'স্বাধীনতা' বিষয়টি ছিল না। তবে এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবস্থানটি ছিল একেবারেই ভিন্ন। ১৯৬৯ সালে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' থেকে মুক্তি লাভের পরই বঙ্গবন্ধুকে 'নিউক্লিয়াস' ও 'বিএলএফ' সম্পর্কে অবহিত করা হয়। তখন থেকে তিনি স্বাধীনতার প্রশ্নে শুধু আপোসহীনই ছিলেন না, 'নিউক্লিয়াস' ও 'বিএলএফ'র কর্মকাণ্ড সমর্থন করতেন এবং আমাদের যে কোনো পদক্ষেপে উৎসাহ যোগাতেন।

এখানে স্পষ্টভাবেই বলা প্রয়োজন, দলগতভাবে আওয়ামী লীগ 'স্বাধীনতা'র বিষয়টিকে সমর্থন করেনি। এমনকি বঙ্গবন্ধুও ১৯৬৯ সালের আগে 'নিউক্লিয়াস' ও 'বিএলএফ'-এর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে জানতেন না। প্রথমদিকে আওয়ামী লীগ স্লোগান হিসেবে 'জয়বাংলা'র বিরোধিতা করলেও বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্ব ও অবস্থান এবং 'নিউক্লিয়াস' ও 'বিএলএফ'-এর প্রচণ্ড চাপ ও সাংগঠনিক ক্ষমতার কারণে 'জয়বাংলা' স্লোগানকে তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়। এই 'জয়বাংলা' স্লোগানই স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে জনগণের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণের প্রধান সহায়ক হয়েছিল। জেলা ও মহকুমা (বর্তমানে জেলা) পর্যায়ে আওয়ামী লীগের দু'-একজন 'নিউক্লিয়াস'কে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন। অন্যান্য দলেরও অনেকে ব্যক্তিগতভাবে 'নিউক্লিয়াস' নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং 'স্বাধীনতা'র বিষয়টি সমর্থন করতেন।

কাজী আরেফ আহমেদ আজ বেঁচে নেই। আবদুর রাজ্জাকও চলে গেছেন। আমরা তিনজন সব বিষয়ে একমত পোষণ করতাম এবং একই পথে হাঁটতাম। ১৯৬২ থেকে ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনো বিষয়ে এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য হয়নি।

এ বইটি মুদ্রণের ঠিক আগে শামসুদ্দিন পেয়ারা একবার হলেও পাণ্ডুলিপিটিতে চোখ বুলাতে বললেন। সে কারণে বইটিতে কী আছে আমি জানতে পারলাম। ৬ জানুয়ারি, ২০১৯-এ আমার বয়স আটাত্তর হয়েছে। শামসুদ্দিন পেয়ারা তার লেখায় আমার জীবনের যে পর্বটি তুলে ধরেছে, তা আমার জীবনের কেবল একাংশ। তবে আমার রাজনৈতিক জীবনের প্রথমভাগের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ তার লেখায় তুলে ধরা হয়েছে। কখনো যদি আমার জীবন নিয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ (আত্মজীবনীমূলক) লেখা হয়, তবে তা হবে একটি অতি প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সাহিত্য।

পাঁচ বছর জেলে থাকার পর ১৯৮১ সালে আমি মুক্তি লাভ করি। জেল থেকে বের হওয়ার পর আমি বুঝতে পারলাম গোটা দেশটাই এক জেলখানায় পরিণত হয়েছে। অন্যরা জেল থেকে মুক্ত হয়ে ভিন্ন জীবন বেছে নেয়; সংসার জীবন শুরু করে; জীবিকা উপার্জনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দু'-চারজন অবশ্য রাজনীতিকেই তাদের 'মূল জীবন' করে তোলে। এরশাদ সাহেবের সামরিক শাসন বহাল থাকার সময়ে

আমি রাজনীতিতে আর শুধুমাত্র 'অ্যাক্টিভিস্ট' হয়ে থাকলাম না। পাঁচ বছরের জেলজীবন আমার চিন্তাজগতে মৌলিক পরিবর্তন আনে, তা আমার রাজনীতির গুণগত পরিবর্তনে সহায়ক হয়। সে সময়ে জেলখানায় আমি প্রতিদিন গড়ে ১৫/১৬ ঘণ্টা পড়াশুনা করতাম। একজন 'অ্যাক্টিভিস্ট' কীভাবে বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক সত্তায় পরিণত হয়, আমি তার এক দৃষ্টান্ত।

১৯৮৫ সালে ড. জিল্লুর রহমান খান-এর সঙ্গে আকস্মিক যোগাযোগ আমাকে নতুন রাজনীতির মানুষ হিসেবে আর্বিভূত হতে সাহায্য করে। সেই সময় থেকে তিনি ও আমি একযোগে কাজ করতে থাকি। এর ফলে গত ৩০/৩৫ বছরে বাংলাদেশের রাজনীতির জগতে নতুন চিন্তার ক্ষেত্র তৈরি হয়। সে বিষয়গুলো শামসুদ্দিন পেয়ারার লেখায় অন্তর্ভুক্ত না হলেও তাঁর এ লেখায় আমার সে বৌদ্ধিক-রাজনৈতিক জীবনের কিছু আভাস পাওয়া যাবে।

জানুয়ারি ২০১৯ **সিরাজুল আলম খান**

১৯৫৯ সাল। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের ছাত্র। সে সময় সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার পর তিন মাসের মতো ছুটি থাকতো। সে ছুটিটা কিভাবে কাটানো যায়, তা নিয়ে সহপাঠী বন্ধুরা এক সাথে মিলে নানান প্ল্যান-প্রোগ্রাম করতো।

আমাদের ব্যাচের এটাই ছিল সবচেয়ে লম্বা ছুটি। এত লম্বা অবকাশ কাটানো ছিল সত্যিই খুব কষ্টকর। আমার বন্ধুরা প্রায় সবাই খণ্ডকালীন চাকুরি করত। আমি ফজলুল হক হলের আবাসিক ছাত্র ছিলাম। ছুটিছাটায় সাধারণত বাড়িতে যেতাম না। তখন ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের একটি লাইব্রেরি ছিল। আমি সেখানে গিয়ে প্রচুর পড়াশুনা করতাম। আমার আরেক বন্ধু মাশুকুর রহমান তোজো, যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ডাবল অনার্স পাওয়া ছাত্র, এ ব্যাপারে আমার সঙ্গী ছিল। আমার এ বন্ধুটি পরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় এবং ১৯৭১-এ সশস্ত্রযুদ্ধের প্রথমদিকেই মারা যায়।

আমি ইংরেজিতে দুর্বল ছিলাম। এই দুর্বলতার কথা মনে রেখে সব সময় চেষ্টা করতাম কী করে ভালো ইংরেজি শেখা যায়। তখন ঢাকায় প্রেসক্লাবের ঠিক সামনে, রাস্তার অপর পারে, ছিল মার্কিন তথ্যকেন্দ্র। তবে ফুলার রোডে অবস্থিত ব্রিটিশ কাউন্সিলের মতো তার অত শানশওকত ছিল না। আমি দু জায়গায়ই ইংরেজি বই ও পত্রিকা পড়তে যেতাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের লম্বা ছুটিতে বেশির ভাগ ছাত্রই গ্রামের বাড়ি চলে যেত। সে সময় হল প্রায় খালি হয়ে যায়। ডাইনিং হল চালু থাকে না। ফলে খাওয়া-দাওয়ার প্রাইভেট ব্যবস্থা করতে হতো। ছাত্ররাই সেটা

করতো। সেবার ছুটিতে আমি ও আমার সেই বন্ধু মিলে ঠিক করলাম আমরা গ্রামের বাড়িতে যাব না, দিল্লি বেড়াতে যাবো।

আমার দিল্লি ভ্রমণের ইচ্ছার পেছনে একটা বড় কারণ ছিল আমার ছোট চাচা ফিরোজ আলম খান তখন নয়াদিল্লির পাকিস্তান হাই কমিশনে কমার্শিয়াল শাখার সেকশন অফিসার ছিলেন।

আমার সেই চাচাকে একটা চিঠি লিখলাম। তিনি যদিও আমার চাইতে দশ-বারো বছরের বড় ছিলেন, কিন্তু পিতৃকূলে বয়োকনিষ্ঠ বলে তাঁর সাথে আমার শিশুকাল থেকেই একটা সখ্য গড়ে উঠেছিল।

চিঠির উত্তর এসে গেল দ্রুত। ছোট চাচা জানালেন, আমার দিল্লি ভ্রমণের আগ্রহের কথা জেনে তিনি খুবই আনন্দিত। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি কূটনৈতিক চ্যানেলে আমার কাছে ভিসার আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিলেন। মাঝে আমাদের মধ্যে দু'তিনবার চিঠির আদান-প্রদানও হলো।

চাচার কাছ থেকে ভিসার আবেদনপত্র পেলাম ঠিকই। কিন্তু ভিসার আবেদন করার আগে তো পাসপোর্ট করাতে হবে। পাসপোর্ট করতে লাগবে সত্তর থেকে একশত টাকা। আমার কাছে আছে মাত্র চল্লিশ টাকা। বাবাকে আশি টাকা পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখলাম।

আমার বাবা ছিলেন একজন উচ্চশিক্ষিত ও বোদ্ধা মানুষ। ১৯৫৯ সালে তিনি শিক্ষা বিভাগের ডিডিপিআই হিসেবে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বাবা মানিঅর্ডার করে আশি টাকা পাঠিয়ে দিলেন। পকেটের চল্লিশ আর বাবার পাঠানো আশি মিলে হলো মোট একশত বিশ টাকা। এখন নিশ্চিন্তে পাসপোর্টের আবেদন করা যায়।

কিন্তু যা ভেবেছিলাম পরিস্থিতি ঠিক ততটা সহজ ছিল না। পাসপোর্ট অফিসে তখন অবাঙালিদের একচেটিয়া প্রতাপ। উর্দুভাষী নিরাপত্তারক্ষী আমাকে পাসপোর্টে অফিসে ঢুকতেই দিল না। বললো, পাসপোর্ট অফিসার ছুটিতে। কখন ফিরবেন তার জানা নাই। হতাশ হয়ে ফিরলাম। এভাবে পরপর কয়েকদিন পাসপোর্ট অফিসে যাতায়াত করলাম, প্রতিদিনই হতাশা নিয়ে ফিরে আসি। একদিন সেখানে এক ভদ্রলোকের সাথে দেখা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি খোরশেদ আলম খানের ছেলে?

আমি ইতিবাচক উত্তর দেয়ার পর তিনি জানালেন সম্পর্কে তিনি আমার মামা হন। বললেন, একজন বাঙালির জন্য পাসপোর্ট পাওয়া

খুবই কঠিন। হয়তো দেবেই না। পুলিশ ভেরিফিকেশন লাগবে। হয়তো সেখানেই আটকে দেবে।

আমার এই মামা তখন পাসপোর্ট অফিসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। তিনি আমাকে তাঁর আজিমপুরের বাসায় ডেকে নিয়ে কী করে পাসপোর্ট পাওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে পরামর্শ দিলেন। বললেন, পাসপোর্টের আবেদনে লিখতে হবে দিল্লির পাকিস্তান হাইকমিশনে কর্মরত পিতৃব্য অত্যন্ত অসুস্থ। তাঁকে দেখতে যাওয়া জরুরি। বাকিটুকু তিনি দেখবেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী পাসপোর্টের আবেদন করলাম। তিনি উদ্যোগ নিয়ে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পাসপোর্ট করিয়ে দিলেন। এরপর ভিসার আবেদন। সেখানেও লোকে লোকারণ্য। লাইনে শত শত মানুষ। বুঝলাম, এভাবে করতে গেলে দিল্লি যাবার আগেই আমার ছুটি ফুরিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে আমি বুঝে ফেলেছি পাকিস্তানিদের সাথে কী ধরনের আচরণ করতে হয়।

আমি লাইন বাদ দিয়ে সরাসরি ভিসা অফিসারের কক্ষে ঢুকতে গেলাম। অবাঙালি গার্ড তেড়ে আসলো। আমি আরও জোরে তেড়ে গেলাম। তারপর বচসা। হুলুস্থুল। অফিসারের আগমন। এসবই ঘটে গেল খুব দ্রুত। ভিসা অফিসার আমাকে তাঁর কক্ষে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমি বললাম, আমার জরুরি ভিত্তিতে ভিসা দরকার। অফিসার ব্যাপারটা বুঝলেন। আমাকে দুপুরের খাবার খাওয়ালেন এবং সেদিনই ভিসা দিয়ে দিলেন।

তখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ট্রেনে চড়ে ভারতের যে কোনো জায়গায় যাওয়া যেত। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল।

ট্রেনে ঢাকা-দিল্লি ভাড়া ২৮ টাকা ১২ আনা। গোয়ালন্দ থেকে ট্রেন গিয়ে থামলো শেয়ালদা। প্ল্যাটফর্মে নেমেই বুঝলাম ভারতীয়রা আমাদের উপস্থিতি পছন্দ করে না। চোখেমুখে বিরক্তি। তখন অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক ছিল। মাত্র কয়েক বছর আগে দেশ ভাগ হয়েছে। ভারত বিভাগের রূঢ় বাস্তবতা ভারতীয়রা তখনো মেনে নিতে পারেনি।

হাওড়া থেকে দিল্লি। ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড়। পৌঁছাতে দুই দিনের বেশি লেগে গেল। দিল্লিতে নেমে অনেকটা স্বস্তি পেলাম। ছোট চাচার বাসা খুঁজে পেতে কোনো কষ্ট হলো না। দিল্লি শহর ট্যাক্সি ড্রাইভার সিং

জি'র নখদর্পণে। তাছাড়া চাচার বাসাটা ছিল দিল্লির বেশ একটা সম্ভ্রান্ত এলাকায়। যেখানে বাড়িঘরগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো।

দিল্লি পৌঁছানোটাই আমার কাছে খুব উদ্দীপক মনে হলো। পরের দিন থেকে দিল্লির নানা জায়গা ঘুরে দেখতে শুরু করলাম। দিল্লিতে দুই মাস চৌদ্দ দিন ছিলাম। এ সময়ে ১৪ আগস্ট চাচা আমাকে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে নিয়ে যান। এ কে ব্রোহি দিল্লিতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত। পাকিস্তানে সে সময় সামরিক শাসন চলছে। অনুষ্ঠানে গিয়ে আমার জায়গা হলো কয়েকশত গজ পেছনে। সারিবদ্ধভাবে লাইনে সবাই দাঁড়ানো। আমার নিজস্ব অভ্যাসের কারণে আমি সামনে যেতে চাইলাম। পারলাম না। চাচা বললেন, সামনে বড় অফিসারদের জায়গা। তোমাকে ওখানে যেতে দেবে না। অনুষ্ঠান শেষে ফিরে আসছি, চাচাকে বললাম, আমরা এত পেছনে কেন? তিনি বললেন, সামনে বসতে হলে বড় অফিসার হতে হবে। বিষয়টা বুঝেও গ্রহণ করতে পারলাম না।

এদিকে সারাদিন দিল্লি ঘুরছি। বড় বড় রাস্তা। বিরাট দোকানপাট। লালকেল্লা, জামে মসজিদ, কুতুবমিনার। আগ্রা গেলাম। তাজমহল দেখলাম। এমনি আরো অনেক বড় বড় দালানকোঠা। পুরোনো আমলের প্রাসাদের ভগ্নাংশ। দেখলাম রাষ্ট্রপতি ভবন, অবিশ্বাস্য রকমের বড়। চাচাদের রোববার ছুটির দিন। সেদিন আমার সঙ্গে গল্পগুজব হয়। জিজ্ঞেস করতেন, কোথায় কোথায় গিয়েছি. কী কী করেছি। বলতাম। এখানে সবকিছু এত বড় বড়, অথচ ঢাকায় তেমন কিছুই নাই। বায়তুল মোকাররম তখনও হয়নি। ঢাকায় রাস্তাঘাট দোকানপাট যা আছে দিল্লির তুলনায় তা আমার কাছে মামুলি মনে হলো। এক রোববারে আলাপের সময় চাচাকে বললাম, আমাদের ঢাকায় তো কিছুই নাই। চাচা বললেন, ঢাকায় নাই, কিন্তু করাচিতে আছে। করাচি তখন পাকিস্তানের রাজধানী। আরো বললেন, রাজধানী না হলে বড় কিছু হয় না। আমরা তো প্রদেশ। সে কারণে আমাদের বড় কিছু নাই।

এরপর মনে হয় আট-দশদিন ছিলাম দিল্লিতে। সে কয়দিন আর ঘর থেকে বের হইনি। দিল্লিতে ঐ সময়ে ভাল ভাল সিনেমা দেখেছি। বড় বড় সিনেমা হল। 'মুঘল-ই-আজম' ছবিটি প্রথম দেখি দিল্লিতে।

পালামার রিলিজ হয়েছে। ওখানকার সিনেমা হলগুলো খুবই জাঁকজমকপূর্ণ। আমাদের একমাত্র আধুনিক গুলিস্তান হল তখন কেবল তৈরি হচ্ছে। বাকিগুলো ছিল স্রেফ গুদাম ঘর।

আমি নোয়াখালীর মিডল ইংলিশ (এমই) স্কুল থেকে প্রাইমারী পাশ করি। এরপর নোয়াখালী বেগমগঞ্জ হাই স্কুলে দুই বছর লেখাপড়া করি। ম্যাট্রিক পাশ করি খুলনা জিলা স্কুল থেকে ১৯৫৬ সালে। আমি পূর্ব পাকিস্তান স্কুল শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মেট্রিকুলেশান পরীক্ষা দেওয়া শেষ ব্যাচের ছাত্র। ১৯৫৬ সালেই ঢাকা কলেজে ভর্তি হই। ছাত্র হিসেবে আমি খুব মেধাবী ছিলাম। ভাবতাম মেট্রিকে প্রথম স্থান অধিকার করব। শিক্ষকরাও তাই মনে করতেন। পরীক্ষার ফলাফল বের হবার পর দেখলাম আমার স্থান দশের মধ্যেও নেই। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম আমার স্থান ছিল ১৮তম।

জীবনে প্রথম একটা বড় রকমের ধাক্কা খেলাম। ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে দুই বছরের মাথায় ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। বাবা-মায়ের ইচ্ছা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হই। কিন্তু আমি তো তা হব না। যেহেতু সায়েন্সের ছাত্র, ঠিক করলাম এমন সাবজেক্ট নেব যাতে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করতে হয় না। অর্থাৎ হাতে আমার অফুরন্ত সময় থাকতে হবে। অতএব গণিত বিষয়টিকেই বেছে নিলাম।

দিল্লি থেকে ফিরে এসে কিছুতে মন বসাতে পারতাম না। একটা চিন্তা আমাকে সারাক্ষণ পীড়িত করতো। সেটা হলো, কেন আমাদের কোনো কিছুই বড় নয়। প্রশ্নটা সারাক্ষণ আমার মাথায় ঘুরতো। খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা, লাইব্রেরিতে পড়াশুনা, সবটাতেই অনাগ্রহ শুরু হলো। আমি থাকতাম ফজলুল হক (এফএইচ) হলের ইস্ট ব্লকের ২০৪ নম্বর কক্ষে। একই রুমে থাকতেন সে সময়কার পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আজহার আলী ও দফতর সম্পাদক সৈয়দ রেজা কাদের চৌধুরী। আমার অন্যমনস্কতা তাদের চোখে পড়ে। জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে পারতাম না। রেজা কাদের ভাই জানার চেষ্টা করতেন। এক সময় আমার মনের অবস্থাটা তাঁকে খুলে বললাম। উনি আমাকে প্রায় প্রতিদিনই তাঁর সাথে রমনা পার্কে নিয়ে

যেতেন এবং বোঝাতে চেষ্টা করতেন কেন আমাদের কোনো কিছু বড় নয়। বড় কিছু থাকতে হলে স্বাধীন দেশের প্রয়োজন। আমরা তো প্রদেশ।

তখন দেশে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন চলছে। রেজা কাদের ভাই এক রোজায় আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রদের এক ইফতার পার্টিতে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি, কিসের ইফতার পার্টি? রীতিমত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলন। সামরিক শাসকদের চোখ এড়াবার জন্য ইফতারের নাম করে ছাত্রলীগের নেতা ও সিনিয়র কর্মীরা একত্রিত হয়েছে। রেজা কাদের ভাই ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে আমার নাম ঢুকিয়ে দিলেন। সেবার সভাপতি হলেন শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মনি। হলে ফেরার পথে কাদের ভাই কেন তিনি ছাত্রলীগ সেন্ট্রাল কমিটিতে আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন তা ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, তুমি একজন সচেতন তরুণ। তোমার মতো ছেলের পার্টিতে খুব প্রয়োজন।

এবারে একটু পেছনের কথায় আসি। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হবার আগের দুই বছর আমার কেটেছে ঢাকা কলেজে। থাকতাম হোস্টেলে। সে হোস্টেলের নাম ছিল বেশ বাহারী—'বান্ধবকুটির'। আমার কক্ষ নম্বর ছিল সাত। তখনকার দিনে *পাকিস্তান অবজারভার*, দৈনিক *আজাদ*, দৈনিক *ইত্তেফাক*, দৈনিক *সংবাদ* এগুলোই ছিল প্রথম শ্রেণির দৈনিক। আমি নিয়মিত সব পেপারই পড়তাম। সে সময়ের দুনিয়া কাঁপানো রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ আমি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে লক্ষ করতাম। যেমন ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কিউবার মুক্তি সংগ্রাম, আহমদ বেন বেল্লাহর নেতৃত্বে আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রাম, ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনের মুক্তি আন্দোলন এবং হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামের সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম। এছাড়া কঙ্গোর প্যাট্রিস লুমুম্বা, কেনিয়ার জোমো কেনিয়াত্তা, তানজানিয়ার জুলিয়াস নায়ারেরে প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য নেতা এবং তাঁদের উপনিবেশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াই আমাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে।

১৯৫৬ সালে সুয়েজ খালের ওপর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়ে মিসরের সাথে যুক্তরাজ্য-ফ্রান্সের যুদ্ধ হয়েছিল। আমি হোস্টেলের রেডিওতে কান লাগিয়ে সে সংবাদ আগ্রহের সাথে শুনতাম।

ছোটবেলায় বাবা আমাদের একবার চট্টগ্রাম নিয়ে যান। তিনি তখন সেখানে স্কুল ইন্সপেক্টর। প্রতি রোববার বাবা আমাদের নিয়ে বেড়াতে বের হতেন। একদিন তিনি আমাদের পাহাড়ের দিকে নিয়ে গেলেন। সেদিন সারা পথ তিনি আমাকে সূর্য সেনের গল্প বললেন। জীবনে সেই প্রথম আমি একজন বিপ্লবীর জীবন ইতিহাস শুনলাম। বয়স তখন আমার মাত্র সাত বছর। আরেকদিন বাবা আমাদের সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেলেন। সিনেমার নাম 'চন্দ্রলেখা'। বাবা এ.কে ফজলুল হক সাহেবকে খুব পছন্দ করতেন। ১৯৫৪ সাল, বাবা তখন ময়মনসিংহে জেলা স্কুল ইন্সপেক্টর। চারদিকে জোর নির্বাচনী তোড়জোড় চলছে। একদিন বাবা বললেন, 'নদীর পাড়ে হক সাহেবের মিটিং হচ্ছে, যাও শুনে আস।' আমি ও আমার ভাই শফিকুল আলম খান দুজনই রওয়ানা হলাম। কিন্তু মিটিংয়ে যাবার পথে দেখলাম এক মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছে। আমি ভাবলাম, একটু খেলা দেখে নিই। খেলা দেখতে দেখতে এমনই মজে গেলাম যে জনসভায় যাওয়ার কথা আর আমার মনে থাকলো না। বড় ভাই কিন্তু ঠিকই জনসভায় গেলেন, বক্তৃতা শুনলেন এবং ফেরার পথে খেলার মাঠে আমাকে পেয়ে বললেন, 'তুমি যে মিটিংয়ে না গিয়ে ফুটবল খেলা দেখেছ, সেটা আমি আব্বাকে বলে দেব।' খেলা শেষে আমি একটু ভয়ই পেলাম। আব্বা কী করতে বললেন, আর আমি কী করলাম! তাৎক্ষণিকভাবে মাথা খাটিয়ে একটা উপায় বের করলাম। বক্তৃতা শুনিনি, কিন্তু যে মাঠে বক্তৃতা হয়েছে সেটা তো দেখে আসি। তাহলে অন্তত মাঠটার বর্ণনা দিতে পারব। আমি হাঁটতে লাগলাম। একটা মাঠে বহু লোক দেখে বুঝলাম এখানেই সভা হয়েছে। আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা গাড়ির চারপাশে বেশ ভিড়। কে একজন বললেন, 'তুমি কি চাও?' বললাম, 'শের-এ-বাংলাকে দেখব।' তিনি জিপে বসা মানুষটাকে বললেন, 'স্যার, একটা বাচ্চা ছেলে আপনাকে দেখতে চায়।' গাড়ি ঘিরে তখনও অনেক লোক। আমি কাছে যেতেই গাড়ি থেকে একজন হাত বাড়িয়ে দিলেন। নরম তুলতুলে হাত। আমি

দেখতে খুবই ছোট ছিলাম। আমাকে দুই হাতে উপরের দিকে উঠিয়ে তিনি বললেন, 'এরাই আমাদের ভবিষ্যৎ।' বুঝলাম, ইনিই হলেন শের-এ-বাংলা।

সেদিন আমি এক ধরনের ঘোরের মধ্যে হেঁটে হেঁটে বাসায় ফিরলাম। বড় ভাই সেদিন বাবার কাছে কোনো অভিযোগ করেনি। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার দেরি কেন?' আমি ঘটনা খুলে বললাম। বাবা বললেন, 'এই মানুষটি অনেক বড় একজন মানুষ। তোমাকেও ওনার মতো হতে হবে।' প্রসঙ্গক্রমে আগে-পরের এ রকম আরো দু-একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

১৯৪৬ সাল। মাহাত্মা গান্ধী নোয়াখালী গিয়েছিলেন সেখানকার দাঙ্গা-পরবর্তী পরিস্থিতি দেখতে। এ উপলক্ষে তিনি চৌমুহনির বিদ্যামন্দির হাইস্কুলের মাঠে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। আমার বাবা আগেভাগে খবরটা জেনে সে সময় চট্টগ্রাম থেকে বাড়ি চলে এসেছিলেন। মিটিংয়ের দিন আমাকে ও বড় ভাইকে নিয়ে তিনি ঐ স্কুলের মাঠে উপস্থিত হলেন। তখন বেলা বারোটার মতো। মিটিং শুরু হওয়ার কথা পাঁচটায়। কিন্তু ততক্ষণে পুরো মাঠ উৎসাহী জনতায় পূর্ণ হয়ে গেছে। যেহেতু আমরা দুজন বাচ্চাবয়সী সে কারণে আমার বাবা আমাদের নিয়ে মাঠের মাঝখানে জায়গা করে নিলেন। আমার বয়স তখন পাঁচ বছর।

সভার সামনে উঁচু করে মঞ্চ সাজানো। আমাদের আসার অনেকক্ষণ পর দুই-তিনজন মহিলা একজন মানুষকে—যার গায়ে বলতে গেলে কোনো কাপড়ই নাই—মঞ্চের উপরে উঠিয়ে বসালো। আমি অবাক বিস্ময়ে লোকটি কে তা জানতে চাইলে বাবা বললেন, ইনিই মহাত্মা গান্ধী। ওনাকে দেখাতেই তোমাদের এখানে নিয়ে এসেছি।

১৯৫২ সাল। স্কুলে গেলাম কিন্তু স্কুল হলো না। হবে না। কেন? স্ট্রাইক। স্ট্রাইক কী? বাড়ি গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করলাম। উনি বোঝালেন স্ট্রাইক মানে সেদিন স্কুলে কোনো ক্লাস হবে না। পরের দিন আবারও স্কুলে স্ট্রাইক হলো। এদিন আমাদেরকে বাড়িতে যেতে না দিয়ে চৌমুহনী স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হলো। এ কাজ করলো স্কুলের উপরের ক্লাসের ছাত্ররা। ট্রেন আসা পর্যন্ত আমরা দাঁড়িয়ে থাকলাম।

পরপর কয়েকদিনই এভাবে চললো। ট্রেন আসলে হুড়মুড় করে নেমে আসা যাত্রীদের জিজ্ঞেস করা হতো, ঢাকায় কি ঘটেছে? কয়জন মারা গেছে? ইত্যাদি। ঘরে গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করতাম, এসব কি হচ্ছে?

মা বলতেন, সরকার বাংলায় কথা বলতে দেবে না। ছাত্রদেরকে মারছে। তোমার আব্বা বাড়ি আসলে তাঁর কাছ থেকে সবকিছু আরো ভালোভাবে শুনতে পারবে।

## ছাত্রলীগে কেন ও কীভাবে এলাম

১৯৫৬ সালে ঢাকা কলেজে ভর্তি হই। প্রথম দিনেই স্ট্রাইক করলাম। অনেকটা না বুঝেই। সিনিয়র কয়েকজন ছাত্র আমাদের বললেন, কলেজ হোস্টেলের দাবিতে এই স্ট্রাইক। স্ট্রাইক কি তাও আমাদের বুঝালেন। প্রথম দিনই ক্লাসে যোগ না দেয়াটা কিছুটা বেখাপ্পা মনে হলেও আমরা সেদিন কেউ ক্লাস করিনি। আজ যেখানে ঢাকা কলেজ, এটা একটা নতুন কমপ্লেক্স। আমরাই সেখানে প্রথম ব্যাচ। ঐ সময়ে জানতে পারলাম কলেজের ছাত্ররা পাইওনিয়ার্স ফ্রন্ট (Pioneers' Front) ওরফে পিএফ ও ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (Democratic Front) ওরফে ডিএফ নামে দু'টি অংশে বিভক্ত। আমরা পাইওনিয়ার্স ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত হলাম। যেহেতু 'বান্ধব কুটিরে'র প্রায় সবাই পিএফ-এর ছিল। এ সময় আমাকে পক্ষে টানার জন্য সিনিয়রদের মধ্যে এক ধরনের চেষ্টা লক্ষ করলাম। পরবর্তীকালে দেখলাম শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, যিনি ছাত্রলীগের একজন প্রভাবশালী নেতা, তিনি ডিএফ-এরও নেতা। তখন ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা ডিএফ ও পিএফ, এ দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করতো। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সময় আমি পিএফ-এ ছিলাম। নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সিনিয়রদের তাগিদ ছিল। কিন্তু আমি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিনি।

আগেই বলেছি, কলেজের পড়া শেষ করে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতে অনার্স ক্লাসে ভর্তি হই। সাবসিডিয়ারি হিসেবে নিয়েছিলাম পদার্থবিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান। এবার সমস্যা দেখা দিল কোন হলে থাকবো। ঢাকা কলেজের ভিপি আজিজ খান (পরবর্তীকালে নারায়ণগঞ্জের একজন বড় ব্যবসায়ী) একটি চিঠি দিলেন খামে ভরে। চার লাইনের চিঠি। আমার হাতে দিয়ে আজিজ ভাই বললেন, 'দেখো,

কী লিখেছি।' খুললাম। খুব সুন্দর করে আমার পুরো নাম লেখা। উনি লিখেছেন, 'আজহার ভাই, যাকে পাঠালাম তার মতো এমন দ্বিতীয়টি আর পাবেন না। সবকিছুতেই তুখোড়।'

চিঠি পড়ে আজহার ভাই এফএইচ হলে তাঁর রুমেই আমাকে থাকতে বললেন। সেই থেকে হল বদল না হওয়া পর্যন্ত আমি সে রুমেরই বাসিন্দা ছিলাম। একে তো রুমটাতে ছাত্রলীগ নেতারা থাকতেন, দ্বিতীয়ত খাওয়ার আগে-পরে, অনেকদিন ইউনিভার্সিটির ক্লাস শেষ হবার পর, সে রুমে বহু ছাত্রের আসা-যাওয়া ছিল। ইফতার পার্টি আয়োজনের মাধ্যমে গোপন সম্মেলনে ১৯৬১ সালে রফিকউল্লাহ চৌধুরী ছাত্রলীগের সভাপতি, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন সাধারণ সম্পাদক ও আমি কার্যনির্বাহী সদস্য হই। সে সময়ে ছাত্ররাজনীতিতে কারা নেতৃত্ব দেবে সেটা মূলত ঢাকা কলেজের ছাত্রদের দ্বারাই নির্ধারিত হতো। ঢাকা কলেজের ছাত্ররা সে সময়ে ঢাকা শহরের রাজনৈতিক আন্দোলনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬২ সালেও সামরিক শাসনের মধ্যে ইফতার পার্টির নামে গোপন সম্মেলনে শাহ মোয়াজ্জেম ছাত্রলীগের সভাপতি, শেখ ফজলুল হক মনি সাধারণ সম্পাদক এবং আমি সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হই। এভাবেই প্রথমদিকে শেখ ফজলুল হক মনির সঙ্গে আমার পরিচয়। তারপর কয়েক দিনেই আমরা দুজন খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম।

এদিকে দিল্লি থেকে ফেরার পর আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম। লেখাপড়ায় সেভাবে আর মন বসাতে পারছিলাম না। কিন্তু ডিগ্রী তো নিতে হবে। তার জন্য যেটুকু পড়াশোনা দরকার তা অবশ্য করতাম। ক্লাসের পড়াশোনার চাইতে বাইরের বই পড়ার দিকে ঝোঁক বেড়ে গেল। সে সব বই পড়াতেই আমার তখন বেশি উৎসাহ। নানা জায়গা থেকে বইপত্র জোগাড় করে এনে দিতেন আজহার ভাই ও রেজা কাদের ভাই। আমি বুঝলাম কেবল একই ধরনের বইপত্র পড়লে হবে না। রাজনৈতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রেও আমি যে রাজনীতিতে বিশ্বাস করি কেবল সে রাজনীতি বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করলেই রাজনীতি বোঝার ক্ষমতা অর্জন করা যাবে না। বরং আমার বিশ্বাসের বাইরে আরো যেসব রাজনৈতিক ধারা রয়েছে সেগুলো সম্পর্কেও পুরোপুরি ধারণা

আয়ত্ত করতে হবে। এই বোধ থেকে আমি সব ধরনের বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র, বিভুতিভূষণ, তারাশঙ্কর; রাজনীতিতে আত্মজীবনীমূলক বিভিন্ন বই বা রচনা যেমন ড. আহমেদ সুকর্ণের *The Autobiography of Sukarno as told to Cindy Adams*, গান্ধীর *My Experiment with Truth*, ও নেহেরুর *Glimpses of World History* ইত্যাদি আমার বেশ ভাল করে পড়া হয়ে গেল। এছাড়াও গ্রিক, রোমান, ভারতীয়, জার্মান ও ইউরোপিয়ান দর্শনের উপরেও অনেক বই ইতিমধ্যে পড়ে ফেললাম।

সে সময়ে ইংরেজিতে ততটা দখল না থাকায় ইংরেজি বইগুলো দুইবার করে পড়তাম। অনেক সময় যারা ইংরেজিতে অনার্স পড়তেন তাঁদের সাহায্য নিতাম। রেজা কাদের ভাই ইংরেজিতে খুব ভালো ছিলেন। তিনি আমাকে লেখাপড়ার ব্যাপারে সব রকম সহযোগিতা করতেন। নানা বিষয়ে আমার এই পড়াশোনার কারণে আমি এ সময় সহপাঠী ও সিনিয়র নির্বিশেষে এফ এইচ হলের ছাত্রদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হই। আমার অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল টেবিল টেনিস, ভলিবল, ফুটবল, ক্রিকেট ও ক্যারাম খেলা।

## সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন

১৯৬১-'৬২ সালের কথা। আইয়ুব খানের সামরিক সরকারের হাতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা ও ছাত্র ধর্মঘটের মতো কর্মসূচি নেয়ার জন্য ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে আলাপে বসে ছাত্রলীগ। মধুর ক্যান্টিনে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন গোপনে সভা করলো। সন্ধ্যা থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত মিটিং চললেও সিদ্ধান্ত ছাড়াই সে মিটিং শেষ হয়। আমরা ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে ধর্মঘটের প্রস্তুতি হিসাবে রাতে হাতে লেখা পোস্টার সেঁটে দিলাম হলগুলোর বাইরে ও ভিতরে—মেইন গেইটে, ক্যান্টিনের সামনে ও রিডিং রুমে। তখন এফএইচ হল, ঢাকা হল (বর্তমানে শহীদুল্লাহ হল), এসএম হল, জগন্নাথ হল, ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ও রোকেয়া হল এ কটিই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস। আমরা রোকেয়া হল ছাড়া সব কটি হলেই পোস্টার লাগিয়ে দিলাম।

ছাত্ররা হল থেকে বের হয়ে আসার পথে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার সময় পোস্টার দেখে ক্লাস থেকে বিরত থাকলো। তখন ক্লাস হতো আমতলা এলাকায় (বর্তমান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সামনে) ও কার্জন হলে।

ছাত্রলীগে তখন পোস্টার লেখার দায়িত্ব ছিল রেজা কাদের ভাইয়ের। তিনি নিজের হাতে ৫০টার মতো পোস্টার লিখে দিলেন। পোস্টারে ছাত্রদের আহ্বান জানানো হয় : 'সোহরাওয়ার্দীর মুক্তির দাবিতে ছাত্র ধর্মঘট পালন করুন।'

আবদুর রাজ্জাক তখন সবেমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। আমি ও রাজ্জাক দুইজনই মূলত রাতের অন্ধকারে পোস্টার লাগাই। সামরিক আইনে এটা ছিল গুরুতর অপরাধ, যার শাস্তি ছিল বেত্রাঘাত। এখনকার মতো গ্লসি পেপারে চাররঙা পোস্টার ছাপানোর কথা তখন কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারতো না। পোস্টার লেখা হতো হয় পুরনো সংবাদপত্রের কিংবা অল্পকিছু পয়সা জোগাড় করতে পারলে সাদা নিজউপ্রিন্টের উপরে মোটা কলমে হাতে লিখে।

ধর্মঘট হওয়ার কারণে ১-২ জানুয়ারি ১৯৬২ সালে মিলিটারিরা ঢাকা হল ঘেরাও করলো। সব ছাত্রকে ধরে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেল তারা। সব মিলিয়ে প্রায় ২৫০ জন। দুইদিন তারা ছাত্রদের ক্যান্টনমেন্টে আটকে রাখলো। আমি হলে না থাকার কারণে গ্রেফতার হলাম না। সামরিক শাসন থাকলেও তখন হলগুলোর নির্বাচন হতো। হলের নির্বাচিত ভিপি ও জিএসসহ দশ-বারোজনকে রেখে বাকি সবাইকে মিলিটারি গাড়িতে উঠিয়ে টঙ্গির কাছাকাছি নিয়ে ছেড়ে দেয়। এই দীর্ঘ পথ হেঁটে সবাই হলে ফিরে আসে। সামরিক বাহিনীর লোকেরা আটক ছাত্রদের নানা ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ করে। পোস্টার লেখা ও লাগানোর পিছনে কারা ছিল তা বিশদভাবে জানতে চায়।

শিক্ষা আন্দোলন চলাকালে পাকিস্তানের সংবিধান রচনার বিষয়টিও গুরুত্ব পায়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান রচনার জন্য একটি কমিশন বা কমিটি গঠন করেছিল। ফলে ছাত্রদের আন্দোলন কেবল শিক্ষা কমিশনের বিরোধিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সংবিধানের বিষয়টিও এ সময় একেবারে সামনে চলে আসে।

আমি অনেক রাতে হলে ফিরতাম। রাতে বিভিন্ন জায়গায় কিছু কাজ করতাম। সে জন্য ফিরতে অনেক দেরি হতো। কিন্তু কেউ জানতো না, কী কারণে আমার রাত হয়। কারণ দর্শানোর কোন নোটিশ না দিয়েই 'সন্তোষজনক উত্তর না দেওয়া'র অপরাধে আমাকে ফজলুল হক হল থেকে বহিষ্কার করা হয়। তখন হলের প্রভোস্ট ছিলেন ড. মাজহারুল হক। এফ এইচ হল থেকে বহিষ্কৃত হবার পর আমি ঢাকা হলের আবাসিক ছাত্র হলাম। সেখানেও এক বছরের মাথায় 'কেন সে রাতের বেলা দেরি করে আসে, যার কারণ একমাত্র সে ছাড়া আর কেউ জানে না'—এ অভিযোগে প্রভোস্ট ড. মুশফিকুর রহমান আমাকে হল থেকে বহিষ্কার করেন। ঢাকা হলে ছিলাম এক বছর। এরপরে থাকা শুরু করলাম নিমতলির একটি প্রাইভেট বাসায়। 'নিমভিলা' নামক ঐ বাড়িটিতে অনেক প্রাক্তন ছাত্র থাকতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষে সিএসএস (পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস) পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য তাঁরা ঐ বাড়িটিতে থাকতেন। অনেক রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাও থাকতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মনোয়ার হোসেন ও শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকও সেখানে থাকতেন।

কোনো দেশ যদি স্বাধীন না হয় তবে সে দেশে বড় কিছুই হয় না—এমন একটি ভাবনা আমাকে সর্বক্ষণ তাড়িয়ে বেড়াতে থাকে।

## আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা

আমার সমসাময়িক (যদিও দুই বছরের ছোট) আবদুর রাজ্জাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়। সে ছিল ফজলুল হক হলের ছাত্র। হলের নির্বাচনী রাজনীতিতে আমরা দুজন একসঙ্গে কাজ করি। সেই সুবাদে আমরা একে অপরের ঘনিষ্ঠ হলাম। দিনের বেলা দুজনের কথা বলা সম্ভব ছিল না। কারণ তখন সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দারা ছাত্রদের ভেতর কাজ করতো। সে সময় রাজ্জাক ছিল ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আর আমি সহ-সম্পাদক।

আমার রাজনৈতিক বই পড়ার আগ্রহ এবং নানা বিষয়ে জানাশোনা দেখে রাজ্জাক একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করে বসলো, আমি আমার

পাঠ্যবিষয়ের বাইরে এত লেখাপড়া করি কেন? আমি তাকে আমার বাবার উপদেশের কথাটি বললাম। বললাম পৃথিবীতে বড় হতে হলে জ্ঞান আহরণের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

১৯৬২ সালে সোহরাওয়ার্দীর মুক্তির দাবিতে পোস্টার লাগানোর সেই ঘটনার পর আমাদের দুজনের আলাপ-আলোচনায় প্রথমে আকারে-ইঙ্গিতে ও তারপর সুস্পষ্টভাবে যে-কথাটা বেরিয়ে আসতে লাগলো তা হলো, স্বাধীনতা ছাড়া কোনো জাতি বেশি দূর এগুতে পারে না। উপরন্তু, বারশত মাইল দূরে থেকে একটি রাষ্ট্র কেবল সামরিক শক্তি দিয়ে আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করবে, তার উপনিবেশের মতো ব্যবহার করবে, আমাদের সম্পদগুলো নিয়ে যাবে এবং তার বদলে আমাদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালাবে, তা হতে পারে না। তেমন একটি দেশে বাস করার অর্থ নিজের চিন্তা-চেতনা ও স্বপ্নকে পরাধীনতার মোড়কে চিরতরে আবদ্ধ করে রাখা। পাকিস্তানের সঙ্গে থাকা সে-অর্থে আমাদের জন্য এক ধরনের পরাধীনতা। প্রায় প্রতি দিনই গভীর রাত পর্যন্ত আমরা এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম।

আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে আমার এসব আলোচনা হতো মূলত কার্জন হল প্রাঙ্গণে ও ফজলুল হক হলের পুকুর পাড়ে। আমি ঢাকা কলেজে থাকাকালে একদিন কলেজ ছুটির পর কলেজ অডিটরিয়ামে কামরুদ্দীন আহমদের (তখন জাতিসংঘে পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য) একক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। সেদিন তাঁর বক্তৃতা আমার শুধু ভালোই লাগেনি, আমার মনে হলো রাজনীতির জ্ঞান অন্য সব জ্ঞানের ঊর্ধ্বে। বক্তৃতায় তিনি আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহের অতি সুন্দর বিশ্লেষণ করলেন। যেমন, মিসরের বিরুদ্ধে সুয়েজ খালকে কেন্দ্র করে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ এবং প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে নেহেরু, স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের মধ্যে জোমো কেনিয়াত্তার কথা বললেন। এঁদের ভূমিকা কিভাবে একটা জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে সেটাও বুঝলাম। এসব আমার চিন্তার জগতে নতুন মাত্রা যোগ করলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কয়েক মাস পরে একদিন কামরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সদরঘাটে জেলা বার

লাহোরে গেলাম। তিনি এ্যাডভোকেট ছিলেন। দেখা হবার পর ঢাকায় যেতে বললেন। ঠিকানা নিলাম ও কয়েক দিনের মধ্যেই ঢাকার আবাসিক এলাকায় তাঁর বাসায় গেলাম। প্রথমে আমি একা এবং পরে রাজ্জাক ও আমি নিয়মিত যেতাম। তবে সে যাওয়া সবসময়ই রাতের বেলায় হতো। কারণ সামরিক গোয়েন্দারা আমাদের উপর কড়া নজর রাখতো বলে আমাদের ধারণা। সেটা ১৯৬০-'৬১ সাল। কামরুদ্দীন সাহেব দেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ ও তাতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ দেখে নিয়মিত তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখতে বললেন। তিনি তাঁর আলোচনাতে সব সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শনের উপরে গুরুত্ব দিয়ে রাজনীতিচর্চার কথা বলতেন।

এখানে বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কামরুদ্দীন সাহেবের ছোট ছেলে আজাদ শহীদ হয়েছিলেন। ঐ নয় মাসে পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা কামরুদ্দীন সাহেবকে নানাভাবে হয়রানি ও নির্যাতন করে। জুলাই মাসে তাঁকে ধরে নিয়ে যায় ও তিন মাস জেলে বন্দি করে রাখে।

১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের আমলে আমি জেল থেকে বেরিয়ে লন্ডনে যাই। যাবার আগে একদিন কামরুদ্দীন আহমদ সাহেবের সাথে দেখা করি। তবে সেদিন তাঁর সঙ্গে সেভাবে আলোচনা করতে পারিনি। লন্ডনে গিয়ে তাঁকে চিঠি লিখি। তিনি আমার চিঠির উত্তর দেন এবং সে উত্তর থেকে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারি। চিঠিতে তাঁর ছেলে আজাদের মৃত্যুর বিষয়টি ছিল। সেই সঙ্গে লিখেছিলেন, কোনো এক গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে সরকার তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগের ব্যাপারটি জানতে পারে এবং এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে। ভবিষ্যতে কোনো বড় ধরনের রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি আমাকে সতর্ক থাকতে বলেছিলেন। 'এটাই তোমার সাথে আমার শেষ যোগাযোগ। শরীর এতই খারাপ যে কয়েকদিনের মধ্যে মারা যাব। আমার কর্তব্য মনে করেই তোমাকে মৃত্যুর আগে কথাটি বলে গেলাম।'

আমি লন্ডনে থাকতে তিনি মারা যান।

দিল্লি ভ্রমণের সময় যে প্রশ্নটা আমার মনে জেগেছিল, সেটা তখনও মাথায় রয়ে গিয়েছিল। মাঝে আমি একবার ছুটিতে বাবা-মার সাথে দেখা করতে বরিশাল ও নোয়াখালীতে গেলাম। তখন বাবার সাথে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করলাম। সব কথার পর তিনি আমাকে বললেন, তুমি যা'ই কর আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তোমাকে কমপক্ষে ডিগ্রিটি নিতে হবে।

বাবা আমাকে তাঁর যুক্তরাজ্যের এডিনবরাতে তিন বছর থাকাকালীন লেখা ডায়েরিগুলো পড়তে দিলেন। সেটা ছিল আমার জীবনে আরেক নতুন অভিজ্ঞতা। পূর্ব পাকিস্তান বা পাকিস্তানের বাইরে অন্য কোনো দেশ সম্পর্কে জানার জন্য এ ডায়েরি আমার খুবই কাজে লাগে। মিথ্যা কথা না বলা, অজুহাত না দেখানো, যার যার নিজের কাজে মনোযোগী হওয়াসহ উন্নত দেশের মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে প্রথম আমি ঐ ডায়েরি পড়েই পরিচিত হই। বাবা ইংল্যান্ড থেকে ফেরার সময় কয়েকটি স্যুট নিয়ে এসেছিলেন। সাথে দুই জোড়া জুতো, কয়েকটি পার্কার কলম। সেই থেকে পার্কার কলম ছাড়া আর কোনো কলম আমি ব্যবহার করি না। এছাড়া ওমেগা ঘড়ি, হ্যাট, হাফপ্যান্ট, ঘোড়ায় চড়ার ব্রিচেস ও লাঠিসহ বিলাতি অনেক জিনিসের সঙ্গেও আমি পরিচিত হলাম।

বাবার সঙ্গে আমি রাজনীতির কথাও আলাপ করলাম। তিনি বললেন, দেশে যে রকম রাজনীতি হয় তাতে তুমি তার সঙ্গে জড়িত হলে তোমার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। আলাপের এক পর্যায়ে তিনি দেশের রাজনীতিকদের মধ্যে ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দী এবং ভারতের গান্ধী ও নেহেরুর কথা বললেন। ব্রিটেনের তৎকালীন বড় বড় রাজনীতিবিদের কথা বললেন। আমেরিকার আব্রাহাম লিংকনের কথাও বললেন। দেশের জন্য এঁরা যে নানা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সে কথা বললেন।

আমার বাবা নিজেও গণিতে গ্রাজুয়েট ছিলেন। পাশ করে তিনি চাকরি-জীবনে প্রবেশ করেন। এক পর্যায়ে সরকারি চাকরিতে ঢোকেন। তারপর ব্রিটিশ বেঙ্গল থেকে পাঠানো দুইজনের একজন

[illegible] বৃত্তিসহ উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি বিলাতে যান। অপরজন [illegible]লেন ড. এফ আর খান ও ড. জিল্লুর রহমান খানের চাচা আবদুর রাজ্জাক খান।

## নিউক্লিয়াস : স্বাধীন বাংলার শক্তিকেন্দ্র

আরেকটি বক্তৃতাও আমার মনে গভীর দাগ কেটেছিল। ১৯৫৮ সালে ঢাকায় বিজ্ঞানবিষয়ক একটি জাতীয় সংগঠনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কার্জন হলের সে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাজ্যের রানী এলিজাবেথের স্বামী প্রিন্স ফিলিপ। প্রধান বক্তা ছিলেন পরবর্তীকালে নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ড. আবদুস সালাম। প্রফেসর সালামের বক্তৃতা আমি সম্মেলনে বসে শুনি ও বক্তৃতার ছাপানো কপি সংগ্রহ করি। সে সময়ে নিরাপত্তার এত কড়াকড়ি ছিল না। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ তথা মানুষের জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলকে মিলিয়ে বুঝতে হবে—তাঁর ঐ বক্তৃতা থেকে আমি এই শিক্ষা পেলাম। ছোট আকারের বুকলেটটি আমি কুড়ি বারের বেশি পড়েছি। রাজনীতি বুঝতে হলে তার জন্য যে ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, সমাজ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞানের আবশ্যকতা রয়েছে, মিটিং-মিছিল ভিত্তিক রাজনীতি ছাড়াও ঐসব বিষয়ে জ্ঞানচর্চাও যে জরুরি, [illegible] উপলব্ধির পর সে সব বিষয়ে জ্ঞান আহরণও আমার দৈনন্দিন কাজের অংশ হয়ে দাঁড়ায়।

আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে আলাপের পর ঢাকা শহরের বিভিন্ন কলেজ, বিশেষ করে ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, [illegible] কলেজ (বর্তমানের সোহরাওয়ার্দী কলেজ), তিতুমীর [illegible] গার্লস কলেজ পর্যায়ে আমাদের সাংগঠনিক যোগাযোগের [illegible] যায়। ১৯৬১ সালে শেখ ফজলুর হক মণি একটি অসুস্থ হয়ে [illegible] আমাকে এক বছরেরও বেশি সময়ের জন্য ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ সময় ঢাকা ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় জেলা পর্যায়ের নামকরা কলেজসমূহের সঙ্গে আমার যোগাযোগ স্থাপন করতে সুবিধা হয়। চিঠিপত্রের মাধ্যমে এই যোগাযোগ হতো। খবরের কাগজের ভেতরের পাতায় তখন সারা

দেশের বিভিন্ন কলেজের নবাগত ছাত্রছাত্রী সংবর্ধনার খবরাখবর ছোট আকারে হলেও ছাপা হতো। আমি সেসব কলেজ সংসদের সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নাম সংগ্রহ করে তাদেরকে নিয়মিত চিঠি লিখতাম। উত্তরও পেতাম। চিঠিপত্রে এই যোগাযোগের মাধ্যমে সারা দেশের নেতৃস্থানীয় ছাত্র ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের সাথে আমার নিয়মিত ও গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

এই বয়সেও অনেকে আমাকে বলেছেন, ঐ চিঠির কারণেই তাঁরা ছাত্র রাজনীতি শুরু করেছিলেন। তাঁদের দুই-একজনের নাম এ প্রসঙ্গে না বললেই নয়। যেমন মুন্সিগঞ্জের মহিউদ্দিন (সংসদ সদস্য হয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধুর প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা ছিলেন) ও যশোরের মরহুম আলী তারেক (তিনিও জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন)। এ রকম অনেকে সেই পুরনো চিঠি আমাকে দেখিয়েছেন।

১৯৬১–'৬২ সাল পর্যন্ত ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক থাকাকালে আমি সারা বাংলাদেশের কলেজ পর্যায়ের ছাত্র নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলি। ইতিমধ্যে শেখ ফজলুল হক মনি তাঁর খালাতো বোন সেরনিয়াবাত সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করেন। এক বছর এগার মাস আমি ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করার পর হঠাৎ মনি এসে বললেন, তিনি আবার কাজ করবেন এবং ১৯৬২-এর শেষদিকে তিনি কাজ করতে শুরু করলেন। এ সময়ই খুবই তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন অথচ স্বল্পভাষী এক তরুণ কাজী আরেফ আহমেদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সে তখন জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। মাত্র আইএ পাশ করে বিএ ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। আরেফের মধ্যে ঘটনার ভেতরে না থেকেও আড়াল-অন্তরাল থেকে ঘটনা পর্যবেক্ষণ, পরিকল্পনা ও কাজ করার যোগ্যতাসম্পন্ন একজন তরুণকে খুঁজে পেলাম। সাধারণ আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা একে অপরের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠি।

প্রাথমিকভাবে দেখলাম ছাত্র হিসাবে অতি মেধাবী না হলেও কাজ করার যে দক্ষতা এবং শৃঙ্খলা ও নৈপুণ্য আরেফের আছে তা এর আগে আমি আর কারো মধ্যে দেখিনি। আমরা দুইজন যখন আলাপ করতাম অনেক সময়ে প্রাথমিকভাবে দ্বিমত করলেও সিদ্ধান্তের পর

যেকে সিদ্ধান্তের আগের দ্বিমতকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে সিদ্ধান্তভিত্তিক কাজ করার মানুষও আমি এর আগে পাইনি। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে অনেককে সে সন্দেহের চোখে দেখতো। এটা ছিল তার স্বভাবজাত। একদিন রাজ্জাককে আমি তার সম্পর্কে বিশদভাবে বললাম। একবার কিছুক্ষণ এক সাথে বসলামও। স্থান, তখনকার দিনের আউটার স্টেডিয়ামের কাঠের গ্যালারি। সময়, রাত নয়টার পর। মাস, নভেম্বর-ডিসেম্বর। সাল ১৯৬২। এই সময়ে আরেক তরুণ ছাত্রনেতা ও দক্ষ সংগঠক আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। চিঠির মাধ্যমে আমার সাথে যুক্ত হওয়াদের সেও একজন। যশোর এমএম কলেজের ছাত্র থাকার সময় সে ও আলি তারেক ১৯৬২-র শিক্ষা আন্দোলনে যশোর-খুলনা এলাকায় ছাত্র সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছিল। যশোর থেকে আসা এই ছেলেটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিভাগে ভর্তি হবে সে বিষয়ে আমার কাছে পরামর্শ চাইলে আমি তাকে সমাজবিজ্ঞানে ভর্তি হতে বলি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে ঐ বিভাগে ভর্তি হয়। বিভাগটি সম্পর্কে সে সময়ে ছাত্রদের স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। শিক্ষা আন্দোলন চলার সময় ঐ এক বছরেই আমি, রাজ্জাক, আরেফ ও আজাদ ঘনিষ্ঠ হই। শিক্ষা আন্দোলন ও প্রাসঙ্গিক রাজনীতি নিয়ে আমাদের মধ্যে নিয়মিত আলোচনা হতো। আমাদের আলোচনার বিষয়ের মধ্যে ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য, অগণতান্ত্রিক সেনাশাসন, বাংলার পরিবর্তে কৌশলে সরকারের নানা কর্মকাণ্ডে উর্দুর প্রচলন, জেল-জুলুম-নির্যাতন ইত্যাদি। কেবল যে সে সব বিষয়েই আমরা কথা আলোচনা করতাম তা নয়। কী করে পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসা যায় সে বিষয় নিয়েও কথা বলতাম। বলতাম, পাকিস্তান থেকে আলাদা না হলে আমাদের গণতন্ত্র ও মুক্তি কোনোটাই আসবে না। সবাই আমরা এ বিষয়ে একমত হতাম, কিন্তু তার পরে কী করতে হবে তা নিয়ে একমত হতে পারতাম না। লক্ষ্য নির্ধারণ করে ফেলেছি, এখন সে লক্ষ্য হাসিলের উপযুক্ত পথ ও পদ্ধতি বের করতে হবে।

সোহরাওয়ার্দী সাহেব মুক্ত হয়েই করাচি থেকে ঢাকার ছাত্রদেরকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে ইংরেজিতে বলেছিলেন, I kiss them, I hug them (আমি তাদের চুম্বন করি, আমি তাদের বুকে জড়িয়ে ধরি)। এই

বাক্যটি নিয়ে তখন দেশের রাজনীতিতে হাস্য-কৌতুকের সৃষ্টি হয় এবং অনেকে এ নিয়ে হালকা রুচির মন্তব্যও করেন। অথচ এটি যে কত সুন্দর একটি অভিব্যক্তি তা অনেকেই বুঝতে পারেননি। ১৯৬২-এর পুরো বছরটি ধরেই শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বিরোধী ছাত্রদের এ আন্দোলন চলে। কমিশনের সুপারিশে তিন বছরের বিএ পাস কোর্স, অনার্সে সেমিস্টার ব্যবস্থা চালু ইত্যাদি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তিন বছরের বিএ পাস কোর্সের বিরোধিতা করতে গিয়েই এই আন্দোলন শুরু হয়। সরকার বাধ্য হলো দাবি মেনে নিতে। অনার্সে সেমিস্টার বাদ দেওয়ার কোনো দাবি ছাত্রদের ছিল না, কিন্তু সেটিও বাতিল করা হলো।

শিক্ষা আন্দোলন চলাকালে ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ মিছিলে পুলিশের গুলিতে মোস্তফা, বাবুল, ওয়াজিউল্লাহসহ এগারো জন ছাত্রের মৃত্যু হয়। দোয়েল চত্বর থেকে সচিবালয়ে যাবার পথে হাইকোর্টের পুরোনো গেটের সামনে, বর্তমান শিক্ষাভবনের পশ্চিম পাশে সেই শহীদদের স্মরণে একটি স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে পাওয়া যায়। সেদিন আমি ছিলাম মিছিলের একেবারে প্রথম সারিতে। দলমত-নির্বিশেষে প্রায় সব ছাত্রনেতাই সেদিন মিছিলে ছিলেন। প্রসঙ্গত বলা দরকার, সামরিক শাসন থাকার কারণে সে সময়ে সব রাজনৈতিক দলই বলতে গেলে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছিল। ছাত্রলীগের শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, শেখ ফজলুল হক মনি, আসমত আলী সিকদার (পরে সাংসদ); ছাত্র ইউনিয়নের কাজী জাফর আহমদ, হায়দার আকবর খান রনো, রাশেদ খান মেনন, রেজা আলী, আবদুর রহিম আজাদ; এনএসএফ-এর আবুল হাসনাত ও আনোয়ার আনসারি খান, ছাত্রশক্তির রেজাউল হক সরকার ও ইসলামী ছাত্রসংঘের নেতারা ঐ মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন।

পুলিশের গুলি হয়েছিল মিছিলের শেষভাগে। পুরনো হাইকোর্টের গেট থেকে মিছিলের পিছন দিকের ছাত্ররা পুলিশকে ইট-পাটকেল ছুঁড়ছিল। গুলির পরপরই আমি মিছিলের সামনে থেকে পেছনে এসে বিশৃঙ্খল ভাব দেখলাম। দেখলাম একটি ছেলে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে আছে। আমি তাকে কোলে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমতলার দিকে রওয়ানা হই। আমার পিছনে পুরো মিছিলটি আমতলায় এসে জড়ো হলো। প্রায় তিন-চার হাজার ছাত্র। ছেলেটিকে কোলে করে নেয়ার সময় আমার খয়েরি রঙের পাঞ্জাবি রক্তে ভিজে গিয়েছিল।

সবাই মনে করলো আমিই বুঝি গুলি খেয়েছি। এই মনে করে অনেকে গরম বক্তৃতাও দিয়ে ফেললেন। আমি হাতের ইশারায় জানালাম আমি গুলিবিদ্ধ হইনি। গুলিবিদ্ধ একজনকে বহন করে আনার ফলেই আমার গায়ে এত রক্ত। ফলে উত্তেজিত বক্তৃতা ওখানেই শেষ হয়। আমরা এরপর আবারও মিছিল নিয়ে ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করি। তখনকার পৌরসভাভিত্তিক ঢাকা শহর ও আজকের দুই সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ঢাকা শহরের পার্থক্য এখন কল্পনাও করা যাবে না। ঢাকার জনসংখ্যা তখন ছিল বারো লাখের মতো। এখন প্রায় দুই কোটি। আমতলা অর্থাৎ এখনকার শহীদ মিনার থেকে শুরু করে সচিবালয়ের সামনে দিয়ে সলিমাবাদ রেস্টুরেন্ট (পীর ইয়ামেনি মসজিদের রাস্তার অপর পারে) হয়ে গুলিস্তানের পাশ দিয়ে গোটা নবাবপুর রোড, সদরঘাট, ইসলামপুর রোড, লালবাগ হয়ে সেন্ট্রাল জেলের পাশ দিয়ে চানখাঁরপুল হয়ে আবার আমতলায় এসে মিছিল শেষ কললাম। আমি সব সময় সব মিছিলের সামনে থাকতাম। অন্যান্য দলের নেতারা পালাক্রমে থাকতেন। এছাড়াও সব ছাত্র সভার আয়োজন, পোস্টার লাগানো, মিছিল করা, বক্তৃতা দেয়া এইসব কাজ প্রধানত আমাকেই করতে হতো। আমার এই সার্বক্ষণিক উপস্থিতি ও অংশগ্রহণের কারণে আমি ছাত্র নেতৃত্বের একজন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত হয়ে যাই।

আন্দোলনের এ পর্যায়ে আমরা চারজন (আমি, আবদুর রাজ্জাক, কাজি আরেফ আহমেদ ও আবুল কালাম আজাদ) ঘন ঘন একে অপরের সঙ্গে মিলিত হতে পারতাম। আমি, রাজ্জাক ও আজাদ হলে থাকতাম। আরেফ টিকাটুলিতে তাদের নিজস্ব বাড়িতে থাকতো।

পল্টন ময়দানের কাঠের গ্যালারিতে প্রতি রাতেই আমাদের তিন-চার ঘন্টাব্যাপী আলাপ-আলোচনা হতো। পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে টিকে থাকতে পারার সম্ভাবনাই ছিল সে সময় আমাদের এসব আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়। ১৯৬২-র নভেম্বর-ডিসেম্বরের দিকে আমরা স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে আসলাম এবং চারজন একসাথে কাজ করার শপথ নিলাম।

এরপর থেকে আমরা কাঠের গ্যালারিতে বসা কমিয়ে ইকবাল হলের মাঠে বসতে শুরু করলাম। এ পর্যায়ে আমাদের একটি সংগঠন

থাকা উচিত—এই উপলব্ধি থেকে আমরা চারজনকে নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় সেল (নিউক্লিয়াস) গঠনের সিদ্ধান্ত নিলাম। ছাত্র আন্দোলন চলাকালেই ১৯৬২-এর শেষভাগে কয়েকজন ছাত্রনেতার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। শাহ মোয়াজ্জেম ও ফজলুল হক মনি প্রথম তালিকায় ছিলেন। সে তালিকায় আমার ও রাজ্জাকের নাম ছিল না। মোয়াজ্জেম ভাই ও ফজলুল হক মনি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আগের রাতে তাঁরা আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যান এবং পরদিন আত্মসমর্পণ করেন।

পরবর্তীকালে আমার মনে হয়েছে, ১৯৬১ সালে ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট (EPLF)-এর লিফলেট বিলির পর থেকেই তাঁরা ছাত্র আন্দোলন থেকে দূরে সরে যান। আমরা বাকিরাও বিষয়টি অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট নিয়ে আর কোনো কাজ করিনি।

## ইপিএলএফ-এর লিফলেট

ইপিএলএফ-এর লিফলেটের মূল বিষয় ছিল পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র এবং এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার বিষয়টিকে তুলে ধরা।

লিফলেটটি ছিল এক-ষোড়শাংশ ফর্মা, অর্থাৎ বইয়ের পাতার এক পৃষ্ঠা আকারের। ভাষা ও বানানের অনেক ভুল ছিল। ১৯৬১ সালের মাঝামাঝি এই লিফলেটটি বিলি করা হয়। আমি ঢাকা হলে, মনি জগন্নাথ কলেজ ও এসএম হলে, রাজ্জাক এফএইচ হলে এ লিফলেট বিলি করি। আমাদের প্রত্যেককে ২০০ কপি করে লিফলেট দেওয়া হয়েছিল।

শিক্ষা কমিশন ও আইয়ুবি সংবিধান প্রণয়ন বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের গোটা বছরটা কেটে গেল। আন্দোলনের কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়ে আমাদের চারজনের মেলামেশায় ও রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় স্বাধীনতার বিষয়টি অনেক বেশি গুরুত্ব নিয়ে উঠে আসে। ১৯৬২-র নভেম্বর-ডিসেম্বরে আমরা আউটার স্টেডিয়ামের কাঠের গ্যালারিতে বসে স্বাধীনতার লক্ষ্যে গোপন সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

ইকবাল হলের মাঠে আমাদের চারজনের গোপন বৈঠকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে গঠিত এই গোপন বিপ্লবী গ্রুপের নাম 'নিউক্লিয়াস'

নামার সিদ্ধান্ত হয়। পরবর্তী সময়ে আমরা একে 'স্বাধীন বাঙলা নিউক্লিয়াস'ও বলতে শুরু করি।

বছর জুড়ে আন্দোলন চলাকালে ঢাকা শহর ছাড়াও চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, বরিশাল, খুলনা, যশোর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, রংপুর, টাঙ্গাইল, পাবনা, কুষ্টিয়া, বগুড়া ও মানিকগঞ্জে কোথাও একজন, কোথাও দুইজন করে স্বাধীন বাঙলা নিউক্লিয়াস-এর সাথে জড়িত হতে পারে এমন বেশ কয়েকজনের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়ে যায়। অবশ্য এরা আগে থেকেই আমাদের মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন। চট্টগ্রামে এম এ মান্নান (পরবর্তীকালে মন্ত্রী), কুমিল্লায় হাবিবুল্লাহ চৌধুরী ও আনসার উদ্দিন, নোয়াখালীতে আ স ম আবদুর রব, মোস্তাফিজুর রহমান ও মাহমুদুর রহমান বেলায়েত, বরিশালে আবদুল বারেক ও জহিরুল ইসলাম খান পান্না, খুলনার শেখ কামরুজ্জামান টুকু, যশোরে মনি ও রবিউল আলম, রাজশাহীতে ডাক্তার এম এ করিম, ময়মনসিংহে চঞ্চল ওহাব মিঠু, রংপুরে সোহাগ, টাঙ্গাইলে সা'দত কলেজের ভিপি গোলাম কায়সার খান ফারুক, পাবনায় আহমদ রফিক, বগুড়ায় ফজলুর রহমান পটল ও সুরুজ, মানিকগঞ্জে বিল্টু ও কুষ্টিয়ায় আমিনুল হক বাদশাকে সরাসরি নিউক্লিয়াসের নাম না বলে ভিন্ন ভিন্নভাবে গোপন সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরা আন্দোলনের সময় বিভিন্ন স্কোয়াড গঠন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট করার কাজে নিয়োজিত থাকতো। জঙ্গি মিছিল করার সময় এদের ভূমিকা থাকতো সবার চোখে পড়ার মতো। ছাত্রলীগের বাছাই করা এ সদস্যরা পরবর্তী সময়ে 'নিউক্লিয়াস'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ড. ফরাসউদ্দিন ছাত্রলীগের সদস্য হিসেবে একটি স্কোয়াডে ছিলেন।

১৯৬২-র ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন থেকে তিন সপ্তাহ এবং পরের বছরও অর্থাৎ ১৯৬৩-এর ফেব্রুয়ারিতে আমাদের উদ্যোগে গাড়ির নাম্বার প্লেট ও দোকানের সাইনবোর্ড বাংলায় লেখার কার্যক্রমটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

এ সময়ই আমরা 'বিপ্লবী বাংলা' নামে অনিয়মিতভাবে একটি হাতে লেখা পত্রিকা গোপনে বের করতাম। মাসিক হিসেবে দশ-বারো

সংখ্যা প্রকাশের পর আমরা পত্রিকাটিবন্ধ করে দিই। এই পত্রিকাতেই আমাদের গোপন সংগঠনের রিক্রুটমেন্ট পদ্ধতিটা প্রথম প্রকাশিত হয়। যিনি রিক্রুট করবেন তিনি তাঁর নিচের সবার পরিচয় জানবেন। তাঁকে যিনি রিক্রুট করেছেন তিনি কেবল তাঁকেই চিনবেন। যিনি রিক্রুট করবেন তাঁর নাম 'নির্বিগ', তাঁকে যিনি রিক্রুট করেছিলেন তিনি হবেন 'উবিগ'। সংগঠনের নিয়ম-শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়েও পত্রিকায় বিস্তারিত তুলে ধরা হতো। মিথ্যা কথা না বলা, বিপ্লবী বইপত্র পাঠে মনোযোগী হওয়া, পায়ে হেঁটে বহুদূর অবধি যাতায়াত করা, রাত জাগা, গালগল্পে মেতে সময় নষ্ট না করা, সংগঠন হিসেবে ছাত্রলীগকে আরও শক্তিশালী করার কাজে নিয়োজিত থাকা—এসবই ছিল তাদের প্রাত্যহিক কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত। আন্দোলন ও ছাত্রলীগের কাজে নিয়োজিত থাকার সময়েই তারা যে বিভিন্ন পর্যায়ে 'স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস'-এর পক্ষে কাজ করছে এবং সদস্য হয়েছে তা তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত।

১৯৬২-'৬৩ সালে ঢাকাসহ সারাদেশে 'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্যসংখ্যা ছিল ৫০ থেকে ৬০ জন। এরা ছাড়াও প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ জন পর্যবেক্ষণে ছিলেন। ১৯৬৩ সালের প্রথমদিকে রাজ্জাক ও কিছুদিন পর আমি গ্রেফতার হয়ে যাই। ১৯৬৩-এর মাঝামাঝি সময়ে তৎকালীন পাকিস্তান মাঠে (বর্তমানে বাংলাদেশ মাঠ) ছাত্রলীগের সম্মেলন হয়। সে সম্মেলনের মাধ্যমে ওবায়দুর রহমান সভাপতি ও আমি সাধারণ সম্পাদক হই। আমার সাধারণ সম্পাদক হবার ফলে 'স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস' সারাদেশের ছাত্র সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠার একটি বড় ধরনের সুযোগ লাভ করে। সে সময়ে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন 'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্য। আমার নেতৃত্বে ও তাঁদের উদ্যোগে আমাদের গোপন সংগঠনের পরিধি অনেক বেড়ে যায়। আমার সম্পাদক পদ লাভে বাধা সৃষ্টি করার জন্য শেখ ফজলুল হক মনি ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আবদুল হাই সাচ্চুসহ আরও কয়েকজনকে সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী করতে চেয়েছিলেন। ঢাকা শহরসহ সব জেলার প্রতিনিধিদের চাপে তাঁদের প্রচেষ্টা বেশি দূর এগুতে পারেনি। সে সময় কাজী আরেফ আমাকে সাধারণ সম্পাদক করতে বড় ভূমিকা

পালন করেছিল। তখনও আমরা গোপনে ঢাকার বাইরে গিয়ে কিছু ছাত্র সংগ্রহ করে জেলা সম্মেলন করতাম। সেই সুযোগে জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে আমাদের গোপন সংগঠনের রিক্রুটমেন্ট করা সহজ হতো। একই কারণে ঢাকাসহ কোনো জেলা বা মহকুমাতে আমাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দাঁড়ানো কারো পক্ষে সহজ ছিল না। কখনও কখনও কোথাও যে দুই-একজন 'নিউক্লিয়াস'-এর রিক্রুট করা সদস্যদের বিরোধিতা করার চেষ্টা করতো, দেখা যেত তাদের প্রায় সকলেই ছিল শেখ ফজলুল হক মনির আশীর্বাদপুষ্ট।

পাকিস্তান মাঠের ঐ সম্মেলনের মাস দুয়েক আগে শাহ মোয়াজ্জেম ভাই আমাকে একদিন জিন্নাহ এভিনিউর আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে নিয়ে যান। আমাকে ওয়েটিং রুমে বসতে বলে তিনি ভিতরে চলে গেলেন। চার-পাঁচ মিনিট পরে এসে আমাকেও ভেতরে নিয়ে গেলেন। ভিতরে গিয়ে আমি যাঁকে দেখলাম তিনি এ কোম্পানির বড় কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন সেটি জানতাম, কিন্তু আগে কোনো দিন তাঁর সঙ্গে আমার সরাসরি দেখা বা কথা হয়নি। শাহ মোয়াজ্জেম ভাই আমাকে শেখ মুজিবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শেখ মুজিব তখন পূর্ব পাকিস্তানে আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার। শুনেছি তাঁর বেতন ছিল মাসে প্রায় দুই হাজার টাকা। আলফা ইন্স্যুরেন্সের মালিক ছিলেন পাকিস্তানের এক অতি ধনাঢ্য ব্যক্তি ও প্রখ্যাত শিল্পপতি ইউসুফ হারুন। ভাম এন্ড কোম্পানির পাশের বিল্ডিং-এর দোতলায় ছিল আলফা ইন্স্যুরেন্সের অফিস। শেখ সাহেবের রুমে মোয়াজ্জেম ভাই ও আমি বসলাম। তিনি আমাদের চা খাওয়ালেন। এক পর্যায়ে বললেন, 'তোর এত কম বয়স, তুই রাজনীতি করবি? তোর ব্যাপারে আমি খোঁজখবর নিয়েছি। তোর আব্বা রিটায়ার করার আগে যখন ফরিদপুর-বরিশাল রেঞ্জে ডিডিপিআই ছিলেন তখন আমাদের বাড়ির হাইস্কুলের অনুমতি দেওয়ার আগে একবার ভিজিটে এসেছিলেন। আমাদের স্কুলের বাড়ি দেখে তোর আব্বা বলেছিলেন, যে স্কুলের এত বড় বিল্ডিং আছে সে স্কুলের কেন প্রতি দুই বছর অন্তর রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে? এর তো স্থায়ী রেজিস্ট্রেশন থাকা উচিত। তিনি স্থায়ী রেজিস্ট্রেশনের জন্য রিকমেন্ড করেন এবং তা বাস্তবায়িতও হয়েছিল।'

আলাপের এক পর্যায়ে তিনি একটা সাদা কাগজ নিয়ে তাতে কলম দিয়ে কয়েকটা নাম লিখলেন। শেখ ফজলুল হক মনি, ওবায়দুর রহমান, সিরাজুল আলম খান। তারপর মোয়াজ্জেম ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মনি সভাপতি, ওবায়দুর রহমান সাধারণ সম্পাদক, সিরাজ সংগঠনিক সম্পাদক—'দেখ তো এভাবে কেমন হয়?' এরপর কথা আর এগোয়নি। মোয়াজ্জেম ভাই আমাকে নিয়ে বেরিয়ে চলে এলেন।

সে সময়ে আমার বয়স একুশ বছর। আমার মনে প্রথমেই যে প্রশ্নটি জাগলো তা হলো, ছাত্রলীগের ব্যাপারে উনি কেন মোয়াজ্জেম ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করলেন এবং তা-ও আবার আমাকে শুনিয়ে। মোয়াজ্জেম ভাইকে বিষয়টি জিজ্ঞেসও কললাম। 'পরে বলবো' বলে তিনি আমাকে থামিয়ে দিলেন। আমার কাছে বিষয়টি সেদিন একেবারেই ভালো লাগেনি।

এর কয়েকদিন পর কনফারেন্সের আগে মোয়াজ্জেম ভাইয়ের কাছে বিষয়টি আবারও জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, 'হলে তুই জিএসই হবি, ওবায়েদ প্রেসিডেন্ট। মনি তো কাজই করে না। তুই একা সব কাজ করিস।' মোয়াজ্জেম ভাইয়ের কথার কার্যকারিতার প্রমাণ পরে সম্মেলনের সময় পাওয়া যায়।

সম্মেলনের পর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি অনেক বেশি কাজ করার সুযোগ পাই। এ সময় প্রত্যেক জেলার সঙ্গে আমি যোগাযোগ তৈরি করে ফেলি। আমাদের 'স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস'-এর সাংগঠনিক কার্যক্রম এর ফলে অনেক সম্প্রসারিত হয়। জেলা ছাড়াও মহকুমা পর্যায়ে ও বড় বড় কলেজগুলোর সঙ্গে এ সময় আমাদের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। উল্লেখ্য, তখন জেলা ছিল ১৭টি। তাছাড়া সে সময় আজকের মতো থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এত কলেজ ছিল না।

জেলা পর্যায়ে আমরা তিনজনকে নিয়ে একটি করে সেল (cell) গঠনের কাজ শুরু করি। আমি প্রত্যেক জেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অথবা তাঁদের যে কোনো একজন সহ তিনজন এবং কলেজ পর্যায়েও তিনজনকে নিয়ে একটি করে সেল গঠনের উদ্যোগ নিই। এর

ফলে জেলে যাবার আগ পর্যন্ত আমরা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ৩০০ জনের মতো 'নিউক্লিয়াস' মেম্বার সংগ্রহ করতে সক্ষম হই।

আমাদের গোপন সংগঠনের যেটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তা এই, সদস্যদের প্রত্যেকে নিজেকে 'স্বাধীনতা'র লক্ষ্যে উৎসর্গীকৃত মনে করতো। আর দিনের চব্বিশ ঘণ্টার প্রতিটি মুহূর্ত সংগঠনের গোপন কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটানোকেই প্রধান কর্তব্য মনে করে নিজেকে তাতে নিয়োজিত রাখতো।

আমি, আবদুর রাজ্জাক ও আবুল কালাম আজাদ কিছু দিনের মধ্যেই গ্রেফতার হয়ে জেলে চলে গেলাম। আরেফ বাইরে রইলো। ঢাকা শহরে আমাদের গোপন সংগঠনের কার্যক্রম বিস্তারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল সে। ফলে আমাদের অবর্তমানেও ঢাকা শহরে 'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় পাঁচ থেকে ছয়শত। জেলে বসেই আমরা এ খবরগুলো পেতাম এবং আমাদের তিনজনের মতামত ও সিদ্ধান্ত আরেফের মাধ্যমেই সংগঠনের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারতাম। জেলে আমরা প্রায় দুই বছর ছিলাম। এ সময়ে পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হলো। সরকারি দলের প্রার্থী ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান আর সম্মিলিত বিরোধীদলের ('কপ') প্রার্থী পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছোট বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহ। ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে কাজ করার সুযোগটা ব্যবহার করার কথাও আমরা আরেফকে জানালাম। যেহেতু তখন পর্যন্ত ছাত্রলীগই আমাদের গোপন সংগঠন বিস্তারের একমাত্র প্ল্যাটফরম, সেহেতু ছাত্রলীগকে পুরোপুরিভাবে মিস ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনের কাজে যুক্ত থাকার সিদ্ধান্ত পাঠালাম আমরা। আমরা জেলে থাকতেই নির্বাচন হলো। কাজী আরেফ ঐ অবস্থাতে 'নিউক্লিয়াস'-এর মূল দায়িত্ব পালন করতে থাকে। ১৯৬৫-এর আগস্ট মাসে আমি, রাজ্জাক ও আজাদ একই সঙ্গে জেল থেকে ছাড়া পাই। ঢাকা শহর ছাত্রলীগের সম্মেলনে কাজী আরেফ সভাপতি হলো। তাতে আবারও আমাদের সুযোগ এলো ঢাকা শহরভিত্তিক সাংগঠনিক কাজ দ্রুততার সঙ্গে বাড়াবার। ছাত্রলীগের পরবর্তী কেন্দ্রীয় সম্মেলনকে সামনে রেখে আমি আগস্ট-সেপ্টেম্বর দুই মাস সারাদেশে সংগঠনের আঞ্চলিক কনফারেন্সগুলো করলাম। কোনো কোনো জেলা, মহকুমা ও কলেজ

কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দুজনকেই, আবার কোথাও কোথাও কমপক্ষে একজনকে 'নিউক্লিয়াস' সদস্যদের মধ্য থেকে করা হলো। কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর। সেখানে আবারও ভিন্ন একটা প্রচেষ্টা দেখা গেল। কিন্তু তা সফল হলো না। আবদুর রাজ্জাক সাধারণ সম্পাদক হলো এবং সৈয়দ মাজহারুল হক বাকি সভাপতি। বাকিও আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ঐ কমিটিতেও দুই-একজন আমাদের সহমতের ছিলেন না, বরং বিপরীত চিন্তাই করতেন। তাঁদের মধ্যে ফেরদৌস কোরেশী ও আল-মুজাহিদীর নাম করা যায়। তখন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিল একত্রিশ জন।

সম্মেলনের শেষ দিন ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। আমি আমার সমাপনী বক্তৃতায় বলেছিলাম, এটাই হয়তো আগামী আট-দশ বছরের জন্য আমার শেষ বক্তৃতা। কথাটার মধ্য দিয়ে আমি কী ইঙ্গিত দিয়েছিলাম তা উপস্থিত প্রতিনিধিদের সবাই না বুঝলেও আমাদের রিক্রুট করা 'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্যরা (যাঁদের সংখ্যা ছিল শতকরা সত্তর থেকে আশি ভাগ) ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। দেশ স্বাধীন হবার আগ পর্যন্ত আমি আর কোনো প্রকাশ্য সভায় মঞ্চে উঠিনি। একমাত্র ১৮ জানুয়ারি ১৯৭০ যেদিন পল্টনে 'জয়বাংলা' স্লোগান দেওয়া হয়েছিল সেদিন ছাড়া।

সম্মেলন শেষে আমরা ধারাবাহিকভাবে 'নিউক্লিয়াস'-এর বৈঠক করতে থাকি। কোন পর্যায়ে কীভাবে সংগঠনের বিস্তার ঘটানো হবে এবং আরও কাউকে কাউকে 'নিউক্লিয়াস' ভুক্ত করা যায় কিনা সে বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। 'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্য সংখ্যা সে-সময়ের চার থেকে বাড়িয়ে কমপক্ষে সাত অথবা নয়জন করা যায় কিনা সেটা নিয়েও ভাবা হয়। সম্মেলনের কিছুদিন আগেই অবশ্য 'নিউক্লিয়াস'-এর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চট্টগ্রামের এম এ মান্নানকে 'নিউক্লিয়াস'ভুক্ত করা হয়। একইভাবে প্রত্যেক জেলা থেকে একজনকে নিয়ে 'নিউক্লিয়াস'-এর পরিধি বাড়াবার চিন্তা থাকলেও সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। 'নিউক্লিয়াস'-এর যে-কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে 'ভেটো' (veto) দেওয়ার ক্ষমতা 'নিউক্লিয়াস'-এর প্রত্যেক সদস্যের ছিল। সেই 'ভেটো'র কারণে 'নিউক্লিয়াস'-এর বিস্তৃতির চিন্তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মনি), আ স ম

আবদুর রব, শরীফ নূরুল আম্বিয়া, কামরুজ্জামান টুকু, ডা. আবু তালা (ময়মনসিংহ) ও আখতার আহমদ (সিলেট)-কে 'নিউক্লিয়াস'ভুক্ত করার চিন্তাভাবনা থাকলেও, শেষ পর্যন্ত মার্শাল মনিকে 'নিউক্লিয়াস'ভুক্ত না করেও তার সঙ্গে 'নিউক্লিয়াস'-এর সব সিদ্ধান্তের বিষয়ে আলাপ-আলোচনার ব্যাপারে আমরা একমত হই। এরপর নতুন কাউকে 'নিউক্লিয়াস'ভুক্ত করার বিষয়টি স্থগিত থাকে। তবে কেন্দ্র থেকে দায়িত্ব দিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে নানাজনকে দিয়ে কাজ করানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। 'নিউক্লিয়াস'ভুক্ত না করেও এভাবে কার্যক্রম চালানোর এই পরিকল্পনাটি বেশ কার্যকর প্রমাণিত হয়। সে-সময় এ রকম উপ-কমিটি ধরনের প্রায় বিশ-ত্রিশটি কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছিল। তাতে সংগঠনের কার্যক্রমের বিস্তার ঘটানো সহজ হয়েছিল।

মার্শাল মনি ছাড়া আর কাউকে 'নিউক্লিয়া'স-এর মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণের অংশীদার করা হয়নি, তবে ১৯৬৮-'৬৯-এর ১১-দফাভিত্তিক আন্দোলন-সংগ্রামের দিনগুলোতে প্রতিটি জেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে অনেকেই আমাদের গোপন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোতে এবং পরবর্তী সময়েও ঢাকা শহরে বিভিন্ন ব্রিগেড গড়ে তুলতে গিয়ে পাঁচ-ছয় শ' সংগঠকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রায় সাত হাজার সংগঠক গড়ে ওঠে। এদের সকলেই 'বাংলাদেশ লিবারেশান ফোর্স' (বিএলএফ)-এর সরাসরি সদস্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

এ সময়টিতেই 'নিউক্লিয়াস'-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের কার্যক্রমকে রাজনৈতিক ও সামরিক এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। মূলত ১৯৬৮-এর শেষ ভাগেই এ বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। গণআন্দোলনের সময় অবাঙালিদের দ্বারা পরিচালিত প্রশাসন ভেঙে পড়ে। যানবাহন নিয়ন্ত্রণসহ ট্রাফিক পুলিশের কাজ, রাত্রিকালীন পাহারা শ্রমিক এলাকায় শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ট্রেন-স্টিমার চালু, স্কুল-কলেজসমূহের নিরাপত্তা বিধান, ঢাকার বাইরে বড় বড় বাজার ও থানায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, মোটকথা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে চলমান আন্দোলনকে চাঙ্গা রাখার পাশপাশি জনজীবনের নিরাপত্তা বিধানের মৌলিক দায়িত্বও পালন করতে হয় এ সময় 'বিএলএফ' সদস্যদের।

এ জন্য ছাত্র ব্রিগেড, যুব-ব্রিগেড, শ্রমিক ব্রিগেড, কৃষক ব্রিগেড, না
ব্রিগেড গড়ে তোলা হয়।

১৯৬৮-'৬৯ সালেই 'নিউক্লিয়াস'-এর রাজনৈতিক শাখা (উ
হিসেবে 'বিএলএফ' গড়ে তোলা হয়। ঢাকা শহরের ৪২টি ওয়া
সবকটিতে 'বিএলএফ'-এর নেতৃত্বে ছাত্র ও নাগরিকদের সম
'সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। এই দুরূহ কাজটি করার জ
'নিউক্লিয়াস'-এর পক্ষ থেকে আ স ম আবদুর রবকে এবং
সহযোগী হিসেবে স্বপন চৌধুরীকে (একাত্তরে শহীদ) দায়িত্ব দে
হয়। একই সময়ে 'বিএলএফ'-এর সামরিক শাখা হিসেবে গঠিত
'জয়বাংলা বাহিনী'। 'জয়বাংলা বাহিনী'র প্রাথমিক কাজ ছিল রেডক্র
এর প্রশিক্ষণ নেওয়া, যুদ্ধাবস্থায় বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপ
বিধান করা, অস্ত্র ট্রেনিং দেওয়া, বোমা তৈরি করা ইত্যাদি। এ
দায়িত্বে ছিলেন শরীফ নূরুল আম্বিয়া।

'বিএলএফ' ও 'জয়বাংলা বাহিনী'র কার্যক্রমকে আলাদা ক
বোঝানো কঠিন হবে। 'জয়বাংলা বাহিনী'র বিশদ ও বিস্তৃত কর্মযজ্ঞে
মধ্যে ছিল একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে সামরিক কুচকাওয়াজ করা
এই বাহিনীর মূল কমান্ডার ছিলেন আ স ম আবদুর রব ও সহ-কমান্ডা
ছিলেন কামরুল আলম খান খসরু। নারী ব্রিগেডের কুচকাওয়াজে
নেতৃত্ব দিতেন মমতাজ বেগম। মহিলা সামরিক সংগঠকদের মধ্যে
ফোরকান বেগম ছিলেন অন্যতম।

## কারাজীবন

১৯৬৩-'৬৫ সময়ের জেল জীবন ছিল আমাদের জন্য বৃহত্তর অর্থে
বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সময়।
তখন চিন্তা করার সময় ছিল অফুরন্ত। আর জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য জে
জীবন যে সুযোগ করে দিয়েছিল তা বলতে গেলে নজিরবিহীন।

আমি, রাজ্জাক ও আজাদ একসঙ্গে একই জেলে ছিলাম দীর্ঘদিন।
একটি দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সদিচ্ছাই যথেষ্ট নয়; এমনকি
ত্যাগ স্বীকারের মনোভাবও পর্যাপ্ত নয়। স্বাধীনতার লক্ষ্যে সাংগঠনিক
বিস্তৃতির পাশাপাশি জ্ঞানার্জন ও একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলাও
আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। ঢাকা জেলের লাইব্রেরিটিও ছিল অতি

আলোচনার। ব্রিটিশ আমল থেকেই যেসব স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবীরা ঢাকা জেলে বন্দি ছিলেন তাঁদের পড়াশুনার মান যে কত উচ্চ পর্যায়ের ছিল, জেল লাইব্রেরির বইগুলো দেখলে তা সহজে বোঝা যায়। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটলের রচনা। পরবর্তীকালের ইউরোপীয় পণ্ডিত ও দার্শনিক যেমন কার্লাইল, হিউম, ভলতেয়ার, রুশো, লক এঁদের লেখা; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্রগুলোর উত্থানের ইতিহাস; রাশিয়ার ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের ইতিহাস; মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিন, ট্রটস্কি, প্লেখানভের রচনা—এসব পড়ার সুযোগ হয় আমার জেলখানায় বসেই। যুদ্ধবিগ্রহের ওপর আমি প্রথম যে বইটি পড়ি তা ছিল থুসিডাইডিসের *পেলোপনেশিয়ান ওয়ার*। পড়ি হেগেলের *জার্মান ফিলোসফিসহ* আরও অনেক বইপত্র। তাছাড়া ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যের নানা বই, যেমন ইবনে খালদুনের *আল-মুকাদ্দিমা*, আলবেরুনীর *ভারততত্ত্ব*, উইনস্টন চার্চিলের *হিস্ট্রি অব দ্য ইংলিশ স্পিকিং পিপল*, হোমারের *ইলিয়াড* ও *ওডিসি* প্রভৃতির সঙ্গেও আমার প্রথম পরিচয় ঘটে জেলেই।

ক্রমানুসারে কোন বইটি আগে আর কোনটি পরে পড়তে হবে তা জানা না থাকার কারণে এলোপাথাড়িভাবে বই পড়েছি। ফলে বিষয় কিংবা দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার দিকটি প্রথমদিকে গুরুত্ব পায়নি। এতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়ে যায়। পরবর্তীকালে এসব বই ক্রমানুসারে পড়ি। তাতে কোনো কোনো বই দুবার করে পড়ার সুযোগ ঘটে। এতে আমার বোঝার দিকটা আরও সমৃদ্ধ হয়।

এ সময়ে আমরা জেলে একসঙ্গে ছাত্রলীগের মোয়াজ্জেম ভাই, ফজলুল হক মনি, ওবায়েদুর রহমান, শহীদুল হক মুন্সি; ছাত্র ইউনিয়নের বদরুল হক বাচ্চু (পরবর্তীকালে বিচারপতি), রেজা আলী, হায়দার আকবর খান রনো, রাশেদ খান মেনন, আলী রেজা, আলী হায়দার খানসহ প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন ছিলাম। ছাত্র ইউনিয়নের রনোকে দেখতাম গভীর মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করতে। ১৯৬৫-এর জুলাই-আগস্টে আমরা সবাই মুক্তি পাই। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ছাত্রলীগের সম্মেলন করে আমি ছাত্র রাজনীতি থেকে সরে

আসি। তখন থেকে আমার নিজেকে মনে হয়েছিল ভিন্ন এক সিরাজুল আলম খান। প্রায় দুই বছরের জেল জীবন আমাকে, আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে একেবারেই পাল্টে দেয়।

## ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন

বাংলায় গাড়ির নাম্বার ও দোকানপাটে সাইনবোর্ড লেখা এবং পোস্টকার্ডে বাংলায় ঠিকানা লেখার মধ্য দিয়ে ১৯৬১-'৬২ সালে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে সামান্য হলেও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার সঞ্চার ঘটে। সে সময়ে ছাত্র সভাসমূহে সাধারণত সকল ছাত্র সংগঠনই যোগ দিত। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে আমি ও ছাত্র ইউনিয়নের আবদুর রহিম আজাদ বাংলায় বক্তৃতা করতাম। এনএসএফ, ছাত্রশক্তি ও ইসলামী ছাত্রসংঘের নেতারা বক্তৃতা করতেন ইংরেজিতে। তাদের বক্তৃতার সময় কিছুটা হৈ চৈ হতো। ফলে দুই-চার মিনিট পরেই তাদের বক্তৃতায় ভাটা পড়তো। কারণ কেউ সেগুলো শুনতো না। আমরা উপস্থিত ছাত্রদেরকে ধৈর্য ধরতে বলতাম এবং এভাবেই সভা শেষ হতো।

ছাত্র ধর্মঘট চলার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের ছাত্ররা একই হারে ধর্মঘটে যোগ দিত, তা বলা যাবে না। আমরা ক্লাস চলাকালে শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে বিভিন্ন ক্লাসে ঢুকে ধর্মঘটের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতাম। তাতে উদ্বুদ্ধ হয়েই ছাত্ররা ধর্মঘটে যোগ দিত। এ নিয়ে মাঝেমধ্যে টানাহেঁচড়া বা ধস্তাধস্তি যে একেবারেই হতো না, তা নয়। তবে তা অল্পক্ষণের জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি মাত্র ক্যাম্পাস। বিজ্ঞানের জন্য কার্জন হল এবং কলা, বাণিজ্য ও আইন বিভাগের জন্য আমতলার পাশের বিল্ডিং। আইন বিভাগের ক্লাস হতো বিকেলে। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও ক্লাসের সময়টুকু ছাড়া বাকি সময় ব্যয় করতাম কলা ভবনে।

আন্দোলনের বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য সর্বদলীয় একটি কমিটি থাকতো। এর বাইরে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে আলাদা বোঝাপড়া হতো এবং আমরা এ দুই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ প্রায়ই পৃথকভাবে আলোচনা করতাম। তাতে সর্বদলীয় সভায় সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হতো।

আমরা যারা ছাত্রলীগ করতাম, আমাদের উপরতলার কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অর্থাৎ আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ থাকতো না। আওয়ামী লীগও কখনও আমাদের নিয়ন্ত্রণ করার কথা চিন্তা করতো না। আমরাও কখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতাম না। ছাত্রলীগে আমরা যে কয়জন সক্রিয় নেতা বা কর্মী ছিলাম তারাই মিলেমিশে সিদ্ধান্ত নিতাম। আমাদের একটি অত্যন্ত সক্ষম ও দক্ষ 'টিম' ছিল।

১৯৬২ সালের পুরো বছরটাই ছিল ছাত্র ধর্মঘটে পূর্ণ। ছাত্রদের দাবি ছিল শরীফ কমিশন ও হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ বাতিল করতে হবে। সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমাদের আন্দোলনের অনেক সাফল্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো চারুকলা স্কুলকে কলেজে উন্নীতকরণ। প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে একরকম লড়াই করে আমাদের এই দাবি আদায় করা হয়। আইয়ুব খানের অধীনে পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যাঁরা সদস্য হয়েছিলেন, যেমন তমিজুদ্দিন খান, সবুর খান, ফজলুল কাদের চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে আমরা একরকম জোর করে কথা আদায় করেছিলাম যে, তাঁরা বাঙালির স্বার্থবিরোধী কিছু করবেন না এবং নেতৃবৃন্দের কেউ আইয়ুবের মন্ত্রী হবেন না। তাঁরা অবশ্য সে কথা রক্ষা করেননি। তবে তাঁদের সঙ্গে সে সব আলোচনা ও বাকবিতণ্ডা ছাত্রলীগ কর্মী হিসেবে আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ও জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোয় সহায়ক হয়েছিল। সহজেই যে আমরা এঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারতাম তা নয়, আবার কথা বলার সময়ও হিসেব করে বলতে হতো।

এ সময়ে সর্বদলীয় ছাত্রদের পক্ষ থেকে আমরা পূর্ব বাংলার সাত-আটজন প্রথম কাতারের রাজনীতিবিদ, যেমন শেরে-এ-বাংলা এ কে ফজলুল হক, আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখের সঙ্গে দেখা করতাম। ছাত্রদের আন্দোলনের প্রতি তাঁদের সমর্থন চাইতাম। মার্শাল ল' থাকার কারণে তাঁরা কোনো রাজনৈতিক বিবৃতি দিতে চাইতেন না। বলতেন, দিলেও লাভ নেই,

কোথাও ছাপা হবে না। আমরা বলতাম, ছাপা না হোক, তবু আপনারা বিবৃতিটি দিন। কিন্তু তাঁরা বরাবরই এ ব্যাপারে তাঁদের অস্বীকৃতি জানাতেন। আমরা বুঝতাম ছাপা না হবার অজুহাত দিলেও, তাঁরা আসলে গ্রেফতার হবার ভয়ে বিবৃতি দিতে চাইছেন না। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এ ব্যাপারে একমাত্র ব্যতিক্রম।

মওলানা ভাসানীর সঙ্গে তখন পর্যন্ত আমার কোনো দেখা-সাক্ষাত হয়নি। তবে ১৯৫৬ সালে ব্রিটেনের সুয়েজ খাল আক্রমণ করার প্রতিবাদে যে ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিল হয় তার এক পর্যায়ে মওলানা ভাসানীকে নিয়ে আসা হয় মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। আগে তাঁর নাম শুনেছি, সেবার তাঁকে দেখলাম। তিনি বললেন, 'তোরা তরুণ, এত জোরে হাঁটিস! আমি বুড়ো, তোদের সঙ্গে হেঁটে পারবো কী করে? তোরা আস্তে হাঁট'।

১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের এক পর্যায়ে আন্দোলনের প্রতি রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থন আদায় করাকে আমরা একটি মুখ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করি। একদিকে সামরিক শাসন, অন্যদিকে রাজনৈতিক সংবাদ ছাপানোর ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা। উপরন্তু জেল-জুলুম-নির্যাতন তো আছেই। আমরা রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে দেখা করলাম। এ সব ক্ষেত্রে আমাকে সবাই সামনের দিকে ঠেলে দিত। কারণ আমি নাকি দেখতে সবচেয়ে আক্রমণাত্মক ছিলাম।

রাজনৈতিক ঘটনাবলীর কারণে ১৯৬০-এর দশক ছিল সারা পৃথিবীর জন্য বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো তখন বিজয়ী-বিজিত নির্বিশেষে সবাই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি পূরণে ব্যস্ত। পরাধীন দেশগুলো এ সুযোগে তাদের উপনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রামকে আরও জোরদার করে তোলে। ফল দাঁড়ালো, উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো, স্বেচ্ছায় হোক বি অনিচ্ছায়, পরাধীন দেশগুলো থেকে তাদের হাত গুটিয়ে নিতে বাধ হয়। একইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের দেশগুলো পরাধীনত মুক্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া আফ্রিকা ও ল্যাটি আমেরিকার প্রায় অর্ধশতাধিক দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। বাকি যার ছিল তারাও তখন প্রায় স্বাধীনতা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে। দ্বিতীয় বিশ্বযু পরবর্তী সময়ে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মিসর, সিরিয়

জর্দান, কঙ্গো, আলজেরিয়াসহ বহু দেশ আগে-পরে স্বাধীনতা লাভ করে। অপরদিকে বিশ্বমানচিত্রে আরও একটি নতুন ঘটনাও ঘটে এ সময়। বিজয়ী শক্তি হিসেবে রাশিয়া আরও ১৪টি দেশ নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন করে। পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া—এ দেশগুলো রাশিয়ার বাফার জোন হিসেবে একরকম স্থায়ী রূপ নেয়।

আমরা যখন ১৯৬২-এর আন্দোলনে ব্যস্ত তার কিছুদিন আগে ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কিউবা, আহমেদ বেনবেল্লার নেতৃতে আলজেরিয়া, নাসেরের নেতৃত্বে মিসর এবং বাথ পার্টির নেতৃত্বে ইরাক ও সিরিয়ার অভ্যুদয় ও অগ্রযাত্রা বিশ্ব রাজনৈতিক মানচিত্রে একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। কোরিয়ার যুদ্ধ, ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রাম এবং কম্বোডিয়া ও লাওসের ঘটনাপ্রবাহ সেসব দেশে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সফলতার প্রমাণ হিসেবে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার আগে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে চীনের বিপ্লব ছিল বিশ্ব ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা, যা সারা পৃথিবীর মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষিত ইহুদি সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনি জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামও একটি দৃষ্টান্ত যা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। আমাদের সামনেও এই দৃষ্টান্তগুলো ছিল। ১৯৬২-এর ছাত্র আন্দোলনের পর্যায়ে এগুলো আমাদের স্বাধীনতার স্পৃহা অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে যে দর্শন, সংগঠন ও কর্মযজ্ঞের প্রয়োজন, আমাদের তখন তার অভাব ছিল। এ সময়টিতে 'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্য সংগ্রহের কাজও ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে। আমাদের সংগ্রামী চেতনায় ঘাটতি ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতা প্রশ্নটি সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠন ও নেতৃত্বের অভাব আমরা উপলব্ধি করতে পারছিলাম।

আমাদের প্রবীণ রাজনীতিবিদরা তখন হাত গুটিয়ে ঘরে বসে আছেন। তাঁরা কোনো ঝুঁকি নিতে চান না। তাঁরা এমন কিছু করতে চান না যাতে তাঁদেরকে জেলে যেতে হতে পারে কিংবা অন্যভাবে তাঁরা বিপদে পড়তে পারেন। আন্দোলনের সূত্রে যে দু-একজনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি তাঁরাও আমাদের হতাশ করেন। এ অবস্থায়

কোথাও ছাপা হবে না। আমরা বলতাম, ছাপা না হোক, তবু আপনারা বিবৃতিটি দিন। কিন্তু তাঁরা বরাবরই এ ব্যাপারে তাঁদের অস্বীকৃতি জানাতেন। আমরা বুঝতাম ছাপা না হবার অজুহাত দিলেও, তাঁরা আসলে গ্রেফতার হবার ভয়ে বিবৃতি দিতে চাইছেন না। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এ ব্যাপারে একমাত্র ব্যতিক্রম।

মওলানা ভাসানীর সঙ্গে তখন পর্যন্ত আমার কোনো দেখা-সাক্ষাত হয়নি। তবে ১৯৫৬ সালে ব্রিটেনের সুয়েজ খাল আক্রমণ করার প্রতিবাদে যে ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিল হয় তার এক পর্যায়ে মওলানা ভাসানীকে নিয়ে আসা হয় মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। আগে তাঁর নাম শুনেছি, সেবার তাঁকে দেখলাম। তিনি বললেন, 'তোরা তরুণ, এত জোরে হাঁটিস! আমি বুড়ো, তোদের সঙ্গে হেঁটে পারবো কী করে? তোরা আস্তে হাঁট'।

১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের এক পর্যায়ে আন্দোলনের প্রতি রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থন আদায় করাকে আমরা একটি মুখ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করি। একদিকে সামরিক শাসন, অন্যদিকে রাজনৈতিক সংবাদ ছাপানোর ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা। উপরন্তু জেল-জুলুম-নির্যাতন তো আছেই। আমরা রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে দেখা করলাম। এ সব ক্ষেত্রে আমাকে সবাই সামনের দিকে ঠেলে দিত। কারণ আমি নাকি দেখতে সবচেয়ে আক্রমণাত্মক ছিলাম।

রাজনৈতিক ঘটনাবলীর কারণে ১৯৬০-এর দশক ছিল সারা পৃথিবীর জন্য বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো তখন বিজয়ী-বিজিত নির্বিশেষে সবাই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি পূরণে ব্যস্ত। পরাধীন দেশগুলো এ সুযোগে তাদের উপনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রামকে আরও জোরদার করে তোলে। ফল দাঁড়ালো, উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো, স্বেচ্ছায় হোক বি অনিচ্ছায়, পরাধীন দেশগুলো থেকে তাদের হাত গুটিয়ে নিতে বাধ হয়। একইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের দেশগুলো পরাধীনত মুক্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া আফ্রিকা ও ল্যাটি আমেরিকার প্রায় অর্ধশতাধিক দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। বাকি যার ছিল তারাও তখন প্রায় স্বাধীনতা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে। দ্বিতীয় বিশ্বযু পরবর্তী সময়ে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মিসর, সিরিয়

জর্দান, কঙ্গো, আলজেরিয়াসহ বহু দেশ আগে-পরে স্বাধীনতা লাভ করে। অপরদিকে বিশ্বমানচিত্রে আরও একটি নতুন ঘটনাও ঘটে এ সময়। বিজয়ী শক্তি হিসেবে রাশিয়া আরও ১৪টি দেশ নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন করে। পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া—এ দেশগুলো রাশিয়ার বাফার জোন হিসেবে একরকম স্থায়ী রূপ নেয়।

আমরা যখন ১৯৬২-এর আন্দোলনে ব্যস্ত তার কিছুদিন আগে ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কিউবা, আহমেদ বেনবেল্লার নেতৃতে আলজেরিয়া, নাসেরের নেতৃত্বে মিসর এবং বাথ পার্টির নেতৃত্বে ইরাক ও সিরিয়ার অভ্যুদয় ও অগ্রযাত্রা বিশ্ব রাজনৈতিক মানচিত্রে একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। কোরিয়ার যুদ্ধ, ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রাম এবং কম্বোডিয়া ও লাওসের ঘটনাপ্রবাহ সেসব দেশে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সফলতার প্রমাণ হিসেবে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার আগে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে চীনের বিপ্লব ছিল বিশ্ব ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা, যা সারা পৃথিবীর মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষিত ইহুদি সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনি জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামও একটি দৃষ্টান্ত যা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। আমাদের সামনেও এই দৃষ্টান্তগুলো ছিল। ১৯৬২-এর ছাত্র আন্দোলনের পর্যায়ে এগুলো আমাদের স্বাধীনতার স্পৃহা অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে যে দর্শন, সংগঠন ও কর্মযজ্ঞের প্রয়োজন, আমাদের তখন তার অভাব ছিল। এ সময়টিতে 'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্য সংগ্রহের কাজও ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে। আমাদের সংগ্রামী চেতনায় ঘাটতি ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতা প্রশ্নটি সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠন ও নেতৃত্বের অভাব আমরা উপলব্ধি করতে পারছিলাম।

আমাদের প্রবীণ রাজনীতিবিদরা তখন হাত গুটিয়ে ঘরে বসে আছেন। তাঁরা কোনো ঝুঁকি নিতে চান না। তাঁরা এমন কিছু করতে চান না যাতে তাঁদেরকে জেলে যেতে হতে পারে কিংবা অন্যভাবে তাঁরা বিপদে পড়তে পারেন। আন্দোলনের সূত্রে যে দু-একজনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি তাঁরাও আমাদের হতাশ করেন। এ অবস্থায়

নিজেদের শক্তির ওপর ভরসা করে এগিয়ে যাওয়ার কঠিন সংকল্প নেয়া ছাড়া আমাদের উপায় রইল না। সে সময়টাতে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় যাদেরকে আমরা আমাদের কাজের জন্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম তাদেরকে 'কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে'—এই দৃঢ় মনোভাবের অধিকারী করে তোলা সম্ভব হয়েছিল।

ছাত্র আন্দোলনের সময় অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ অনেক গভীর ছিল। তখন আমরা লক্ষ্য করেছি ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা আন্দোলনের চাইতে ক্ষুদ্র পরিসরে যোগাযোগের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতেন। আর দেখতাম, তারা কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনায় প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে যখন তখন রাশিয়া ও চীনের প্রসঙ্গ টেনে আনতেন। আমরা যেখানে প্রাদেশিক ও জাতীয় পর্যায়ের ঘটনাবলি নিয়ে মিটিং, মিছিল ও ধর্মঘট করতাম, তারা সেখানে রাশিয়া ও চীনের ব্যাপার এবং পুঁজিবাদী বিশ্বের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্বের বিষয়গুলোর ওপরই বেশি গুরুত্ব দিতেন। আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্থাৎ স্বাধীনতার জন্য পড়াশোনার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে আমাদের পড়াশোনা যে তাঁদের চাইতে ভিন্ন প্রকৃতির হবে তা বুঝতে পারলাম এবং সে অনুযায়ী পড়াশোনার ওপর গুরুত্ব দিলাম।

আমাদের পড়াশোনার বইয়ের তালিকা বেশ লম্বা ছিল। আন্দোলনের প্রয়োজনে সরকারি গোয়েন্দাদের চোখ এড়াতে সে সময় হল-হোস্টেলে থাকাটাই আমাদের জন্য বেশি নিরাপদ ছিল। এ সময় ব্যক্তিগতভাবে আমি ছাত্র ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে (সাইফুদ্দিন মানিক, কাজী জাফর, হায়দার রনো প্রমুখ) বিতর্কে জড়িয়ে পড়তাম। তাঁরা আমাকে *ছোটদের রাজনীতি*, *ছোটদের অর্থনীতি* পড়তে দিয়েছিলেন। পড়লামও। ভালোই লাগলো। কিন্তু মার্ক্স-এঙ্গেলসের *কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো* পড়তে গিয়েই তাঁদের সঙ্গে আমার বিবাদ দেখা দিল। বিবাদের বিষয় *কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো*কে বাইবেল, কোরআন-হাদিসের মতো বিশ্বাস করা নিয়ে। মাহবুবউল্লাহ তখন ছাত্র ইউনিয়নের নেতা। তিনিই আমাকে *কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো* জোগাড় করে দিয়েছিলেন। তখন এসব বই নিষিদ্ধ ছিল।

*কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে* 'থিংস উইল এডমিনিস্টার ইটসেলফ' (বস্তুই নিজেই নিজেকে পরিচালনা করবে) কথাটির অর্থ বুঝতে না পেরে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি কোনো উত্তর দিতে পারেননি।

সংগঠনগতভাবে ছাত্র ইউনিয়ন অন্ধের মতো সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতো—আমরা যার ঘোর বিরোধী ছিলাম। প্রথমদিকে কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোসহ কিছু বইপত্র দিয়েই আমরা মার্ক্স ও এঙ্গেলসকে বোঝার চেষ্টা করি। ঐ প্রাথমিক পর্যায়ে যদিও কমিউনিজমের বিরোধিতা করার জন্যই আমরা এসব পড়াশোনা করেছিলাম, কিন্তু পরবর্তীকালে অর্থাৎ স্বাধীনতার আগে ও স্বাধীনতার পরে এ বিষয়ে আমাদের পড়াশোনা প্রচুর বৃদ্ধি পায়। এ পড়াশোনা থেকে আমি বুঝতে পারলাম ছাত্র ইউনিয়নের সমাজতন্ত্র হচ্ছে অন্ধের ন্যায় চীন বা রাশিয়ার অনুকরণ; মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে ১৯৭০ দশকের গোড়া থেকে শুরু করে প্রায় পঞ্চাশ বছর আমার যে পড়াশোনা, তা শুধু গভীরতাই লাভ করেনি, স্থান ও কালের ব্যবধানে এবং পরিবর্তিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আমার মনে তা সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার ভিন্ন একটি রূপ গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। এ সময় মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, ট্রটস্কি, প্লেখানভ, এম এন রয়, স্ট্যালিন, মাও সে তুং, কাস্ত্রোসহ সব সমাজতন্ত্রী তাত্ত্বিকের বই পড়ার সুযোগ হয়েছে আমার।

১৯৬২-তে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দশ বছরের জন্য বহিষ্কৃত হই। আমার বাবা বিষয়টি সহজে মেনে নিতে পারলেন না। তিনি ঢাকা এলেন। ঢাকা হলের প্রভোস্ট ড. মুশফিকুর রহমানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি তাঁকে নিয়ে ভাইস চ্যান্সেলর ড. মাহমুদ হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অনার্স পরীক্ষা শুরু হওয়ার সাত দিন আগে আমার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। ঐ অবস্থাতেই আমি অনার্স পরীক্ষা দিই। প্রথম দিন পরীক্ষা শুরু হবার এক ঘণ্টা পরে আমার অ্যাডমিট কার্ড পাই। এ কারণে আমার খাতা জমা নেওয়ার জন্য শিক্ষকদেরকে অতিরিক্ত এক ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়। সে বছর আমি ছিলাম সর্বশেষ পরীক্ষার্থী। আমার রোল নম্বর ছিল ৩১৫।

পরীক্ষা শেষে আমি যেন বিরাট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখিকে মুক্তি দিলে তার যে আনন্দ, আমি শুধু সেরকম আনন্দই উপভোগ করলাম না, মনে হলো সারা বিশ্ব আমার সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। পরীক্ষার শেষ দিনে আমি আমতলা থেকে বক্তৃতা দিয়ে মিছিল বের করে তারপর কার্জন হলে পরীক্ষা দিতে গেলাম। চার ঘণ্টা পরীক্ষা শেষে গিয়ে দেখি তখনও মিটিং চলছে আর আমি যে শ্রমিকদের নিয়ে এসেছিলাম তারা আমার বক্তৃতা শোনার জন্য অপেক্ষা করছে। সেদিন সভা শুরুর বক্তৃতা যেমন আমি দিয়ে এসেছিলাম তেমনি সভা সমাপ্তির ভাষণটাও আমিই দিলাম। মাঝখানে আমার গোটা একটা পরীক্ষা দেওয়া হয়ে গেল। সভায় আমাকে দেখে তো সবাই অবাক। আমাদের কাজের বিস্তার ও দক্ষতা সম্পর্কে বলা যায়—আমি ও আবদুর রাজ্জাক দুজনে দুই-তিনশত সংগঠকের কাজ করতে পারতাম। ঢাকা শহরের কাজ তখন কাজী আরেফ করতো।

১৯৬৩ সালের প্রথমদিকে ছাত্রলীগের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে আমি ছাড়া আর সবাই গ্রেফতার হয়ে গেলেন। আমার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলেও আমি গ্রেফতার এড়িয়ে প্রায় এক বছর কাটালাম। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোতে ছাত্রলীগ সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করি। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় হল-হোস্টেল ও কলেজগুলাতে ছাত্রলীগের দ্রুত বিস্তার ঘটে। এ সময় আবার ছাত্র ইউনিয়ন তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে দুই ভাগ হয়ে যায়। এক অংশের নাম হলো ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া), অপর অংশের নাম ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)। আমরা তাদের এ দ্বিধাবিভক্তির সুযোগকে ছাত্রলীগের শক্তিবৃদ্ধির কাজে লাগাতে চাইলাম।

১৯৬৩ সালে ছাত্র আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হয়ে এলেও গ্রেফতারকৃত ছাত্রনেতারা জেলেই রইলেন। তাদের মুক্তির দাবিটি তখন মুখ্য হয়ে উঠলো। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেও কোনো লাভ হলো না। একটি বিবৃতি দিতেও তাঁরা সাহস করছিলেন না। তখনও দেশে মার্শাল ল' চলছে। এ সময় ছাত্রলীগের পক্ষে আমি ও রাজ্জাক এবং ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে দিয়ে একটি বিবৃতি দেওয়ানোর উদ্যোগ নিই। সে উদ্যোগের ফল হিসেবে দুই মাসের মাথায় একটি বিবৃতি তৈরি করা হলো। যা 'নয় নেতার বিবৃতি' হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিল। আতাউর রহমান খান, নূরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার, শেখ মুজিবুর রহমান, মাহমুদ আলী এবং আরও তিনজন পূর্ব পাকিস্তানি নেতা এতে স্বাক্ষর করেন।

সামরিক শাসনের কঠোরতার মধ্যে এ বিবৃতি প্রকাশ করে সে সময় সংবাদপত্রগুলো যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দেয়। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও তা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। সে সময় মোহাম্মদ ফরহাদের নেতৃত্বে ছাত্রদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির তৎপরতার কথাও আমরা জানতে পারি। ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ করতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির গোপন সাংগঠনিক কর্মধারার বিষয়েও আমার ধারণা হয়। এসব ধারণা আমাদের 'নিউক্লিয়াস' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলেছিল। ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের সময়ে 'ভিয়েতকং'দের সাংগঠনিক কর্মধারা সম্পর্কে তাদেরই প্রচারিত বেশ কিছু বই-পুস্তিকা ও প্রচারপত্র আমি সংগ্রহ করি। প্রথমে 'নিউক্লিয়াস' এবং পরবর্তীকালে 'বিএলএফ'-এর বিস্তৃতির ক্ষেত্রে সেগুলো খুবই সহায়ক হয়েছিল।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গঠন ও সাংগঠনিক কর্মধারা সম্পর্কে বিশদভাবে পড়ার আমার সুযোগ হলেও তা খুব বেশি কাজে আসেনি। আমার মনে হয়েছে তাদের চিন্তা ও কর্মে নিজস্বতার চাইতে রাশিয়া-চীনের অনুকরণের দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে তারা সেভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি। আমরা আমাদের নিজস্ব রাজনৈতিক-সামাজিক বাস্তবতার আলোকে ও নিজস্ব প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে নিজেদের লক্ষ্য ও কর্মধারা নির্ধারণ করেছিলাম। আর সে লক্ষ্য, পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতির কথা 'বিপ্লবী বাংলা' নামক গোপন পত্রিকার মাধ্যমে সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলাম। ১৯৬৩-এর মাঝামাঝি আমাদের মধ্যে শেষ ব্যক্তি আমি গ্রেফতার হয়ে যাই। তারপর প্রায় দুই বছর কাজী আরেফ (রাজ্জাকও তখন জেলে ছিল) আমাদের সাংগঠনিক বিস্তৃতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে।

আমাদের তিনজনের (আমি, রাজ্জাক ও আরেফ) দায়িত্ব ভাগ করা ছিল। কর্মী সংগ্রহের (রিক্রুটমেন্ট) কাজটি করতো ঢাকা শহরে আরেফ ও ঢাকার বাইরে জেলা পর্যায়ে আবদুর রাজ্জাক। আমার দায়িত্ব ছিল মূলত তত্ত্বগত দিকে, যেমন লিটারেচার তৈরি। এছাড়া রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান এবং সার্বিকভাবে সাংগঠনিক কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দিক-নির্দেশনা দানও আমার দায়িত্ব ছিল। আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল যে, রাজ্জাক প্রকাশ্য কাজে (বক্তৃতা, মিছিল ইত্যাদিতে) থাকবে। আরেফ আর আমার কোনো অবস্থায় গোয়েন্দা সংস্থার নজরে পড়া ঠিক হবে না বলে আমরা দুজন জনসমক্ষে যাওয়া থেকে বিরত থাকতাম। এই দায়িত্বভাগ বা কর্মবণ্টন আমাদের জন্য তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য রকমের সুফল বয়ে আনে।

১৯৬৩ সালের নভেম্বরে ছাত্রলীগের সম্মেলনে আমি সাধারণ সম্পাদক হই, রাজ্জাক সহ-সম্পাদক ও আরেফ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৩-এর মাঝামাঝি আমি ও রাজ্জাক জেলে যাবার আগে পর্যন্ত ছাত্রলীগকে সুসংগঠিত করার মধ্য দিয়ে ঢাকাসহ সারা পূর্ব পাকিস্তানে 'নিউক্লিয়াস'-এর কাজের বহু গুণ বিস্তার ঘটে। বলতে গেলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এমনকি স্কুলের উচ্চশ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও 'নিউক্লিয়াস'-এর আদর্শ বেশ জায়গা করে নেয় এবং তারা বাঙালির ভবিষ্যৎ নির্ধারণে স্বাধীনতাকেই একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

এক হিসেব মতে আমার জেলে যাবার আগ পর্যন্ত ঢাকা শহরেই 'নিউক্লিয়াস'-এর প্রায় ৩০০ এবং ঢাকার বাইরে ২০০ সদস্য সংগৃহীত হয়। সদস্য সংখ্যার এই বিস্তৃতি সাংগঠনিক যোগাযোগ ও শৃঙ্খলারক্ষার ক্ষেত্রে বেশ সমস্যার সৃষ্টি করে। আমরা জেলে থাকা সত্ত্বেও ১৯৬৮ সালের আন্দোলন শুরুর আগ মুহূর্ত অবধি 'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্য সংখ্যা বেড়ে ১২০০-এ দাঁড়ায়। স্বভাবতই এ সংখ্যাকে সাংগঠনিক পর্যায়ে একক সমরৈখিক রূপদান (Linear Formation) অসম্ভব হয়ে পড়ে। মূলত এ কারণে এবং স্বাধীনতার লক্ষ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক কাজকে বিভক্ত করতে ১৯৬৮ সালের শেষভাগে আমরা 'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্য সংখ্যা আর বৃদ্ধি না করে এর রাজনৈতিক শাখা হিসেবে 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স' (বিএলএফ) এবং সামরিক শাখা

হিসেবে 'জয়বাংলা বাহিনী' গঠনের সিদ্ধান্ত নিই। সে অনুযায়ী ১৯৬৯ সালে 'বিএলএফ'ও 'জয়বাংলা বাহিনী' গঠিত হয়। ১৯৬৮-'৬৯ সালে গণআন্দোলনের প্রচণ্ড গতি লাভের মধ্যে আমরা আমাদের কাজকে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে নিতে সমর্থ হই।

এর আগে ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আমাদের মধ্যে একটি সরলরৈখিক চিন্তা ও কর্মপন্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। আমরা বুঝতে পারি, পশ্চিম পাকিস্তানকে বাদ দিয়েও পূর্ব পাকিস্তান (পূর্ব বাংলা) বাঁচতে পারে; অর্থাৎ বাঙালিদের পক্ষে এককভাবে নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

## ৬-দফা আন্দোলন

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে তাঁর ৬-দফা পেশ করলেন। সে সময়ে এ দেশ থেকে বেশ কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্র বের হতো। এদের সবগুলোই ছিল পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য নিবেদিতপ্রাণ। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের দ্বারা পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকার খর্ব হচ্ছে। নানা কায়দা-কৌশলে তারা বাঙালিদের ওপর তাদের শাসন ও শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। বুনিয়াদি গণতন্ত্রের নামে দেশে আইয়ুবি একনায়কতন্ত্র চলছে। অথচ এ নিয়ে কারোর মধ্যে তেমন একটা উদ্বেগ নেই। এমনকি সে সময়ের আওয়ামী লীগপন্থি বলে পরিচিত পত্রিকা দৈনিক *ইত্তেফাক*ও শেখ মুজিবের ৬-দফাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করলো না। ইত্তেফাকে খবরটি দেওয়া হয় প্রথম পৃষ্ঠার মাঝামাঝি সিঙ্গেল কলামে মাত্র কয়েকটি লাইনে। শিরোনাম ছিল : 'শেখ মুজিবের ৬-দফা'। ইংরেজি এবং বাংলা অন্য পত্র-পত্রিকাগুলোও খবরটিকে কোনো গুরুত্ব দিলো না। ছাপলেও চোখে প্রায় না পড়ার মতো করে ছাপলো। কোনো কোনো পত্রিকা ৬-দফার দাবিগুলোর উল্লেখ না করে একে দেশ দ্বিখণ্ডিতকরণের ষড়যন্ত্র বলতে দ্বিধা করলো না।

দুই মাস পর একদিন শেখ মনি আমাকে বললো, 'দোস্ত, চল এক জায়গায় যাব। নিয়ে গেল আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির অফিসে। আমাকে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে চা খাওয়ার কথা বললো। সে ভেতরে গেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা এলো, মনিও ফিরে এলো। এসে টাইপ

করা একটি কাগজ আমার হাতে দিল। সেটা পড়তে বলে, 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি' বলে আবার ভেতরে গেল। আমি দুবার কাগজটি পড়লাম। চা খাওয়া হলো না। আমি আজ বলতে পারবো না আমার মধ্যে তখন কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। কাগজটা পড়ে আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম। মনির ফেরত আসার অপেক্ষা না করেই আমি বেরিয়ে এলাম। তারপর কতক্ষণে কীভাবে যে ইকবাল হলে ফিরে এসে রাজ্জাক ও আরেফকে খবরটা দিলাম তা আমি বলতে পারবো না! তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ল্যাম্পপোস্টের আলোতে আমরা প্রত্যেকে একবার করে কাগজটি পড়লাম। কারো মুখ থেকে কোনো কথা বেরুলো না। তিনজন পরস্পরের দিকে তাকালাম। তারপর একে অপরের হাতে হাত রেখে বললাম : 'এখন থেকে এটাই হবে আমাদের প্রথম কাজ।'

শপথ নেওয়ার ব্যাপারটি আমাদের কোনো নিয়মনীতি বা শৃঙ্খলার মধ্যে ছিল না। তারপরও আমরা সেদিন সেটা করলাম। আর ঐ কাগজটি যে আমরা তিনজন কতবার পড়েছি তার কোন হিসাব নেই।

ঐ কাগজটির শিরোনাম ছিল '৬-দফা প্রস্তাব'। আমাদের কাছে এটি ছিল স্বাধীনতার প্রস্তাব। কয়েক দিনের মধ্যে ৬-দফা বিরোধী প্রচার শুরু হয়ে গেল। আইয়ুব খান হুঙ্কার দিলেন, প্রয়োজনে অস্ত্রের ভাষায় ৬-দফার মোকাবেলা করা হবে। আওয়ামী লীগ নেতাদের অনেকে ভয়ে চুপসে গেলেন। ৬-দফার প্রশ্নে দলের ভেতরে মতামত দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এই পরিস্থিতিতে ৬-দফার পক্ষে ইতিবাচক সমর্থন এলো ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে। সভাপতি সৈয়দ মাজহারুল হক বাকি ও সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক এক যৌথ বিবৃতিতে ৬-দফার প্রতি শর্তহীন ও পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করলেন। মাজহারুল হক বাকি অবশ্য প্রথমদিকে একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। আমি একাধিক বৈঠকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে তার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করি। শেষ পর্যন্ত তিনি ৬-দফার বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে রাজি হন। বিবৃতিটি লিখে দিয়েছিলাম আমি। পরদিন দুই-একটি পত্রিকায় বিবৃতিটির কথা ছাপা হলেও এর বিষয়বস্তুর কোনো উল্লেখ কোথাও ছিল না। এমনকি ইত্তেফাকেও ছাপা হলো, '৬-দফাকে ছাত্রলীগের সমর্থন : বাকি ও রাজ্জাকের বিবৃতি'। তাও আবার

ভেতরের পাতায়। মোটকথা সে সময়ের সংবাদপত্র ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ৬-দফার প্রতি কোনোভাবে সমর্থন জ্ঞাপন করেনি; বরং বক্তৃতা-বিবৃতিতে, পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদিতে ও আলোচনার টেবিলে ৬-দফা যে 'পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার একটি ষড়যন্ত্র' অনবরত একথা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হয়েছে। এ অবস্থায় আমাদের গোপন তৎপরতা ও সাংগঠনিক জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। আমাদের সামনে উপস্থিত হলো ইতিহাস রচনার এক নতুন সুযোগ।

আগেই বলেছি, শেখ মুজিব ৬-দফা দেওয়ার পর বিভিন্ন পত্রপত্রিকা সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে এর বিরোধিতা শুরু করে। একমাত্র *ইত্তেফাক* ছিল ব্যতিক্রম। সে সময়ে পত্রপত্রিকার সংখ্যা কম ছিল, আর মালিকানা যারই হোক না কেন সাংবাদিকরা দু-একজন বাদে সবাই ছিলেন মস্কোপন্থি কিংবা চীনপন্থি। আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসার পর চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গভীরতার দিকে নেওয়ার চেষ্টা করেন। যদিও চীন-পাকিস্তান সম্পর্কের সূত্রপাত করেছিলেন পাকিস্তানের পূর্বেকার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। বামপন্থিরা কিন্তু এই সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবকে তাঁর মৃত্যু অবধি মার্কিনপন্থি বলেই অপবাদ দিয়ে গেছে। ভারতকে মোকাবেলার জন্য আইয়ুব চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বকে আরও উচ্চপর্যায়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেন। চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই পাকিস্তান সফরের অংশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন।

কূটনৈতিক পর্যায় ছাড়াও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার জন্য দেশের চীনপন্থি রাজনৈতিক নেতাদেরও কাজে লাগানো যেতে পারে—এ চিন্তা থেকে আইয়ুব খান এ সময় মওলানা ভাসানীর সঙ্গে বেশ কয়েকটি বৈঠক করেন। এভাবে সরকারের সঙ্গে মওলানা ভাসানী ও তাঁর অনুসারীদের একটা হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়। মওলানা ভাসানীর পরামর্শ অনুযায়ী সরকার ছয়জন কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্টপন্থি রাজনীতিবিদের ওপর থেকে হুলিয়া তুলে নেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল হক, অধ্যাপক আসহাবউদ্দিন, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ প্রমুখ। এঁদের মধ্যে একমাত্র অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ছাড়া বাকি পাঁচজনই ছিলেন চীনপন্থি

(মোজাফফর আহমদ রুশপন্থি ছিলেন)। চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের এই সম্পর্ক উন্নয়নের ফলে এ সময় পূর্বপাকিস্তানে চীনা কমিউনিস্ট বইপত্রের ছড়াছড়ি পড়ে যায়। দোকানে দোকানে মাও সেতুং-এর ক্ষুদে 'লাল বই' দৃশ্যমান হতে থাকে। আইয়ুব-ভাসানী সমঝোতার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল শেখ মুজিবের ৬-দফার বিরোধিতা করা।

এ সময়ে যারা ৬-দফার বিরোধিতা করতেন তাঁরা ছিলেন মূলত চীন ও রুশপন্থি। ছাত্র ইউনিয়ন ৬-দফার বিরোধিতা করতো। ছাত্র ইউনিয়ন ও জামায়াতে ইসলামের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘ ৬-দফাকে পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র এবং আমেরিকা বা সিআইয়ের দলিল হিসেবে চিত্রিত করতো। তারা বলতো, আমেরিকা ৬-দফার মাধ্যমে পাকিস্তানকে দুই টুকরো করে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানকে একটি মার্কিন উপনিবেশে পরিণত করতে চায়। তারা এও বলতে থাকে যে, ৬-দফা আসলে শেখ মুজিব বা বাঙালিদের কেউ তৈরি করেনি; এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অর্থনীতিবিদ ও মার্কিন সামরিক বাহিনীর যৌথ চিন্তার ফসল। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল বলতো। আমরা সে সময় তাদের সে অপপ্রচারের জবাব দেবার চেষ্টা করতাম।

পঞ্চাশ বছরেরও পরে আজ আমরা কী দেখছি? সেদিন যারা ৬-দফার পক্ষে জীবন দিয়ে সংগ্রাম করেছিল, বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ করেছিল, তাদের অধিকাংশই আজ ক্ষমতা এবং রাজনীতির মূলধারা থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়েছে। অথচ ৬-দফাকে সিআইয়ের দলিল এবং শেখ মুজিবকে সিআইয়ের দালাল বলা রাশেদ খান মেনন-মতিয়া চৌধুরীরা অনেকেই মন্ত্রী ও অন্যান্য পর্যায়ে রাষ্ট্র ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থান করছেন। এর আগের সরকারগুলোয় ইসলামী ছাত্র সংঘের তৎকালীন সভাপতি মতিউর রহমান নিজামী ও আরেক নেতা আলী আহসান মুজাহিদ পূর্ণ মন্ত্রী মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

## রাজনৈতিক মেরুকরণ

৬-দফাকে কেন্দ্র করে ছাত্র রাজনীতিতেও এক মেরুকরণের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে ছাত্র ইউনিয়নের মেনন-রনোরা ৬-দফাকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের চক্রান্ত এবং শেখ মুজিবকে ভারতের এজেন্ট হিসেবে

প্রচার করতে থাকে। এ অবস্থায় একমাত্র ছাত্রলীগ ৬-দফাকে তাদের 'ম্যাগনা কার্টা' (Magna Carta) বা 'অধিকারের দলিল' হিসেবে ঘোষণা দেয়। যেহেতু আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে 'স্বাধীনতা'র দিকে নিয়ে যাওয়া এবং সে মুহূর্তে আমাদের কাছে ৬-দফাই ছিল একমাত্র সে রকম রাজনৈতিক কর্মসূচি, তাই আমরা লক্ষ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের উপযোগী করে ছাত্রলীগকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাতে থাকি। পাশাপাশি মাঝে-মধ্যেই পোস্টার, দেয়াল লিখন (চিকা), বিবৃতি এবং ছাত্রলীগের ছোট-বড় সভা-সম্মেলনের বক্তৃতায় 'স্বায়ত্তশাসন', 'স্বাধিকার' ইত্যাদি কথাগুলোর মধ্য দিয়ে পরোক্ষাভাবে হলেও পূর্ব পাকিস্তানকে পৃথক স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণা চলতে থাকে।

এ পর্যায়ে 'নিউক্লিয়াস'কে সম্প্রসারিত করার সুযোগ বিশেষভাবে কাজে লাগানো হয়। 'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্য সংখ্যা এ সময় প্রায় চার হাজার হয়ে যায়। এ সংখ্যাকে কাঠামোভুক্ত করার ক্ষেত্রে আমরা বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হই। ইতিমধ্যে ঢাকায় রিকশা ও গাড়ির নাম্বার, দোকানপাট, অফিস-আদালতের সাইনবোর্ড সত্তর থেকে আশি ভাগ বাংলায় লেখা হয়ে যায়। জেলা পর্যায়ে এটি দাঁড়ায় প্রায় শতভাগ।

১৯৬৬ সালে ৬-দফা দেওয়ার পর আমার সঙ্গে শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠতা স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। তখনও আওয়ামী লীগের অফিস ১৫, পুরনো পল্টনে। অফিস থেকে ফেরার পথে তিনি প্রায়ই গাড়িতে করে আমাকে তুলে হলের কাছাকাছি অথবা ধানমণ্ডির কোথাও নামিয়ে দিয়ে বাসায় যেতেন। তাঁর বাসা তখন ধানমন্ডি ৩২-এ। এ পর্যায়ে কোনোদিন তাঁর সঙ্গে 'নিউক্লিয়াস' নিয়ে কোনো আলাপ-আলোচনা হয়নি। তবে আমার কাজের গতি ও গভীরতা, যেকোনো বিষয়ে আমার আগ্রহ, এসব তাঁর নজরে পড়তো। একদিন তিনি বললেন, 'সিরাজ, আমি হয়তো বেশি দিন বাইরে থাকতে পারবো না।' কথাটা শুনে আমার ভালো লাগলো না। আরেক দিন তাঁর সঙ্গে গাড়িতে আসার সময় আমি বললাম, 'মুজিব ভাই, আওয়ামী লীগকে বড় দলে পরিণত করতে হলে এবং দেশের সকল শ্রেণির মানুষের কল্যাণ করার উদ্দেশ্য যদি আমাদের থাকে তাহলে ব্রিটেনের লেবার পার্টির মতো করে

আওয়ামী লীগকে গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য ছাত্র-যুবকদের প্রাধান্যের পরিবর্তে দলে শ্রমিক-কৃষকদের, বিশেষ করে শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তি খুবই প্রয়োজন।

শুনে তিনি বললেন, 'আমি তো কৃষক-শ্রমিকদের উন্নতি চাই।'

আমি বললাম, 'মুজিব ভাই, এখন তো তারা শুধুমাত্র ভোট দেওয়ার মালিক।'

তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমরা দুজনেই গাড়ির পিছনের সিটে বসা। অত্যন্ত স্নেহভরে আমার ঘাড়ের ওপর হাত রেখে তিনি বললেন, 'কী বলতে চাস, বলতো?'

আমি বললাম, 'ব্রিটেনের লেবার পার্টির মতো শ্রমিক-কৃষকদের প্রাধান্য দিয়ে দলকে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে দলকে নিয়ে যেতে হবে।'

আবারও তিনি আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'সময় আসলে বলবো কখন তাদের মধ্যে কাজ করবি। তোকে দিয়েই এ কাজ সম্ভব।'

আমি বললাম, আমাদের দেশটাকে ব্রিটেনের মতো 'কল্যাণ রাষ্ট্র' (Welfare State) হিসেবে গড়ে তোলা উচিত।'

গভীর বিশ্বাস নিয়ে তিনি আবারও আমাকে বললেন, 'তুই-ই পারবি।' এর মধ্যে ধানমণ্ডিতে তাঁর বাসার কাছে আসতেই আমি নেমে গেলাম।

আর একদিন আমি বললাম, মুজিব ভাই, ৬-দফার ওপরে একটি সেমিনার করলে কেমন হয়?

তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের এই নপুংসক বুদ্ধিজীবীরা ৬-দফার কী বুঝবে রে? আর যদি সেমিনার করতে দেই, যদি না বুঝেই বিরোধিতা করে বসে, তাহলে তো উপকারের চেয়ে ক্ষতিই হবে বেশি।'

আমাদের 'স্বাধীনতা সংগ্রামে'এই বুদ্ধিজীবীদের কী ভূমিকা ছিল তা এখন আমরা সবাই জানি। যে ন্যাক্কারজনক, লজ্জাকর ও নেতিবাচক ভূমিকা তারা রেখেছে, মুজিব ভাইয়ের সেদিনকার কথায় আমি তার পূর্বাভাস পেয়েছিলাম। তখনকার শিল্পী-সাহিত্যিকদের ব্যাপারেও একই কথা। ৬-দফা ও ১১-দফা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে দু-একজন শিল্পী বাদে আর কাউকে আমরা

স্বাধীনতার সংগ্রামে শামিল করাতে পারিনি। স্বাধীনতার পর তাঁরা যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সুবিধা ভোগ করেছেন এবং করছেন তা আমাদের শিল্প-সাহিত্য জগতকে বিভ্রান্ত ও কালিমালিপ্ত করার জন্য দায়ী। এ কথা চলচ্চিত্র, সাহিত্য ও সংস্কৃতিসহ সব ক্ষেত্রের বেলায় প্রযোজ্য।

৬-দফা দেওয়ার পর এক বছর চার মাস সময়ে মুজিব ভাই সারা দেশ চষে বেড়িয়েছেন এবং এ সময় দলের তখনকার শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মারা যাবার পর আওয়ামী লীগ কার্যত দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে একভাগ ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এনডিএফ)-এ থেকে যান এবং অপর ভাগ মুজিব ভাইয়ের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে নব উদ্দীপনায় রাজনীতি শুরু করে। এই অংশের সভাপতি হলেন মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ আর সাধারণ সম্পাদক মুজিব ভাই। কাজ না করে দল ভারি করার পক্ষে আমাদের দেশে কখনোই নেতার অভাব হয় না। এনডিএফ সে কারণেই নেতাভারি সংগঠন হয়ে রইল। অন্যদিকে আন্দোলন-সংগ্রামের কর্মসূচি সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ এক রকমের নড়বড়ে সংগঠনে পরিণত হলো। দলের পূর্ণাঙ্গ জেলা, মহকুমা কমিটি দশটির বেশি ছিল না। থানা পর্যায়ে মুজিবভক্ত দুই-একজন করে ছিলেন। তাও সব থানায় নয়।

৬-দফা কর্মসূচি নিয়ে সারা দেশ চষে বেড়ানোর ব্যাপারে মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে আমার ব্যাপক আলাপ-আলোচনা হতো। জেলা পর্যায়ে জনসভা করার জন্য ঢাকা থেকে লিফলেট ছাপিয়ে মাজহারুল হক বাকি ও আ স ম আবদুর রবকে পাঠানো হতো। কোথাও আবার পাঠানো হতো আবদুর রাজ্জাক ও আ স ম আব্দুর রবকে। কিছু টাকা দিয়ে দেওয়া হতো যাতে মিটিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা ঐ শহরে অবস্থান করতে পারেন। কোথাও কোথাও মাইকিং করার লোকও পাওয়া যেত না। সেক্ষেত্রে রব ও স্থানীয় কোনো একজনকে নিয়ে মাইকিং করার ব্যবস্থা করা হতো। দুই-একটা ছাড়া সব জেলা শহরেই তখন এভাবে মিটিং করার ব্যবস্থা হতো। এ পর্যায়ে ছাত্রলীগকে নিজেদের সংগঠনের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের কাজকর্মও করতে

হতো। আর তা করতে গিয়ে রাজ্জাক আমাদের 'নিউক্লিয়াস'-এর কাজও ত্বরান্বিত করার সুযোগ পেতো।

ঢাকার বাইরে 'নিউক্লিয়াস'-এর সংগঠন ও শক্তি গড়ে উঠতে থাকলো দ্রুততার সঙ্গে। এ সময়ে মুজিব ভাইয়ের দেশব্যাপী সফর এবং তাঁর জনসভাগুলোতে লোক-সমাগমের বিষয়টি সরকারের বিশেষ নজরে পড়তে শুরু করলো। জেলা সফরের প্রায় শেষ পর্যায়ে সিলেটে জনসভার পরপরই তাঁকে গ্রেফতার করা হলো। সেদিনই তিনি কোর্ট থেকে জামিন নিয়ে ঢাকায় এলেন। পরের সভাটি ছিল নারায়ণগঞ্জে। সভার আগের রাতে অফিস থেকে (৫১, পুরানা পল্টন) আমাকে গাড়িতে করে একসঙ্গে নিয়ে এসে ধানমণ্ডিতে নামিয়ে দেওয়ার সময় তিনিও নামলেন। রাস্তার একপাশে গাড়ি রাখতে বললেন ড্রাইভারকে। তারপর আমার ঘাড়ের ওপর হাত দিয়ে দশ-পনের গজ হেঁটে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কালকে নারায়ণগঞ্জ মিটিংয়ের পর আমাকে গ্রেফতার করবে এবং সরাসরি জেলে নিয়ে যাবে। তুই কিন্তু কাজ করে যাবি। তোদের কাজ যেন এক মুহূর্তের জন্যও থেমে না থাকে। তোরাই হচ্ছিস বাঙালি জাতির ভবিষ্যৎ। আওয়ামী লীগের অবস্থা তো তুই জানিস। সরকার হয়তো এবার আমাকে অনেকদিন জেলে রাখবে। জামিনও পাবো না।' আমার হাতে পনের শত টাকা দিয়ে বললেন, 'এটা রাখ। খুব অসুবিধায় পড়লে তোর ভাবির সঙ্গে দেখা করিস।'

আমি বললাম, 'এছাড়া আর কার সঙ্গে আমি যোগাযোগ রাখবো?'

তিনি আওয়ামী লীগের কারো নাম না বলে সেগুনবাগিচার একটি বাসার নম্বর দিয়ে বললেন, 'নুরুল এসলাম।'

আমি বললাম, 'নূরুল ইসলাম'?

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'।

মনটা তাঁর বেশ ভারি মনে হলো। তিনি গাড়িতে উঠলেন। আমিও ইকবাল হলের দিকে চলে এলাম।

৫১ পুরানা পল্টনে অফিস নেওয়ার আগে আওয়ামী লীগের ১৫ পুরানা পল্টনের অফিসটি ছিল দুই রুমের একটি বাসা। অফিস খরচ চালাতে অসুবিধা হতো। বিল না দিতে পারার কারণে বাড়িওয়ালা ইলেকট্রিক লাইন কেটে দিতেন। ফলে আমাদেরকে সন্ধ্যা অথবা রাতের বেলায় প্রায়ই হারিকেন জ্বালিয়ে কাজ করতে হতো।

মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে তাজউদ্দিন ভাইও জেলে যান। এ সময়ে মিজানুর রহমান চৌধুরী সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। কয়েক মাস পরে মিজান ভাইও গ্রেফতার হয়ে গেলেন। তখন দলের মহিলা সম্পাদিকা আমেনা বেগমকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হলো। ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গাজী গোলাম মোস্তফা ভাইও তখন জেলে। আমেনা বেগম প্রতিদিনই অফিসে আসতেন। আমি ও রাজ্জাক ছাড়া আরেফ দুই-একদিন অন্তর আওয়ামী লীগ অফিসে আসতো।

শেখ সাহেবের ৬-দফা কর্মসূচি ঘোষণা দেশের মানুষের কাছে যেমন, তেমনি আমাদের কাছেও ছিল আকস্মিক একটি ঘটনা। পরবর্তীকালে শুনেছি ৬-দফা প্রণয়ন-এর মূল উদ্যোক্তা ছিলেন কাজী আহমেদ ফজলুর রহমান, রুহুল কুদ্দুস ও শামসুর রহমান খান (জনসন)। এঁরা তিনজনই ছিলেন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। এছাড়া তাজউদ্দিন সাহেব তো ছিলেনই। শেখ মুজিবের সম্মতিক্রমেই এই ৬-দফা প্রণয়নের কাজটি শুরু হয়। তিনিই তাজউদ্দিন ভাইয়ের এ কাজে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকার ব্যবস্থা করেন। উপরোক্ত সিএসপি কর্মকর্তাদেরও তাজউদ্দিনের এই অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে জানানো হয়। আরও দুজনের অন্তর্ভুক্তির কথা শুনেছি। কিন্তু তাঁরা কারা জানতে পারিনি। মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার আলাপ হলেও তিনিও আমাকে এই তিনজনের বাইরে আর কারও নাম বলেননি। ৬-দফা প্রণয়নকারীরা শুধু যে উচ্চশিক্ষিতই ছিলেন তা নয়, জ্ঞান ও মেধার দিক থেকেও অনেক উপরের স্তরের মানুষ ছিলেন তাঁরা। ৬-দফা প্রণয়নকালে মুজিব ভাইয়ের রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্যের কথা তাঁদের মাথায় ছিল। আর মুজিব ভাইও ৬-দফাকে সেভাবেই বুঝতেন।

৬-দফার দফাগুলো সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে এটি স্পষ্ট হয় যে, ভবিষ্যতে পাকিস্তানের দুই অংশ একত্রে থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। প্রথমদিকে আমাদের কাছে যখন কর্মসূচিটি এলো, আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, আমরা একে চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার কর্মসূচি হিসেবেই গ্রহণ করি।

'নিউক্লিয়াস'-এর তরফে এ সময়ে কয়েকটি বিষয়কে আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হয়। এক. ৬-দফার প্রচার ও বাস্তবায়নে প্রধানত ছাত্র-যুবশক্তিকে সংগঠিত করতে হবে। দুই. সংগঠিত হবার এ পর্যায়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের উভয় গ্রুপের সমর্থন জরুরি। তিন. এ পর্যায়ে 'নিউক্লিয়াস'-এর সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি কেবল প্রয়োজনীয়ই নয়, 'নিউক্লিয়াস'-এর চূড়ান্ত লক্ষ্য যে স্বাধীনতা তা অর্জনের জন্যও এটি হবে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। চার. জনগণের কাছে ৬-দফাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাথমিকভাবে হলেও একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি দেওয়া প্রয়োজন। সে জন্য ছাত্র ধর্মঘটসহ হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে মুজিব ভাই ও তাজউদ্দিন ভাই গ্রেফতার হয়েছেন। মিজান ভাই ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। আমি তিন ও চার নম্বর বিষয় দুটি তাঁর কাছে উত্থাপন করলাম। মিজান ভাইয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল, আমাকে বিশ্বাসও করতেন পুরোপুরি। তিনি হেসে হেসে বললেন, 'সিরাজ, তুমি তো আমাকে বিপদে ফেলবা না?' কথাটা তিনি অবশ্য হাল্কা সুরেই বললেন। তারপর জানতে চাইলেন, 'সিরাজ, আমাকে কী করতে হবে'?

আমি বললাম, আওয়ামী লীগ থেকে দুটি সাপোর্ট চাই। প্রথমত, হরতালটা আহ্বান করতে হবে আওয়ামী লীগের নামে। ৬-দফার উল্লেখসহ মুজিব ভাইয়ের মুক্তি দাবি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে আপনার কাছে রাখবেন খরচের জন্য।'

তিনি হেসে বললেন, 'আমার কিন্তু দুইটা কাজ, মনে রেখো সিরাজ।'

হরতালের ব্যাপারটি নিয়ে আমরা প্রথমে আমাদের 'নিউক্লিয়াস'-এ সিদ্ধান্ত নিই। মনির সঙ্গে আলাপ করি। তারপর আমি, মনি, রাজ্জাক ও মাজহারুল হক বাকি—এই চারজন আলাপ করি।

## হরতাল পরিচালনা

সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে পুরো কাজটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করলাম। দায়িত্বও বণ্টন করলাম সেভাবে। ১. ছাত্রদের জন্য মনি, মাজহারুল হক বাকি ও রাজ্জাক ২. শ্রমিকদের জন্য আমি ও মেজবাহ (বর্তমানে

অঙ্কুর প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী)। ছাত্রদের কাজ মনির তত্ত্বাবধানে সুন্দরভাবে হয়েছিল। আমরা হরতালের প্রস্তুতির জন্য সাতদিনের সময় নিয়েছিলাম। হরতালের তারিখ ছিল ১৯৬৬-এর ৭ জুন। শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠনের কাজ করার জন্য আমার একটি পঞ্চাশ সিসি হোন্ডা মোটর সাইকেল ছিল। তখন ঢাকায় মোটর সাইকেল শ'চারেক। আমার মোটর সাইকেল দিয়ে আমি ও মেজবাহ টঙ্গি থেকে তেজগাঁও হয়ে ডেমরা-আদমজি পর্যন্ত চারদিনে শ্রমিকদের সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগ করে ফেলি। এই যোগাযোগের সূত্র ছিল প্রধানত সেসব এলাকার কলেজগুলোর ছাত্রলীগ কর্মী ও আমাদের 'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্যরা। তারা এই দুরূহ কাজটি কত সহজভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে করেছিল, আজকের দিনে কাউকে তা বলে বিশ্বাস করানো যাবে না। দ্বিতীয় সূত্রটি ছিল, এলাকার শ্রমিক নেতারা যাঁদের অধিকাংশের বাড়ি ছিল নোয়াখালী। আমি এই নোয়াখালী সূত্রটিকে খুব সফলভাবে কাজে লাগাতে পেরেছিলাম।

এসব 'শিল্পাঞ্চলে'র শ্রমিক সংগঠনগুলো ছিল অন্যদের দখলে। যেমন আদমজিতে ছিল নির্মল সেনদের দলের শ্রমিক সংগঠন, নারায়ণগঞ্জ ও মদনগঞ্জ (বন্দর) এলাকায় কাজ করতো কাজী জাফরদের 'পূর্বপাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন'। আদমজির দ্বিতীয় কাতারের নেতাদের মধ্য থেকে সাইদুল হক সাদুকে পেলাম। সাদুকে নিয়ে মদনগঞ্জ অর্গানাইজ করা হলো। টঙ্গিতে ছিলেন নোয়াখালীর আবদুল মান্নান। তাঁকে পাওয়া গেল। তেজগাঁয়ে ছিলেন রুহুল আমিন ভূঁইয়া। প্রায় একশত শ্রমিক ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। তাঁকেও পেলাম। তাঁরা ওসব এলাকায় হরতাল পালনের পুরো দায়িত্ব নিলেন।

দ্বিতীয় সারির এসব শ্রমিক নেতা আমাদের জানালেন হরতাল কর্মসূচি সফল করার জন্য তাঁদের সর্বমোট এক হাজার টাকা প্রয়োজন। মিজান ভাই দুদিন ঘোরাঘুরি করে টাকা সংগ্রহ করলেন। হরতালের দুদিন আগে এই নেতাদের পৃথকভাবে মিজান ভাইয়ের সামনে নিয়ে গেলাম। মাথায় একটা তোয়ালে মুড়ে মিজান ভাই ১৫, পুরানা পল্টনে আওয়ামী লীগ অফিসে এলেন। হরতাল পালনের বিভিন্ন কাজের জন্য শ্রমিক নেতাদের সর্বমোট ৮৭৫ টাকা দেওয়া হলো।

তখন হরতালের সময় গাছের গুঁড়ি অথবা ট্রাকের টায়ার জ্বালিয়ে ব্যারিকেড (প্রতিবন্ধকতা) তৈরির প্রচলন ছিল না। ঢাকা শহরের চারপাশে নির্মাণ কাজ চলতে থাকে সারা বছর ধরে। এক ইঞ্চি, দুই ইঞ্চি ফাঁকে ফাঁকে ইট বিছিয়ে কিছু কিছু জায়গায় পেট্রোল ঢেলে দিয়ে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করা হতো। হরতালের আগের রাতে ছোট ছোট লাঠির মাথায় কাপড় অথবা পাট জড়িয়ে তাতে আগুন জ্বেলে মিছিল করা হতো, যা পরবর্তীকালে মশাল মিছিল নামে পরিচিতি পায়। খণ্ড খণ্ড মিছিল করে হরতালের প্রচার করা হতো। শ্রমিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে এলাকার ছাত্রলীগ ও 'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্যরা গোপনভাবে হরতালকারী শ্রমিকদের সঙ্গে এক হয়ে কাজ করতো। কেন্দ্র থেকে তাদেরকে এভাবেই নির্দেশ দেওয়া হতো।

ঢাকা শহরে ছাত্রলীগ কর্মীদের তিন থেকে পাঁচজনের খণ্ড খণ্ড গ্রুপ সরকারি ইপিআরটিসি-র (বর্তমানে বিআরটিসি) বাসগুলোর ওপর আক্রমণ চালাতো। তার আগে বাস থামিয়ে যাত্রীদের নেমে যেতে বলতো। মুসলিম লীগের গুণ্ডাপাণ্ডারা বা পুলিশ হামলা করলে হরতালকারী ছাত্র-শ্রমিকরা কখনও কখনও সেসব বাসে অগ্নিসংযোগ করতো। সে সময়ে প্রাইভেট বাস বলতে গেলে ছিলোই না, ট্রাকেরও তেমন ব্যবহার বা চলাচল চোখে পড়ত না। হরতালের আগের দিন প্রাইভেট গাড়িসহ ঢাকা শহরের প্রায় ৫০টি জায়গায় গাড়ি থামিয়ে হরতালের কথা বলা হলো। অনুরোধ করা হলো কেউ যেন হরতালে গাড়ি বের না করেন। শহরে অসংখ্য খণ্ড মিছিল বের করা হলো। পিকেটিং করার জন্য ৫০/৫৫টি স্থান নির্দিষ্ট করা হলো।

হরতালের দুদিন আগে থেকে এসব কার্যক্রম পরিচালিত হলো। দোকানপাট বন্ধের ব্যাপারে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ কর্মীরা বিরাট ভূমিকা রাখলো। ৭ জুন হরতাল। অথচ ৬ জুন দুপুর ২টা থেকে ঢাকার রাস্তা গাড়িশূন্য হয়ে যায়। দোকানপাটগুলো ৫টা বাজতেই বন্ধ হয়ে গেল। সারা শহরে রিকশার সংখ্যা তখন হাজার-পঞ্চাশ। তাদেরকে হরতালের পক্ষে সংগঠিত করতে বেশি বেগ পেতে হয়নি। ট্রেন চলাচল বন্ধের জন্য রাতেই কয়েকটি জায়গায় রেললাইন তুলে ফেলা, স্লিপার ও ফিশপ্লেট খুলে ফেলা এবং লাইনের উপরে আড়াআড়িভাবে লোহার রেল ফেলে রাখা হলো। এসবের ফলে ৭

তারিখ সকাল পাঁচটা থেকে আটটার মধ্যে গোটা ঢাকা শহর যেন এক যুদ্ধবিধ্বস্ত নগরীতে পরিণত হলো। হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে এলো। ছাত্রদের ও শ্রমিকদের খণ্ড খণ্ড মিছিল সেদিন ঢাকা শহরকে এক ভিন্ন চেহারা দেয়।

ঢাকার বাইরেও স্থানীয় কলেজ শাখা ছাত্রলীগের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলা শহর এবং ছোট ছোট শিল্প এলাকাগুলোতে হরতালের পক্ষে প্রচার ও মানুষকে সংগঠিত করার কাজ হয়। হরতালের দিন সেসব এলাকায় যেমন চট্টগ্রাম বন্দর, সীতাকুন্ড শিল্পাঞ্চল, খুলনার খালিশপুর ও উত্তরবঙ্গের সৈয়দপুরে জনজীবন অচল ও স্বাভাবিক কর্মপ্রবাহ থমকে দাঁড়িয়ে যায়। ১৯৬৬ সালের ঐ দিন পর্যন্ত সারা দেশে 'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্য সংখ্যা দেড় থেকে দুই হাজারে দাঁড়িয়েছিল। ঢাকার বাইরে হরতাল সফল করতে এই 'নিউক্লিয়াস' সদস্যরাই আসলে প্রধান ভূমিকা রাখে। সেদিন নদী-বন্দরগুলোয় কোনো নৌকা বা লঞ্চ যাতায়াত করেনি। পুরো প্রদেশে ট্রেন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকা শহর ছিল অচল। দোকানপাট, শিল্পকারখানা ও স্কুল-কলেজ ছিল বন্ধ। দুপুরের পর থেকে ঢাকা শহর জনতার শহরে পরিণত হয়। ছাত্র-শ্রমিকরা এক হয়ে এটিকে মিছিলের নগরীতে পরিণত করে।

হরতাল পরিচালনার জন্য আমাদের দুটি কেন্দ্র ছিল। একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ডাকসু' অফিস। এলাকা হিসেবে জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা কলেজ ও তিতুমীর কলেজ ছিল তার উপকেন্দ্র। দ্বিতীয়টি আওয়ামী লীগ অফিস। এটি ছিল শ্রমিক এলাকা নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র। আমি ঐ কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলাম। ঢাকা শহরের হরতালের দায়িত্ব ছিল আমার। বিকেল ৪টার দিকে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু আওয়ামী লীগ অফিসে এলো তার প্রিন্স গাড়িটি নিয়ে। তাতে 'সংবাদপত্র' লেখা। সে আমাকে বললো, 'সিরাজ ভাই, তেজগাঁয়ে একজন শ্রমিক পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। ইত্তেফাক অফিসে খবরটি এসেছে।' আমি আর মঞ্জু তার 'সংবাদপত্র' লেখা গাড়িটিতে করে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলের দিকে রওয়ানা হলাম। শাহবাগে এসে আমরা আর সামনে যেতে পারলাম না। রাস্তায় ইট বিছানো থাকার কারণে রিকশা, গাড়ি বা বাস কোনো ধরনের যানবাহনই চলতে পারছিল না। ফিরে আসতে আসতে দেখলাম ছোট ছোট কয়েকটি মিছিল। মিছিলগুলো আওয়ামী লীগ অফিসে এলো।

সবকটি মিছিল তেজগাঁও থেকে আসা। মিছিলের লোকজনের কাছ থেকে আমি ও মঞ্জু হরতালের বিবরণ ও পুলিশের গুলির বর্ণনা বিশদভাবে শুনলাম। প্রায় এ সময়েই (বিকেল ৫টা) আওয়ামী লীগ অফিসে পুলিশের একটি গাড়ি এসে দাঁড়ালো। জানতে চাইলো, 'এখানে সিরাজুল আলম খান কে আছেন'? আমরা বেশ কয়েকজন তখন ঐ অফিসে। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'আমি।'

একজন পুলিশ অফিসার বললেন, 'আপনাকে আমাদের সঙ্গে যাত্রাবাড়ি পর্যন্ত যেতে হবে।' বললেন, 'যাত্রাবাড়ির ওখানে আদমজি ও ডেমরা থেকে আসা বিশ হাজার শ্রমিক দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচ-সাত হাজার মশাল হাতে।' অফিসার আরও বললেন, 'তাদের নেতা সাদু বলেছেন, তারা ঢাকায় হরতাল করতে এসেছে এবং আপনার সঙ্গে দেখা করবে।' প্রথমে আমার বিশ্বাস হলো না। কিন্তু পুলিশের জিপে করে আসা আদমজির অন্য এক শ্রমিক নেতা শফি আমাকে বললো, 'সাদু ভাই আপনার হুকুম ছাড়া ফিরে যাবে না। পুলিশ আপনাকে নিয়ে যাবে বলে ওয়াদা করেছে।' শফির কথা শুনে আমার বিশ্বাস হলো।

আওয়ামী লীগ অফিসে তখন ছাত্ররাসহ আমাদের জনাবিশেক লোক ছিল। আর ছিল মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ (বর্তমানে অঙ্কুর প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী)। আওয়ামী লীগের কেউ নেই। হরতাল সফল করতে পুরনো ঢাকার চার-পাঁচটি এলাকায় আওয়ামী লীগের কয়েকজন কর্মী দায়িত্ব পালন করেছিল। আমি জীপে করে যাত্রাবাড়ি গেলাম। সেখানে যে চিত্র দেখলাম তা বর্ণনা করে বোঝানো যাবে না। যুদ্ধে জয়ী সৈন্যরা যেভাবে পরস্পরের সঙ্গে গা মিলিয়ে কিছুটা সময় বিশ্রাম নেয়, অনেকটা তেমন।

স্থানীয় কয়েকজন লোক গ্লাসে করে লেবু পানি দিচ্ছিল সবাইকে। যাত্রাবাড়ি থেকে ডেমরা পর্যন্ত রাস্তায় খালি মানুষ আর মানুষ, অসংখ্য শ্রমিক। বিশ্রাম নিচ্ছে, কিন্তু চোখে-মুখে সংগ্রামের দৃঢ়তা। সেদিন পূর্ব বাংলার মানুষের যে সংগ্রামী চেহারা দেখেছিলাম তা থেকেই বুঝেছিলাম, আগামীতে এই সংগ্রাম কোনদিকে মোড় নেবে। ব্যারিকেড থাকার কারণে আমাদের যাত্রাবাড়ি পৌঁছতে দুই ঘণ্টা সময় লেগেছিল। সামনে থাকা

পুলিশের গাড়ি থেকে নেমে পুলিশ সদস্যরা ইট সরিয়ে দিচ্ছে আর আমাদের গাড়ি আস্তে আস্তে সামনে এগুচ্ছে। পুলিশ অফিসার বললেন, 'আসার সময় এভাবেই ইট সরিয়ে সরিয়ে আসতে হয়েছে। আমরা যাবার পর আবার ইট পাতা হয়েছে দেখছি।'

আমরা পৌঁছুতেই সাদু ও আরও দুই-একজন এগিয়ে এলেন। আমি ওদের বললাম, 'হরতাল হয়েছে। তোমরা এবার ঘরে ফিরে যেতে পারো।' পুলিশ অফিসার বললেন, 'এই হাজার হাজার শ্রমিকের মিছিলের সামনে পুলিশের গাড়ি থাকবে, পেছনেও পুলিশের গাড়ি থাকবে।'

আমি বললাম, 'ভালো হবে।'

সাদুকে দেখে আমি বুঝলাম দু'তিন দিন তার ঘুম নেই। মদনগঞ্জের জুট মিল শ্রমিকদের সে সংগঠিত করেছে এবং নারায়ণগঞ্জের হরতালও তারাই সফল করেছে। যদিও নারায়ণগঞ্জে তোলারাম কলেজের ছাত্ররাই মূল দায়িত্ব পালন করে। তোলারাম কলেজের মনিরুল ইসলাম নামের বিএ প্রথম বর্ষের ও হাবিবুর রহমান খান (হাবিব) নামের এক স্কুল ছাত্র মূল ভূমিকায় ছিল। হাবিবুর রহমান খান বর্তমানে একজন সার্থক চলচ্চিত্র প্রযোজক।

সাদুকে বললাম, 'তুমি পুলিশের গাড়িতে ওঠো।' সে প্রথমে রাজি হলো না। আমি তখন বললাম, 'ওঠো! অন্তত যেতে যেতে একটু বিশ্রাম হবে।' পুলিশও বললো,'আপনি আমাদের সঙ্গে থাকেন।'

ফিরে যাবার সময় মিছিলের গতি ছিল মন্থর। প্রায় তিন ঘণ্টা হেঁটে রাত সাড়ে দশটা নাগাদ মিছিলটি আদমজি পৌঁছায়। পরের দিন সংবাদপত্রগুলোতে হরতাল পালনের খবর খুবই দায়সারাভাবে ছাপা হয়। তেজগাঁয়ে শ্রমিক মনু মিয়া নিহত হবার খবরটি অবশ্য ছাপা হয়। তবে সেদিনের হরতালের খবরটি যেভাবে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তা পড়লে যিনি বিস্তারিত খবরাখবর রাখেন না কিংবা খবরকে তেমন গুরুত্ব দেন না, তার পক্ষে ৭ জুনের ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। একটি দিনের কর্মসূচি ও একজনের মৃত্যু কোনো দেশের রাজনীতিকে কতদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, আন্দোলনের জনসম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে তা কী বিরাট ভূমিকা

পালন করতে পারে, তার এক ঐতিহাসিক নিদর্শন হলো ১৯৬৬ সালের ৭ জুন।

সরকারের আরোপিত নানা বিধি-নিষেধ, সাংবাদিকদের অনাগ্রহ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের অংশগ্রহণ ছাড়াই ৭ জুন হরতালের সাফল্য প্রমাণ করলো, রাজনৈতিক দল সমর্থন বা অংশগ্রহণ না করলেও জনতার সংগ্রাম থেমে থাকে না। ৭ জুনের হরতালে ছাত্রদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে শেখ ফজলুল হক মনির পরিকল্পনা এবং মাজহারুল হক বাকি ও রাজ্জাকের সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল তাদের জন্য এক মহাপরীক্ষা। আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে মিজান ভাই ছাড়াও মোয়াজ্জেম ভাইয়ের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

হরতালের আগে ও হরতালের দিন পুলিশের তৎপরতা থাকলেও কোনো ধরনের মামলা বা হয়রানি খুব একটা দেখা যায়নি। কিন্তু হরতালের পর থেকে পুলিশের তৎপরতা আকস্মিকভাবেই বেড়ে গেল। শ্রমিক এলাকায় বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। আমরা জামিনে তাদের মুক্ত করলাম। ৭ জুনে সংঘটিত এত বড় ঘটনার পরেও ৬-দফার প্রতি সংবাদপত্র, সাংবাদিক সমাজ, রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী মহলের কোনো প্রকার আগ্রহ দেখা গেল না। ১৯৬০-এর দশকের প্রথমভাগে কবি-সাহিত্যিক-সংবাদিকদের প্রতি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার ফল এভাবেই ফলতে দেখা গেল। ১৯৬০ দশকের শেষার্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর সরকারের বিধি-নিষেধ আরোপ করার পরই কেবল আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকদের একাংশ এবং বামপন্থি বুদ্ধিজীবী (তাত্ত্বিক বিপ্লবী হিসেবে পরিচিত) মহলকে এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে দেখা দেয়। মাত্র কিছুদিন আগে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধকে উপলক্ষ করে মুসলিম জাতীয়তা ও ইসলামি তাহজিব-তমদ্দুনের প্রতি প্রেম যাদের ভাসিয়ে নিয়েছিল, তারাই যেন হঠাৎ এ সময় তাদের বাঙালি সত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন।

৭ জুনের পর সারা দেশে রাজনৈতিক মহলে ৬-দফা প্রধান আলোচনার বিষয়ে (পক্ষে-বিপক্ষে) পরিণত হয়। আমাদের মনে হলো এই আলোচনা-বিতর্কটা শেষ পর্যন্ত আমাদের লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক হবে। হয়েছিলও তাই। ঐ সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পূর্ব

পাকিস্তানের সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচনে ছাত্রলীগ বিপুলভাবে জয়ী হয়। এর আগে এসব সংসদের ৬০-৬৫% নিয়ন্ত্রণ করতো ছাত্র ইউনিয়ন। ১৯৬৬, '৬৭ ও '৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের কলেজ ছাত্র সংসদগুলোর নির্বাচনে আমরা ৯০%-এর বেশি কলেজে জয়ী হই। এই সমর্থন আমাদের অতিরিক্ত মনোবল, আত্মবিশ্বাস ও সাহস যোগালো। ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এই সাফল্যকে আমরা 'নিউক্লিয়াস'-এর সমর্থন ও শক্তিবৃদ্ধির কাজে লাগাতে পারলাম।

এরই পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনকে আন্দোলনে আনার জন্য আমাদের চেষ্টা অব্যাহত থাকে। ছাত্র ইউনিয়নের নেতাদের মাধ্যমে আমি ফরহাদ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। বহু অনুরোধের পর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত হলো। ফরহাদ ভাই তখন কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করার মূল দায়িত্বে ছিলেন। ফরহাদ ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় তাঁর মনোভাব ছিল সহযোগিতামূলক। যদিও তিনি ৬-দফাকে আন্দোলনের মূল বিষয় হিসেবে গণ্য করতে রাজি হলেন না। তবে ছাত্রলীগের সঙ্গে ছাত্র ইউনিয়নের সুসম্পর্ক বজায় রাখতে তার আপত্তি ছিল না, বরং আগ্রহই লক্ষ করেছি।

ফরহাদ ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা থেকে আমি তাঁদের আসল রাজনৈতিক মনোভাবটা বুঝতে পারলাম। তবু ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক বাদ দেওয়া উচিত মনে করলাম না। 'মেনন গ্রুপ' ছাত্র ইউনিয়ন তখন সংগঠিত হচ্ছে। তারা তাদের গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র ইত্যাদি তৈরি করার পর আমাকে পড়ে শোনালেন। তাদের রাজনীতির মূল কথা পাকিস্তানভিত্তিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। আলাদাভাবে পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক রাজনীতি করার অর্থ তাঁদের মতে সিআইএ এবং ভারতের কাছে রাজনৈতিক আত্মসমর্পণ। আমি তাঁদের মূল নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি কিনা জানতে চাইলে তাঁরা বললেন, 'তাঁরা তো আত্মগোপনে থাকেন। তারপরেও সম্ভব হবে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা ডাক্তার মর্তুজার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তাঁর রাজনৈতিক সম্পর্কের কথাও (কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য) আমি জানতাম। সেই সুবাদে কমিউনিস্ট নেতাদের কারও সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হবে কিনা জানতে চাইলে

ডা. মর্তুজা গোপনে তাঁদের সঙ্গে আমার আলাপের ব্যবস্থা করলেন। তোয়াহা ভাই (মোহাম্মদ তোয়াহা) ও হক ভাই (আবদুল হক) আমার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হলেন। একদিন রাত ১১টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত ইকবাল হলের ২/৩টি রুমে পর্যায়ক্রমে (নিরাপত্তার কারণে) মোট ছয় ঘণ্টা আলাপ হলো। আলোচনায় তাঁরা ৬-দফাকে এক কথায় সিআইএ প্রোগ্রাম বলে অভিহিত করলেন। এছাড়া তাঁদের স্থির বিশ্বাস শেখ মুজিব হলেন ভারতের এজেন্ট। আর রাজনীতিবিদ হিসেবেও তিনি অত্যন্ত অযোগ্য ও নিম্নমানের। সুতরাং তাঁর নেতৃত্বে কোনো বড় কাজ করা সম্ভব নয়। তাঁরা এও বললেন, মুজিবের নেতৃত্বে ৬-দফা আন্দোলনকে সামনে রেখে এগিয়ে গেলে সেটা হবে রাজনৈতিক আত্মহত্যার শামিল। সেই সঙ্গে তাঁরা আবার এও বললেন, ঐ মূহূর্তে পাকিস্তানভিত্তিক রাজনীতি করলেও, তাঁদের অবস্থান শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার পক্ষেই। তোয়াহা ভাই বরং আরও এক ধাপ এগিয়ে বললেন, ১৯৪৮ সালেই তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ছাড়া গত্যন্তর নেই—এ ধরনের রাজনৈতিক বক্তৃতা দিতেন আর সে সময়ই তিনি স্বাধীনতা চেয়ে একটি নিবন্ধও লিখেছিলেন। এসব বলে তাঁরা আমাকে বোঝাতে চাইলেন যে, তাঁরাও আসলে স্বাধীনতার পক্ষে, তবে ৬-দফা দিয়ে, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে কিংবা ভারত বা আমেরিকার লেজুড়বৃত্তি করে সে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়।

১৯৬৫-'৬৬-এর পর থেকে ১৯৭১-এর মার্চ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত কোনো কবি-সাহিত্যিক বাঙালির স্বাধীনতার পক্ষে কোনো প্রবন্ধ, নাটক বা উপন্যাস লেখেননি। একটি ছড়া পর্যন্ত তারা লিখতে পারলেন না। ২৫ মার্চের ধ্বংসলীলার আগ পর্যন্ত এরা ছিলেন প্রায় নির্বাক। মনের নিভৃতে তাঁদের অনেকে হয়তোবা স্বাধীনতার গোপন বাসনা পুষে রেখেছিলেন। কিন্তু বাসনার ঐ শিখাটি আলো দিতে পারেনি আর একজন মানুষকেও। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এঁদের অনেকে আরোহন করেছেন খ্যাতির শীর্ষে, অভিষিক্ত হয়েছেন নানা সম্মান পদ ও পুরস্কারে।

তবে কারো জন্যই কোনো কিছু অপেক্ষা করে থাকে না। বয়স্ক কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা দালালি করেছেন। কিন্তু ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের তরুণ-যুবারা তাঁদের শিল্প-সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে জাগরণের বাণী প্রচার করেছেন। এদের মধ্যে ছিলেন

আহমদ ছফা, মাহবুব তালুকদার, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, নাসিরুল ইসলাম বাচ্চু, রাহাত খান, শামসুজ্জামান খান, আসাদ চৌধুরী, রশিদ হায়দার, মিলন মাহমুদ, সুমন মাহমুদ, আমিনুল হক বাদশা, কণ্ঠ শিল্পী আপেল মাহমুদ, ফকির আলমগীর প্রমুখ। সন্দ্বীপের কবিয়াল শফি আহমেদ তাঁর রাজনৈতিক গান দিয়ে বড় বড় জনসভায় লোক জমায়েত করে রাখতো।

## স্বাধীনতার প্রস্তুতিপর্ব

১৯৬৬-'৬৭ এ দুই বছর আমরা স্বাধীনতার বিষয়টিকে শুধু স্লোগানে সীমাবদ্ধ না রেখে পরবর্তী পর্যায়ের করণীয়সমূহ নিয়েও চিন্তাভাবনা করতে শুরু করি। এজন্য কেরানীগঞ্জ থানার কলাতিয়ায় রতন-গগন-মাখনদের বাড়িটিকে আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করতে থাকি। এই তিন ভাইয়ের বড়জন রতন আমার খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। অবস্থাপন্ন এই পরিবারটি শুধু আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাই নয়, বরং আর্থিক ও অন্যান্যভাবে আমাদের সশস্ত্র কার্যক্রমেও সহায়তা করে।

১৯৬৬-'৬৭ সালের দিকে আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্যোগ নেই। কিন্তু তাঁদের মধ্যে একমাত্র মওলানা ভাসানী ছাড়া আর কাউকেই স্বাধীনতার ধারণার সঙ্গে যুক্ত করতে পারিনি। এ পর্যায়ে আবু হোসেন সরকার, হামিদুল হক চৌধুরী, ফজলুল কাদের চৌধুরী, মওলানা ফরিদ আহমদসহ অনেকের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়েছিল। তাঁরা প্রত্যেকেই স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তো ছিলেনই, উপরন্তু আমাদের স্বাধীনতার চিন্তাটি এক ধরনের কাল্পনিক ও রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক বিষয়, তা বলতেও দ্বিধা করেননি। ফজলুল কাদের চৌধুরী বলেছিলেন, 'শেখ মুজিবকে নিয়ে তোমরা চিন্তা করো? সে তো রাজনীতির কিছুই বোঝে না।' অথচ এই ফজলুল কাদেরই এদেশে প্রথম রাজনীতিতে ব্যবহারের জন্য লাঠিয়াল ও গুণ্ডাবাহিনী তৈরি করেছিলেন। আতাউর রহমান খানকে আমরা একজন শিক্ষিত ও যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে পেয়েছি। কিন্তু শিক্ষা ও যোগ্যতার বাইরে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আর যে

গুণটির প্রয়োজন, সেই সাহস জিনিসটি তাঁর মধ্যে একেবারেই ছিল না। তাঁর পেছনে আমাকে অনেকটা সময় নষ্ট করতে হয়েছিল।

উপরে যাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনার কথা বললাম সে-সব যোগাযোগ 'নিউক্লিয়াস'-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই হয়েছিল। এসব যোগাযোগ আমাদেরকে অনেক দিন ধরেই করতে হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে আরও যেসব নেতার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়, যেমন অলি আহাদ, মশিউর রহমান যাদু মিয়া, মাহমুদ আলী, এ টি এম তাহা, রফিকুল হক, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন প্রতিভাবান। কিন্তু স্বাধীনতার বিষয়টি তাঁদের চিন্তার বাইরে ছিল। প্রাদেশিক রাজনীতিতে সফলতা অর্জনই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য। স্বাধীনতার বিষয়টি যখন আলোচনায় আসতো তখন দেখতাম তার জন্য যে সাহস ও অন্যান্য যোগ্যতার প্রয়োজন তা তাদের মধ্যে পুরোপুরি অনুপস্থিত। এ অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমানকে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা হিসেবে তুলে ধরা জরুরী হয়ে পড়ে। আমরা এ ব্যাপারে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম।

১৯৬৭-এর শেষের দিকে আমরা শেখ মুজিবকে আমাদের স্বাধীনতা প্রক্রিয়ায় নেতা হিসেবে গণ্য করার পর্যায়ে সংগঠনের অভ্যন্তরে 'ভেটো' (veto) ক্ষমতার কারণে বিষয়টি কিছুদিন স্থগিত থাকে। দেখেছি, আমরা অনেক সময় কোনো বিষয়ে উপস্থিত ও আবেগনির্ভর সিদ্ধান্ত নিতে চাইলেও, আরেফের একটি গুণ ছিল এই যে, কোনো ধরনের আবেগকেই সাধারণত সে গুরুত্ব দিত না। বরং সে কোনো বিষয়ের ভালো ও মন্দ দিকগুলো অত্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তারপর তার নিজের সিদ্ধান্তে আসতো। আরেফের এই বিশেষ গুণটি বহু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে 'নিউক্লিয়াস'-এর কাজে লেগেছে।

স্বাধীনতার বিষয়টি আলোচনার জন্য সর্বশেষ আমি মওলানা ভাসানীর কাছে যাই। তাঁর কথা ছিল, 'আমি তো আর স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা হতে পারবো না, আর আমার সঙ্গে যারা আছে তারা তো কমিউনিস্ট। কমিউনিস্টরা তো স্বাধীনতা চায় না, কমিউনিজম কায়েম করতে চায়। এই নিয়ে তাদের সঙ্গে আমার মিলে না। আর যেসব নেতা আছে, তাদের রাজনীতি হলো মন্ত্রী হওয়ার

জন্য। একমাত্র শেখ মুজিবেরই বুকের পাটা আছে। তাকে তোমরা সঙ্গে পাবে।'

সকলের সঙ্গে যোগাযোগের পর তার ফলাফলের ভিত্তিতে আমাদের আলোচনায় আমরা শেখ মুজিবুর রহমানকেই নেতা হিসেবে মেনে নিয়ে স্বাধীনতার আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিই। পরিস্থিতি বিবেচনায় ও আমাদের যুক্তি মেনে নিয়ে শেখ মুজিবের ব্যাপারে 'ভেটো' (veto) প্রত্যাহার করা হয়।

আমরা আগে থেকেই জানতাম, ঢাকায় নেতৃবৃন্দের মধ্যে আমাদের পক্ষে গাজী গোলাম মোস্তফা ছাড়া আর কাউকেই পাবো না এবং পেলামও না। জেলা পর্যায়ে আমাদের প্রয়োজন ছিল দলের জেলা কমিটির নেতাদের। ১৯৬৮ সালের শেষ নাগাদ চট্টগ্রামের এম এ আজিজ, খুলনার শেখ আবদুল আজিজ, যশোরের মোশাররফ হোসেন, কুষ্টিয়ায় নূরে আলম জিকু, দিনাজপুরের আজিজুল হক, মাগুরার সোহরাব হোসেন, সিলেটের দেওয়ান ফরিদ গাজী, চাঁদপুরের মিজানুর রহমান চৌধুরী, ঢাকার আমেনা বেগম, নেত্রকোনার আবদুল মোমেন, ময়মনসিংহের রফিকউদ্দিন ভুঁইয়া, চট্টগ্রামের এম এ হান্নান, খুলনার মোহাম্মদ মহসিন, মুন্সীগঞ্জের আবদুল হাই, নোয়াখালীর শহীদ উদ্দিন ইকান্দার, ঢাকার (গাজীপুর) শামসুল হক ও আবদুল হামিদ (কেরানীগঞ্জ), ফরিদপুরের ইমাম উদ্দিন আহমেদ ও ফণী ভূষণ মজুমদার, ঢাকার ফজলুল হক বিএসসি, দিনাজপুরের আবদুর রহিম সরকার, ঠাকুরগাঁওয়ের মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, খুলনার সালাহউদ্দিন ইউসুফ, বরিশালের আবদুর রব সেরনিয়াবত, ঢাকার মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ, চট্টগ্রামের বিধান কৃষ্ণ সেন ও নৃপতি ভূষণ চৌধুরী (মানিক চৌধুরী) ও নোয়াখালীর নুরুল হক মিয়াকে আমরা আমাদের পক্ষে আনতে সমর্থ হই।

শ্রমিক নেতাদের মধ্যে আবদুল মান্নান, মোহাম্মদ শাহজাহান, ফজল আমিন ভুঁইয়া, আবদুল মান্নান (টঙ্গী), আবদুর রহমান (নরসিংদী), সায়েদুল হক সাদু (আদমজি), আবদুল আজিজ (আদমজি), ছোট সাদু (আদমজি) ও শফিক সরদার (আদমজি) আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন।

পরবর্তীকালে লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, সুলতান উদ্দিন আহমেদ, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ, ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক, ক্যাপ্টেন খুরশিদ, স্টুয়ার্ড মুজিবসহ 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র অভিযুক্তদের প্রায় সকলেই 'বিএলএফ'-এর সদস্য বা সমর্থক হয়েছিলেন।

আর 'নিউক্লিয়াস' গঠনের মুহূর্ত হতে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত পুরো সময়টায় 'নিউক্লিয়াস' সদস্যদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং আমাদের পরামর্শ দিতেন কামরুদ্দীন আহমদ এবং ড. আহমদ শরীফ।

১৯৬৭-'৬৮ সাল আমাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্যের এবং মানসিক প্রস্তুতির সময় ছিল। এ সময় ছাত্রলীগকে এককভাবে একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করা এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করানো আমাদের প্রধান করণীয় হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে আবদুর রাজ্জাক ও খালেদ মোহাম্মদ আলী বিশিষ্ট ভূমিকা রাখেন। পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ গণআন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহ- সভাপতি হিসেবে প্রথমে তোফায়েল আহমেদ ও পরে আ স ম আবদুর রব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৬-দফাভিত্তিক আমাদের আন্দোলন কার্যক্রমে ছাত্র ইউনিয়নের কোনো গ্রুপকেই পাওয়া যায়নি। আন্দোলনের এ-পর্বটিকে একটি রণকৌশলগত কাল হিসেবে গণ্য করে সম্ভাব্য পরবর্তী আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়নকে (উভয় গ্রুপ) যুক্ত করা যায় কিনা, সে বিষয়টি আমি 'নিউক্লিয়াস'-এ উত্থাপন করি। এবারও 'ভেটো'র কারণে সে কাজটি কয়েক মাস পিছিয়ে যায়। এ ব্যাপারে আমি ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে বিশেষ করে খালেদ মোহাম্মদ আলীকে উদ্যোগী ভূমিকা পালনের দায়িত্ব দিই। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি মুখ্য হিসেবে চিন্তায় থাকলেও, ছাত্রদের সমস্যাগুলো নিয়ে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর জোর দিতে বলি। প্রায় ২/৩ মাস সময় লাগে এই ছাত্র সমস্যাভিত্তিক কর্মসূচি দাঁড় করাতে। কিন্তু দেখা গেল রাজনৈতিক কর্মসূচি ছাড়া কেবল ছাত্র সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের উভয় সংগঠনই একমত

পোষণ করে। অন্যান্য ছাত্র সংগঠনকেও সম্ভাব্য সে আন্দোলনে যুক্ত করা করা যায় কিনা তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেও খানিকটা সময় ব্যয় হয়। অবশেষে এনএসএফ-এর একাংশ (মাহবুবুল হক দোলন ও ফখরুল ইসলাম মুন্সীর নেতৃত্বাধীন) সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে যোগ দেয়। প্রথমেই আমরা ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও এনএসএফ (দোলন)-কে আন্দোলনের পক্ষে পাই। ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ)-কে সঙ্গে পেতে কিছুটা দেরি হয়।

ছাত্র সমস্যা ভিত্তিক আন্দোলনের কর্মসূচির সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মসূচি যুক্ত করার ব্যাপারটি নিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন দুই গ্রুপের তরফেই আপত্তি আসে। তাদের প্রস্তাব ছিল সাধারণ কিছু রাজনৈতিক কর্মসূচি দেওয়া, যেমন মৌলিক গণতন্ত্র বাদ দিয়ে সরাসরি ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি। সেই সঙ্গে কৃষক-শ্রমিকদের দাবি-দাওয়ার অন্তর্ভুক্তির কথাও তারা বলে। জাতীয় রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে তারা দায়সারাভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়।

বিপরীতে আমাদের প্রস্তাব ছিল রাজনৈতিক কর্মসূচিকে প্রাধান্য দেওয়া। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটিকে রাজনৈতিক কর্মসূচির কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা। 'স্বায়ত্তশাসন' শব্দটি যোগ করে রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রণয়নে তাদের আপত্তি থাকলো না। কিন্তু আমরা যখন 'স্বায়ত্তশাসন' বিষয়টি ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করার প্রস্তাব দিলাম, তখন তারা শুধু এর বিরোধিতাই করলো না, যৌথ আন্দোলনের বিষয়টিকে আর হিসেবের মধ্যে রাখতে চাইলো না। আমাদের 'স্বায়ত্তশাসন'-এর বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব ও তাদের তাতে অসম্মতি—এ দুইয়ের মধ্যে যুক্তিতর্ক ও সময় ব্যয় শেষে এক রকম ক্লান্তিকর পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়। শেষে আমি ফরহাদ ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলে সাইফুদ্দিন মানিক তার ব্যবস্থা করতে রাজি হন। কিছুটা গড়িমসি করে হলেও ফরহাদ ভাইয়ের সঙ্গে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনির্ভাসিটির আহসানউল্লাহ হলে আমার বৈঠক হয়। সে বৈঠক চলে পাঁচ থেকে ছয় দিন। অতি দীর্ঘ আলোচনা। ফরহাদ ভাই তাঁর দিক থেকে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবিটি অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিলেন। সহজেই আমি তাতে রাজি হলাম। তিনি 'স্বায়ত্তশাসন' বলতে সাধারণভাবে পূর্বপাকিস্তান সরকারের কাজকর্মে কেন্দ্রীয়

সরকারের হস্তক্ষেপ না করা—এ ধরনের অর্থে বিষয়টিকে গ্রহণ করতে রাজি হলেন। আমি ৬-দফার উল্লেখ না করেও, 'স্বায়ত্তশাসনে'র বিষয়টিকে যে ব্যাখ্যা করা দরকার সেটা তাঁকে বিবেচনা করতে বললাম। ফরহাদ ভাই আরও এক সপ্তাহ সময় চাইলেন। আমি আরেকটু সহজ করে তাঁকে বললাম, 'স্বায়ত্তশাসন' প্রসঙ্গে ক, খ, গ, ঘ, ঙ ও চ দিয়ে কী ধরনের স্বায়ত্তশাসন আমরা চাই সেটা বলতে হবে।

আমার দিক থেকে আমিও দুই-তিন দিন সময় চেয়ে নিলাম। কারণ আমাদেরও 'নিউক্লিয়াস'-এর মিটিংয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা জরুরি হয়ে পড়ে। দুই প্রদেশের দুই মুদ্রার বিষয়টি বাদ দিয়ে 'স্বায়ত্তশাসন'কে ব্যাখ্যা করার আমার প্রস্তাবটি সেখানে 'ভেটো'র মুখে পড়ে। এ নিয়ে প্রায় সাতদিন আমাকে অপেক্ষা করতে হলো। 'ভেটো'র পক্ষে যুক্তি ছিল : দুই মুদ্রা ব্যবস্থার কথাটা অবশ্যই থাকতে হবে। কারণ দুই মুদ্রা ব্যবস্থাই ক্রমান্বয়ে 'স্বাধীনতা'কে সম্ভব করে তুলবে। অন্য কোনো উপায়ে তা অর্জনের জন্য অনেক বেশি সময়, শ্রম ও প্রাণ দিতে হবে। সুতরাং দুই মুদ্রার কথাটা বাদ দেওয়া যাবে না। সাতদিন পর 'নিউক্লিয়াস'-এর তিনজনই আমরা দুই মুদ্রার প্রসঙ্গটি বাদ দিয়ে 'ক', 'খ', 'গ' এভাবে ৬টি দফায় 'স্বায়ত্তশাসন'কে ব্যাখ্যা করার বিষয়ে একমত হলাম। আমাদের সব প্রস্তাব ছাত্রলীগের মাধ্যমে উত্থাপিত হতো। ৭/৮ দিন পরে আমি ফরহাদ ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতে দুই মুদ্রার বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা দেওয়ার কথা বলতেই তিনি এক বাক্যে তা সমর্থন করলেন। এও বললেন, দুই মুদ্রা ব্যবস্থার প্রস্তাবটি 'প্রি-ম্যাচিউরড' ও অপ্রয়োজনীয়। তাঁর সিদ্ধান্ত ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে ছাত্রলীগের প্রস্তাবের পক্ষে এসে গেল।

এনএসএফকে আগে থেকেই আমাদের পক্ষে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মেনন গ্রুপ সামান্য কিছু আপত্তি তুললেও তাদের যুক্তি ছিল খুবই দুর্বল। ফলে তা টেকেনি। অবশেষে চারটি সংগঠন একমত হয়ে যে কর্মসুচি প্রণয়ন করলো সেটিকে ১১টি আলাদা দফায় ভাগ করা হয়। সেটাই হলো ঐতিহাসিক 'এগারো দফা'।

এনএসএফ ছিল সরকারি ছাত্র সংগঠন। তখন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক গভর্নর ছিলেন মোনেম খান। তাঁর উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায়ই এনএসএফ গঠিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৯-এ এসে

আবার মোনেম খানের কারণেই এনএসএফ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আন্দোলনে থাকলে তারা অনেক বেশি শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে—আমাদের এই যুক্তিটি এনএসএফ-দোলন গ্রুপের কাছে গ্রহণযোগ্য হলো। কিছুটা গোপনে এরকম একটা সমঝোতাও আমাদের ছিল যে, ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে যে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসার আগে দোলন গ্রুপের সঙ্গে বসা হবে ও সেখানে আমাদের একটা ঐকমত্য হবে। এ ব্যবস্থায় তারা বিশ্বাস করতে পারলো যে, এনএসএফের তাদের (দোলনপন্থী) অংশটিই অতঃপর প্রধান বা একমাত্র এনএসএফ হিসেবে পরিচিত হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলোতে একমত হবার পরও রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি সংবলিত দফায় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'য় বন্দি শেখ মুজিবের নামটি নিয়ে আসা ছিল আমাদের জন্য এক কৌশলগত বিজয়। এটিও নানা কসরতের মাধ্যমে আমরা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছিলাম।

১১-দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে যে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয় তার নেতৃত্ব ছিল এ রকম : ডাকসু—তোফায়েল আহমেদ (ভিপি), নাজিম কামরান চৌধুরী (জিএস); ছাত্রলীগ—আবদুর রউফ (সভাপতি), খালেদ মোহাম্মদ আলী (সাধারণ সম্পাদক); ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)—মোস্তফা জামাল হায়দার (সভাপতি), মাহবুবউল্লাহ (সাধারণ সম্পাদক); ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)—সাইফুদ্দিন মানিক (সভাপতি) ও শামসুদ্দোহা (সাধারণ সম্পাদক); এনএসএফ (দোলন)—মাহবুবুল হক দোলন (সভাপতি), ফখরুল ইসলাম মুন্সি (সাধারণ সম্পাদক)।

১৯৬৯-এর ১৭ জানুয়ারি ছিল আন্দোলন শুরু করার প্রথম দিন।

## ১১-দফা আন্দোলন

১৯৬২-'৬৩ সালের আন্দোলন ছিল আমাদের অনভিজ্ঞতা এবং কিছুটা প্রাত্যহিকতার দ্বারা প্রভাবিত। সে আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ১৯৬৮-'৬৯-এ ১১-দফা আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি কাটিয়ে আন্দোলনকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর কৌশল নির্ধারণে আমাদের সাহায্য করে।

ছাত্র ইউনিয়নের একটা সুবিধা ছিল এই যে, আন্দোলনের কর্মসূচি ও অন্যান্য করণীয় নিয়ে তাদের মাথা ঘামাবার দরকার হতো না। কমিউনিস্ট পার্টি যা বলে দিত, তারা তাই করতো। কিন্তু আমাদের ব্যাপার ছিল ভিন্ন। বাইরের কোনো মুরুব্বি বা পথ-প্রদর্শক না থাকাতে আমাদের সকল কাজের পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমাদেরকেই নিতে হতো। ৬-দফাকে মূল বিষয় করে আন্দোলন শুরু করা এবং সে আন্দোলনকে প্রাত্যহিক ঘটনাভিত্তিক না করে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, বক্তব্য ও কর্মসূচিভিত্তিক করার প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করি। এ জন্য আমাদের 'নিউক্লিয়াস'-এ বেশ কিছুদিন আলোচনা চলে। আতাউর রহমান খান সাহেবের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা থাকায় তাঁর সঙ্গেও আমি আন্দোলন ও কর্মসূচি বিষয়ে আলোচনা করি। ৬-দফাকে তিনি পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি। স্বায়ত্তশাসনের কথা সাধারণভাবে বলায় তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু ৬-দফাকে ভিত্তি করে স্বায়ত্তশাসনকে ব্যাখ্যা করার কথা তুলতেই তিনি বললেন, 'সিরাজ, ৬-দফাকে পুরোপুরি রেখে কর্মসূচি প্রণয়ন করাটা আর পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীন করার কথা বলা প্রায় একই।' এও বললেন যে, তা হবে অসময়োচিত। আমার সাংগঠনিক দক্ষতা এবং চিন্তা-ভাবনার গভীরতার ওপর তাঁর আস্থা ছিল। হয়তো সে কারণে মাঝে মাঝে আমাকে সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দিতেন।

ইতিমধ্যে আমাদের নিউক্লিয়াসে 'ভেটো' প্রত্যাহার হওয়ায় শেখ মুজিবকে প্রধান নেতা হিসেবে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা রইলো না। এরপর এলো স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনে কর্মসূচি প্রণয়ন প্রসঙ্গ। সবাইকে নিয়ে আন্দোলন করতে হলে সে আন্দোলনের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির প্রয়োজন। এ বিষয়টি নিয়েও আমরা চিন্তাভাবনা করি ও সিদ্ধান্তে আসি। এ সময় খালেদ মোহাম্মদ আলীকে (ছাত্রলীগের তখনকার সাধারণ সম্পাদক) নিয়ে আবদুর রাজ্জাক পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সবক'টি জেলা সফর করে। এর মধ্য দিয়ে তখনকার ১৭ জেলার ১৬টিতেই একজনকে প্রধান করে তিন অথবা সাত সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। ঢাকা শহরে অঞ্চলভিত্তিক তিনজনের কমিটি এবং কলেজ পর্যায়ে ৩/৫ জনের কমিটি গঠন করা হয়। আরেফ এ কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করেছিল। ১৯৬৬-'৬৭ সালে

'নিউক্লিয়াস'-এর সরাসরি সদস্য না হলেও, মার্শাল মনি, আ স ম আবদুর রব, শরিফ নুরুল আম্বিয়া, মেসবাহ উদ্দিনসহ কয়েকজনের সঙ্গে 'নিউক্লিয়াস'-এর যে-কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আলোচনা করা হতো।

১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে আন্দোলন শুরু করার পূর্বে আমাদের হিসেব অনুযায়ী ঢাকা শহরে 'নিউক্লিয়াসে'র সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় তিন হাজারে। ঢাকার বাইরে প্রায় দুই হাজার। জেলাগুলোতে যাদের 'নিউক্লিয়াসে'র সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলাম তাদের সঙ্গেও জেলা পর্যায়ের 'নিউক্লিয়াস' নেতাদের যোগাযোগ করতে বলা হয়। ১৯৬৭-'৬৮-এ প্রায় ৯০ শতাংশ কলেজ সংসদে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহে ও টেকনিক্যাল কলেজসমূহে (পলিটেকনিকসহ) ছাত্রলীগ বিজয়ী হয়েছিল। এ সময় আমরা ৬-দফাকে ভিত্তি করে এবং শেখ মুজিবের নাম উল্লেখসহ রাজবন্দীদের মুক্তি করে বেশ কয়েকটি প্রচারপত্র ছাপি এবং সারা দেশব্যাপী তা বিতরণ করি। এ প্রচারপত্রসমূহ ছাপার ব্যাপারে পাইওনিয়ার প্রেসের জনাব মোহাইমেন সাহেবের কাছ থেকেই আমরা প্রধান সহযোগিতা পেয়েছিলাম। মোহাইমেন সাহেব, শাহ আজিজুর রহমান, আতাউর রহমান খান, সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া), চট্টগ্রামের এম এ আজিজ, খুলনার মহসিন, ইকবাল আনসারি খান ও খাজা খয়েরউদ্দিনসহ অনেকেই সে সময় আমাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা দিয়েছিলেন। এঁদের বেশ কয়েকজন অবশ্য পরবর্তী সময়ে সহযোগিতা বন্ধ করে দেন।

১১-দফা আন্দোলনের কর্মসূচি প্রণয়নের পর সাংগঠনিক প্রস্তুতির জন্য আমরা মোটামুটিভাবে 'নিউক্লিয়াস'-এর পথ-নির্দেশনায় ছাত্রলীগকে তৈরি করি। এছাড়া ৭ জুনের হরতালকে কেন্দ্র করে শ্রমিক এলাকাগুলোতে আন্দোলনের যে ঢেউ উঠেছিল আমরা সেই সুযোগটাকে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিই। টঙ্গী, তেজগাঁও, পোস্তগোলা, ডেমরা, আদমজি, মদনগঞ্জ, চট্টগ্রামের পতেঙ্গা ও সীতাকুন্ড, খুলনার খালিশপুর এবং রংপুরের সৈয়দপুরসহ বেশ কয়েকটি জায়গায় 'নিউক্লিয়াস'-এর আদলে তিন, পাঁচ অথবা সাত সদস্য নিয়ে গোপন সংগঠনের কমিটি গড়ে তোলা হয়। এ

জন্য আমাকে মোটর সাইকেলে ঢাকার শ্রমিক এলাকাসমূহে ব্যাপক তৎপরতা চালাতে হয়।

সে সময়ে ঢাকায় গণপরিবহন বলতে ছিল প্রধানত ইপিআরটিসি বাস। আমার সহায়তায় নুরুল ইসলাম নামের একজন সেখানে আমাদের একটি গোপন 'সেল' গড়ে তোলে। হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে সিরাজ মিয়ার উদ্যোগে ও পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনস (পিআইএ)-এও একইভাবে গোপন সেল গড়ে ওঠে। দোকান কর্মচারী জহির আমার নিজের তত্ত্বাবধানে ও মেসবাহর সহযোগিতায় আন্দোলনের কার্যক্রম পরিচালনা করতো। খুলনায়ও অনুরূপভাবে আমার তত্ত্বাবধানে গোপন সেল গঠিত হয়। চট্টগ্রামে ও সীতাকুণ্ড শিল্পাঞ্চলেও একইভাবে শ্রমিকদের অনেকগুলো জঙ্গী গ্রুপ গড়ে ওঠে।

ঢাকা শহরের সবখানেই 'নিউক্লিয়াস'-এর অঞ্চলভিত্তিক সেল ছিল। কলেজ আর হল-হোস্টেল বাদ দিয়ে ঢাকা শহরে বড় ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এসব কমিটি নেপথ্য ভূমিকা পালন করে। ঢাকার ৪২টি ওয়ার্ডের সবকটিতে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলা হয়েছিল। আ স ম আবদুর রব, স্বপন চৌধুরী ও শেখ কামালকে (শেখ মুজিবের বড় ছেলে) বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এসব সংগ্রাম কমিটি গঠনের ব্যাপারে। ধানমন্ডি এলাকায় সংগঠন করার দায়িত্বে ছিল আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, শেখ কামাল, তানভীর মাজহার তান্না ও সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী। সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী তার দায়িত্ব পালন করেনি। পরে '৭১-এ সশস্ত্র সংগ্রামের সময় সে স্বাধীনতার বিরোধী অবস্থান নেয়।

এ সময় (১৯৬৭-'৬৮) ঢাকা শহরে, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, এনএসএফ সংগঠনের 'মাস্‌ল বাহিনী' অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। এর নেতৃত্বে ছিল মাহবুবুর রহমান খোকা ও সাইদুর রহমান (পাসপাত্তু)। এরা যে কেবল দলীয় গুন্ডা হিসেবে কাজ করতো তা নয়, মদ খেয়ে বহু রাতে হলে ফিরতো এবং মাতাল অবস্থায় হৈ-হুল্লোড় করে হলের ছাত্রদের জাগিয়ে তুলতো। এদের মধ্যে কেউ কেউ সাপ পুষতো ও তা গলায় পেঁচিয়ে ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়াতো। মেয়েদের উত্যক্ত করতো। অন্য দলের সমর্থকদের মারধোর করতো। কেবলমাত্র

সাধারণ ছাত্রদের সমর্থনের ওপর ভর করে এদের মোকাবেলা করা খুব কঠিন ছিল। আমরা তাই সুসংগঠিত এক প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলতে সচেষ্ট হই। এ কাজে সর্বপ্রথম যাকে পাওয়া যায় তার নাম কামরুল আলম খান খসরু। সে আমার আপন চাচাতো ভাই। রংপুর থেকে বিএ পাশ করে ঢাকায় এমএ পড়ার সময় তাকে আমি ছাত্রলীগভুক্ত করি। সে ছিল একজন ভালো খেলোয়াড়, কুস্তিগির ও শরীরচর্চাবিদ। কুস্তিগির হিসেবে সারা পাকিস্তানে সে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি তাকে আমি একটি প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারে উৎসাহিত করি। এ কাজে তার প্রথম সহযোগী হয় মোস্তফা মোহসিন মন্টু। 'খসরু-মন্টু বাহিনী' হিসেবে এদের নাম তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে এদের সঙ্গে যুক্ত হয় মহিউদ্দিন (মুন্সিগঞ্জ) ও ফিরু (বরিশাল)। এই চারজন আবার হলভিত্তিক 'প্রতিরোধ বাহিনী' গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। এনএসএফ-এর সমর্থক বাহিনীটি ছিল অছাত্রদের নিয়ে আর তারা অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকতো। পক্ষান্তরে 'খসরু-মন্টু বাহিনী'কে কোনো অবস্থাতেই সামান্যতম অছাত্রসুলভ আচরণ করতে দেখা যায়নি। এদের অনেকে ছাত্র হিসেবেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল নামকরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ঢাকা শহরেও অনুরূপ সুশৃঙ্খল বাহিনী গড়ে ওঠে। কাজী ফিরোজ রশিদ, তারন, ফজলুর রহমান ফ্যান্টোমাসদের প্রত্যেককে তখন সবাই এক নামে চিনতো। ঢাকা কলেজ, তিতুমীর কলেজ, কায়েদে আযম কলেজ ও জগন্নাথ কলেজের ছাত্রদের মধ্য থেকে এই সুশৃঙ্খল বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। মতিঝিল কলোনীর সেলিম-বায়েজিদরা এবং পীরজঙ্গী মাজারের বাহিনীও যে কোনো মিছিল-মিটিং ও আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতো। সে সময়ে মতিঝিল আবাসিক এলাকার বাইরে কোথাও শহর গড়ে ওঠেনি। বাসাবো, বাড্ডা, দক্ষিণ খান, উত্তর খান, খিলগাঁও এসব অত্যাধুনিক আবাসিক এলাকা তৈরি হয়নি। উল্লিখিত বাহিনীর সদস্যরা 'নিউক্লিয়াস'-এর তত্ত্বাবধানে কাজ করতো। এছাড়া ছাত্রলীগের সদস্যদের নিয়ে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলা হয়। এরা যার যার এলাকার 'নিউক্লিয়াস'-এর দ্বারা পরিচালিত

হতো। সাধারণ ছাত্রলীগাররা বুঝতে পারতো না তাদের এই সহযোগীরা কোন গোপন সংগঠনের সদস্য। মেয়েদের মধ্যে সংগঠনটা গড়ে তোলা হয়েছিল অবশ্য একটু ভিন্ন কায়দায়। ছাত্রলীগ হিসেবেই তাদের পরিচিতি ছিল। তাদের মধ্য থেকে তখন পর্যন্ত (১৯৬৭-'৬৮) আমরা কাউকে 'নিউক্লিয়াস' সদস্য করতে পারিনি। আন্দোলনের উত্তাল সময়ে এই মেয়েরাই 'নারী বাহিনী' গঠন করে। যার নেতৃত্বে ছিলেন মমতাজ বেগম।

১৯৬৯-এর আন্দোলনের শুরু থেকেই জনগণের বিভিন্ন অংশ যেমন শ্রমিক-কর্মচারীদের তরফ থেকে তাদের দাবি-দাওয়া উত্থাপিত হতে থাকে এবং সেগুলোও ১১-দফায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ-প্রতিবাদ মামলা বাতিল ও শেখ মুজিবসহ সকল অভিযুক্তের মুক্তি দাবিটিকেও আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এ সময়ে শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, ৬-দফার বাখ্যা ভিত্তিক পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং ছাত্র-শ্রমিক-কর্মচারীসহ সমাজের বিভিন্ন অংশের দাবিকে প্রাধান্য দিয়ে আন্দোলনে গতি সঞ্চার করা নিয়ে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে আমাদের দেন-দরবার চলতে থাকে। আইয়ুব খান ও মওলানা ভাসানীর মধ্যেকার গোপন চুক্তির প্রধান শর্ত ছিল শেখ মুজিব ও ৬-দফার বিরোধিতা করা। বামপন্থীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছাত্র ইউনিয়নের উভয় গ্রুপকে কোনো অবস্থাতেই সরকারবিরোধী ব্যাপক আন্দোলনে নামতে রাজি করা যাচ্ছিল না। এ অবস্থায় আমরা একটা কৌশল নিই। তা হলো, ১১-দফাভিত্তিক স্লোগান দেওয়ার। ১১-দফাতেই ৬-দফা এবং শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাতিলের দাবিটি অন্তর্ভুক্ত আছে।

'নিউক্লিয়াস'-এর পরিকল্পনায় ছাত্রলীগ গোটা আন্দোলনে ব্যাপক জনগণের সম্পৃক্তি ঘটানোর উদ্দেশ্যে আন্দোলনের প্রচার (দেয়াল লিখন ও পোস্টারিং) ও পরিচালনার দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেয়। এ জন্য ঢাকা শহরকে অঞ্চলভিত্তিক কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। এর ফলে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণে গড়িমসি এবং সময়ক্ষেপণের নীতিকে সহজেই মোকাবেলা করা সম্ভব

হয়। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা না করে এ সব আঞ্চলিক 'সংগ্রাম পরিষদ' নিজেরাই অনেক বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারতো। এদের পেছনে আসল যে শক্তিটি কাজ করতো তা হলো 'নিউক্লিয়াস'। এসব কারণে এ সময় 'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্য সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৬৯-এর ১৭ জানুয়ারি পরীক্ষামূলকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র জমায়েত ও মিছিলের আয়োজন করা হয়। আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বে সভা ও মিছিলটি সংগঠিত করার পরিকল্পনা করা হয়। তোফায়েল আহমেদের সভাপতিত্বে বটতলায় সংক্ষিপ্ত সভা শেষে মিছিল বের করার উদ্যোগ নিলে পুলিশ বাধা দেয়। এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এভাবে আন্দোলন শুরু করার পরিকল্পনাটি আমরা আগের রাতে ইকবাল হলে 'নিউক্লিয়াস'-এর সভায় গ্রহণ করি। তোফায়েল, রব, আবদুর রউফ ও খালেদ মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে আলাপ করে প্রত্যেককে যার যার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সেদিন খুব ভোরে আমি ইকবাল হল থেকে বেরিয়ে ধানমন্ডিতে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর বাসায় গিয়েছিলাম। বেলা ১১টার দিকে মঞ্জু বটতলার অবস্থা আমাকে জানায়। শুনে আমি ডাকসু অফিসে চলে আসি। আমি যখন ক্যাম্পাসে পৌঁছাই তখনও সেখানে টিয়ার গ্যাসের ঝাঁঝ ছিল। আমি উদ্যোগী হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া ছাত্রদেরকে একত্রিত করলাম। তারপর আবারও ছাত্রসভা করে তোফায়েল-রব যখন পরদিনের কর্মসূচি ঘোষণা করছিল তখন পুলিশ বাধা দেয়। এ সময় ডাকসুর জিএস নাজিম কামরান ও কয়েকজন খেলোয়াড় হকি প্র্যাকটিস শেষ করে হলের ফিরছিল। আমি কামরানকে ডেকে বললাম, কোনোভাবেই পুলিশকে ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। কামরান বললেন, 'আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে আসছি।' কামরান ও তার সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন কেডস পায়ে ও হকিস্টিক হাতে বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনের গেটে গিয়ে দাঁড়ালো। কামরান গলার স্বর উঁচু করে পুলিশকে বললো, 'যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় গেট থেকে চলে না যায়, তাহলে আমরা তাদের পিটিয়ে

বের করে দেব।' সে সময় আইন ছিল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কিংবা হলের অভ্যন্তরে পুলিশ ঢুকতে হলে ভিসি ও প্রভোস্টের অনুমতি নিতে হবে। কামরান পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলো তাদের কাছে কোনো অনুমতিপত্র নেই। শুনে কামরান ও তার সঙ্গীরা হকিস্টিক নিয়ে ধাওয়া করতেই পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের বাইরে চলে যায়। *[প্রসঙ্গত, এই পুস্তকের অনুলেখকও সেদিনের সে ঘটনায় হকিস্টিকধারীদের একজন ছিলেন।]*

পরিকল্পনা অনুযায়ী পরদিন ১৮ জানুয়ারি আবারও বটতলা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের রাস্তায় জঙ্গি মিছিল বের করা হয়। সেদিন উপাচার্যের বাড়ি ও রোকেয়া হলের সামনে কয়েকশত রায়ট পুলিশ অবস্থান নেয়। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গেইট পার হয়ে গুরুদুয়ারার সামনে আসতেই সামনের ও পিছনের দিক থেকে পুলিশ মিছিলের ওপর আক্রমণ করে ও লাঠিচার্জ করতে থাকে। ফলে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ১৯ তারিখেও মিছিল করতে গিয়ে একই রকম বাধা এলো। পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি করতে গিয়ে এদিন বেশ কয়েকজন ছাত্র আহত হয়। ১৭, ১৮ ও ১৯ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের রাস্তাটি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ছাত্ররা চারদিক থেকে পুলিশের ওপর ইটপাটকেল ছোড়ে। তাতে কয়েকজন পুলিশ আহতও হয়। উল্লেখ্য, সেবারই প্রথম ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে শরিক হয়। তারা মিছিলে আসে, স্লোগান দেয়। আহত ছাত্রদের শুশ্রূষাও করে।

সেদিন দুপুর বেলাতেই আমি মঞ্জুর গাড়িতে চড়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার চারপাশের রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখলাম। বিকেল পাঁচটা নাগাদ গেলাম ইকবাল হলে। তোফায়েলকে বললাম, 'তুমি ভিপি হিসেবে ভিসিকে অনুরোধ করবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একেবারে গেইট পর্যন্ত পুলিশকে আসার অনুমতি না দিতে। পুলিশ যদি বাধা দিতে চায় তারা টিএসসি'র মোড় এলাকায় (তখন এ এলাকাটি আজকের মতো ছিল না—গাছপালা, ঝোপ-জঙ্গলে পূর্ণ ছিল) এবং নীলক্ষেতের রেললাইনের মুখে মোতায়েন থাকুক। ভিসি ওসমান গণি গভর্নর মোনেম খানের সঙ্গে কথা বলে পুলিশকে টিএসসি মোড়ে ও নীলক্ষেত রেল গেইটে রাখার ব্যবস্থা করলেন। ২০ জানুয়ারি বটতলার নির্ধারিত

ছাত্র-জনসভা খুব বড় আকারে করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বক্তৃতার পালা শেষ হলে প্রায় দশ হাজার ছাত্র ভিসির বাড়ির পাশ দিয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিলকে ডানে রেখে ফুলার রোড ধরে সামনের দিকে এগোতে থাকে। মিছিলের এই গতিপথটাও আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছিল। শহীদ মিনার হয়ে মিছিল চানখাঁর পুলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। যেহেতু মিছিলটি টিএসসি বা নীলক্ষেত রেললাইনের দিকে না গিয়ে ভিন্নপথ ধরে এগুতে থাকলো ফলে পুলিশ তাতে বাধা দেওয়ার সুযোগ পেলো না। ছাত্রনেতারা যেন কোনো অবস্থাতেই গ্রেফতার না হয় সে জন্য আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁদেরকে মিছিলের অগ্রভাগে না রেখে মাঝখানে কর্মীদের একটি কর্ডন তৈরি করে তার ভেতরে রাখা হয়েছিল। আমি সে সময় ব্রিটিশ কাউন্সিলের ভেতরে অবস্থান নিই। মিছিলের গতি ও তার সামনের অবস্থা আমাকে জানানোর জন্য কয়েকজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, যাদের সবাই ছিল বিভিন্ন হলের 'নিউক্লিয়াস' সদস্য। মিছিল থেকে পুলিশকে লক্ষ করে যেন ইটপাটকেল ছোঁড়া না হয় সে ব্যাপারেও নির্দেশ ছিল। সেভাবেই স্লোগান দিতে দিতে সুশৃঙ্খলভাবে মিছিল এগুতে থাকে।

মিছিল মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সি গেটের (পূর্বেকার আমতলা) পাশ দিয়ে চানখাঁরপুলের দিকে যাবার সময় পুলিশ বাধা দেয়। এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের হাতাহাতি শুরু হয়। পুলিশ গুলি চালানোর জন্য পজিশন নেয়। আমি কর্ডনের ভেতরে থাকা নেতৃবৃন্দকে কোনো দিকে যেতে নিষেধ করলাম। সে পরামর্শ তারা মানলো। এরই এক পর্যায়ে পুলিশ অতর্কিতে গুলি করলো। মেডিকেলের পাশে গুলিবিদ্ধ হলো হাতিরদিয়া কলেজের ভিপি মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান। আমি মিছিলকে ফিরে আসতে বললাম। মিছিল ফিরে এলো। সন্ধ্যায় এসএম হলের মাঠে গুলির প্রতিবাদ এবং আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি ঠিক করার জন্য 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'-এর নেতারা বসলেন। এক পর্যায়ে আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি ঐ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকি।

গুলি হবার পরপরই আমি, রাজ্জাক ও আরেফ একত্রে বসে অল্প সময়ের মধ্যে আন্দোলনের একটা রূপরেখা তৈরি করলাম। এসএম হলের ভেতরের লনে বসে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে গিয়ে তাদের চিন্তাভাবনা, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির সামঞ্জস্যহীনতা লক্ষ করলাম। ছাত্র ইউনিয়ন সময় নিতে চাইলো। ছাত্রলীগ ঐ সময় নেওয়ার পর্বটাকেও আন্দোলনের অংশ হিসেবে কাজে লাগাবার প্রস্তাব দিল। ছাত্রলীগের পক্ষে তিনদিনের এক কর্মসূচির কথা বলা হলো। ২১ জানুয়ারি সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কালো পতাকা ও ব্যাজ নিয়ে শহরে বের হওয়া, ২২ জানুয়ারি মশাল মিছিল এবং ২৩ তারিখ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ও মিছিল। এ তিনদিনের কর্মসূচি ঢাকা শহরের জীবনযাত্রায় এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। গোটা শহর জুড়ে কালো পতাকা ও কালো ব্যাজধারী ছাত্রদের মিছিল। 'নিউক্লিয়াস'-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছাত্রলীগের সদস্যরা রাস্তার দু'পাশে দোকানপাটের মাথায় কালো পতাকা উড়িয়ে দেয়, মালিক-কর্মচারীদের বুকে কালো ব্যাজ পরিয়ে দেয়। ১৮, ১৯, ২০ ও ২১ জানুয়ারির কর্মসুচি সে-সময় পত্রিকাগুলোতে ছোট আকারে, যেন না ছাপলেই নয় এমনভাবে, ছাপা হয়।

২২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মশাল মিছিল বের করা হয়। ঢাকার ইতিহাসে এর আগে কেউ কখনো এত বড় মশাল মিছিল দেখেনি। এমনকি কল্পনাও করতে পারেনি। হাজার হাজার মশাল হাতে ছাত্ররা তেজগাঁও হয়ে ঢাকার দিকে, গোপীবাগ ও সদরঘাট থেকে ঢাকার দিকে, মতিঝিল আবাসিক এলাকা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে, ঢাকা কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। পুরনো ঢাকার সর্বত্র মশাল হাতে হাজার হাজার তরুণের সমাগম। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। বাড়িঘর থেকে পুরুষ-নারী সবাই বেরিয়ে এসে সে দৃশ্য দেখছে। পরের দিন ২৩ জানুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট। তারই আহ্বান নিয়ে মিছিল। সে মিছিল থেকে স্লোগান উঠলো, 'আগামীকাল হরতাল'। স্লোগানে স্লোগানে কেঁপে উঠলো ঢাকা শহর। সারা শহর পরিণত হলো মিছিলের নগরীতে। সেদিন শহরের কোথাও পুলিশের উপস্থিতি দেখা গেল না। কেবল সচিবালয় এলাকায় সেদিন পুলিশ

প্রহরা ছিল। রাত ১০টার দিকেই ঢাকা নীরব হয়ে গেল। শহর গাড়ি-ঘোড়া, যানবাহনহীন। এমনকি রিকশাও বন্ধ হয়ে গেল।

২১, ২২ ও ২৩ জানুয়ারি এ তিনদিনের কর্মসুচি 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'-এর নামেই প্রচার করা হয়েছিল। কর্মসূচি সংবলিত লিফলেটও সে নামেই প্রচারিত হয়। ২৩ তারিখ রাতে 'সংগ্রাম পরিষদ'-এর সভা বসলে ছাত্রলীগ ছাড়া আর সবাই এ ব্যাপারে তাদের আপত্তি জানালো এবং কে কোথা থেকে এ কর্মসূচির ঘোষণা দিল, লিফলেট বিলি করলো, তা জানতে চাইলো। তারা এ ব্যাপারে ছাত্রলীগের ওপর দোষ চাপালো। সে রাতেই আহসানউল্লাহ হলে ফরহাদ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলে তিনি বললেন, 'এ ধরনের কর্মসূচিতে আমাদের আপত্তি নেই। আমরাও হয়তো এটাই করতাম। তবে সর্বদলীয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত না নিয়ে এভাবে এককভাবে আপনারা কর্মসূচি চালিয়ে গেলে তাতে ভবিষ্যতে আন্দোলনের ক্ষতি হবে।' ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) আরও জোরেশোরে এভাবে কর্মসূচি ঘোষণার বিরোধিতা করলেও, ২০ জানুয়ারির শহীদ আসাদ তাদের সংগঠনের সদস্য হওয়ার কারণে কর্মসূচি মেনে নিলো। ২৪ তারিখের হরতাল সফল করার ব্যাপারে ২৩ তারিখ রাতে আমাদের 'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্যদের বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে নির্দেশ দেওয়া হলো। ততদিনে 'নিউক্লিয়াস' সদস্যের সংখ্যা ঢাকা শহরে তিন হাজার ছাড়িয়ে গেছে। ঢাকার আশেপাশের এলাকায় (যেমন মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ) এই সংখ্যা ছিল আড়াই হাজার।

২৪ তারিখের হরতালের চেহারা ছিল একেবারে ভিন্ন। সেদিন ঢাকায় যানবাহন দূরে থাক কোনোকিছুই চলেনি। ঢাকা পরিণত হয় মিছিলের নগরীতে। এ হরতালে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। সবার চোখের আড়ালে 'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্যরা শ্রমিকদের মধ্যে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায়। শ্রমিক ইউনিয়নগুলো আমাদের সঙ্গে না থাকায় (সেগুলো তোয়াহা, কাজী জাফর, মাহবুবুল হকদের অধীনে ছিল) আমরা সমান্তরালভাবে 'শিল্পাঞ্চল সংগ্রাম পরিষদ' গড়ে তুললাম। চট্টগ্রাম, খুলনায়ও অনুরূপভাবে শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে উঠলো। আওয়ামী লীগ এসব সংবাদ জানতো না। জানবার আগ্রহ বা প্রয়োজনও তারা মনে করেনি। ২৪ তারিখে

হরতালের প্রধান মিছিলটি নিউমার্কেট, বিশ্ববিদ্যালয়, তোপখানা রোড হয়ে পুরনো পল্টন অতিক্রম করে দৈনিক পাকিস্তান হয়ে মতিঝিল যাবার পথে পুলিশ সে মিছিলে গুলি চালায়। এ সময় চারদিক থেকে আসা শত শত মিছিল একত্র হয়ে এক জনসমুদ্রে পরিণত হয়। বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তরে মুসলিম লীগ দলীয় এন এ লস্করের বাড়ি থেকে মিছিলে গুলি করায় জনতা তার বাড়ি আক্রমণ করে। পুলিশের গুলিতে নবকুমার ইনস্টিটিউটের নবম শ্রেণীর ছাত্র মতিউর রহমান মল্লিক মারা যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা তখন সরকারি প্রেস ট্রাস্টের মালিকানাধীন *দৈনিক পাকিস্তান* ও *Morning News* পত্রিকা দুটি পুড়িয়ে দেয়। শুধু ঢাকা শহরেই নয়, গোটা পূর্ব পাকিস্তান জুড়েই সেদিন ছিল একই চিত্র। 'নিউক্লিয়াস'-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী ছাত্রলীগ সর্বত্র আন্দোলনের সামনের সারিতে এসে যায়। 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'-এর নামে সবকিছু হলেও, নেতৃত্ব এসে পড়ে আসলে 'নিউক্লিয়াস' নিয়ন্ত্রিত ছাত্রলীগের হাতে। ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমেদ, ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুর রউফ, সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী এবং অন্যান্য নেতা যেমন আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ এরা আন্দোলনের নেতা হিসেবে অগ্রণী ভূমিকায় চলে আসে। এ সময়ের আন্দোলনের কর্মসূচি ও চরিত্র সনাতনী ধারায় কেবল ছাত্রসমাজ ভিত্তিক না থেকে এক ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। অবাঙালি অধ্যুষিত ঢাকার ট্রাফিক ব্যবস্থা ও ঢাকার পাড়ায় পাড়ায় রাত্রিকালীন প্রহরায় নিযুক্ত নৈশ-প্রহরী নির্ভর প্রশাসন ভেঙে পড়ে। এ পর্যায়ে নিউক্লিয়াস ছাত্র ব্রিগেড ও যুব ব্রিগেড গঠন করে ঢাকার যান চলাচল ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও রাত্রিকালীন প্রহরার দায়িত্ব পালন করে।

১১-দফা আন্দোলনের পরিকল্পনা এবং এর সাংগঠনিক বিস্তারে বলতে গেলে 'নিউক্লিয়াস'-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত সংগঠকরাই নেপথ্যে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১১-দফা কর্মসূচি প্রণয়ন এবং আন্দোলন পরিচালনার জন্য 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠনে 'নিউক্লিয়াস' নেতাদের ভূমিকাই প্রধান ছিল। গণঅভ্যুত্থানে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় 'নিউক্লিয়াস' সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে বিকল্প সামাজিক শক্তি হিসেবে সারা দেশে বিভিন্ন ধরনের 'ব্রিগেড' গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প অঞ্চল, পাড়া-মহল্লাসহ সর্বত্র এবং থানা পর্যায়

পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি ছিল। পাড়ায়-মহল্লায় নৈশপ্রহরা, শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা, ট্রেন চলাচল, লঞ্চ-স্টিমার ও নৌবন্দর পরিচালনা, এমসিসি-পাকিস্তান ক্রিকেট খেলা পরিচালনা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশকে সহায়তা, শিল্প কল-কারখানায় উৎপাদন অব্যাহত রাখা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনায় এ ব্রিগেডগুলোর ভূমিকা ছিল প্রত্যক্ষ। ছাত্রনেতা আসাদ ও কিশোর মতিউর পুলিশের গুলিতে নিহত হলে তার প্রতিবাদে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কৌশল নির্ধারণ করে 'নিউক্লিয়াস' এবং তা কার্যকর করে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'।

গণআন্দোলন পরে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। ফলে প্রশাসনব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ে। পরিণতিতে আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন ও প্রধান সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ইয়াহিয়া খানের শাসনামলে ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপ্রাপ্তদের দুই-তৃতীয়াংশ ছিলেন ১৯৬৯-'৭০-এর আন্দোলন থেকে বেরিয়ে আসা যুব নেতৃত্ব। মূল আওয়ামী লীগের অধিকাংশই কার্যত ৬-দফা ও ১১-দফাবিরোধী পিডিএম-এ চলে যায়, যার নেতৃত্বে ছিলেন আবদুস সালাম খান (শেখ মুজিবের মামা) প্রমুখ। এ পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। 'নিউক্লিয়াস'-এর সক্রিয় সমর্থন থাকার কারণে আওয়ামী লীগ সে অবস্থা কাটিয়ে ওঠে। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য দল মিলে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি ('ডাক') গঠন করে। তাতে যেসব রাজনৈতিক দল অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সেগুলো হলো আওয়ামী লীগ (৬-দফাপন্থি), আওয়ামী লীগ (পিডিএমপন্থি), কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজাম-ই-ইসলাম, ন্যাপ (ওয়ালী), এনডিএফ এবং জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম। এই জোটেরও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে নেপথ্য ভূমিকা পালন করে 'নিউক্লিয়াস'। 'নিউক্লিয়াস' সৃষ্ট বিকল্প সামাজিক শক্তিসমূহই ছিল ছাত্র ব্রিগেড, যুব ব্রিগেড, শ্রমিক ব্রিগেড, কৃষক ব্রিগেড, নারী ব্রিগেড ইত্যাদি। পরবর্তীকালে সশস্ত্র যুদ্ধকে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এগুলো প্রধান ভূমিকা পালন করে। সে কারণে খুব দ্রুতগতিতে 'এফ

এফ' (ফ্রিডম ফাইটার্স) ও 'মুজিব বাহিনী' (বিএলএফ) গড়ে ওঠে। 'বিএলএফ' ২৫ মার্চের অনেক আগেই বাংলাদেশে গোপনভাবে গড়ে উঠেছিল। বিএলএফ ছিল 'নিউক্লিয়াস'-এর রাজনৈতিক উইং। সশস্ত্র যুদ্ধের সময় বিএলএফ 'মুজিব বাহিনী' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই সম্ভাব্য সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধকে বিবেচনায় রেখে 'নিউক্লিয়াস' বাংলাদেশে 'জয়বাংলা বাহিনী' গড়ে তোলে, যার কমান্ডার ছিলেন আ স ম আবদুর রব এবং ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন কামরুল আলম খান খসরু। ছাত্রীদের নিয়ে গড়ে তোলা হয় ছাত্রী 'জঙ্গি বাহিনী' যার নেতৃত্বে ছিলেন মমতাজ বেগমসহ কয়েকজন ছাত্রলীগ নেত্রী। সশস্ত্র যুদ্ধ চলাকালে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য দ্বারা প্রবাসী সরকার গঠিত হয়। সেই প্রবাসী সরকারকে উপদেশ দেয়ার জন্য 'জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ' গঠিত হয় 'নিউক্লিয়াস' নেতাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায়। এ উপদেষ্টা পরিষদে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের কয়েকজন সিনিয়র মন্ত্রী ছাড়াও মওলানা ভাসানী, প্রফেসর মোজাফফর আহমদ, কমরেড মণি সিংহ ও মনোরঞ্জন ধর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

## 'নিউক্লিয়াস' ও ছাত্র যুব-সংস্কৃতিসেবীরা

'নিউক্লিয়াস'-এর যে সকল সদস্য সে-সময় ছাত্র-যুব সংস্কৃতিসেবী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমিনুল হক বাদশা, আল-মুজাহিদী, এনায়েতুর রহমান (ডাকসু-জিএস), মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, নাসিরুল ইসলাম বাচ্চু, (শহীদ) চিশ্‌তি শাহ্ হেলালুর রহমান, আফতাব আহমদ, কাদের মাহমুদ, শামসুজ্জামান খান, শামসুদ্দিন আহমেদ পেয়ারা, আনসার উদ্দিন আহমদ (সূর্যসেন হল), মফিজুর রহমান খান, বদিউল আলম মজুমদার, সা কা ম আনিছুর রহমান খান, রায়হান ফিরদাউস মধু, রেজাউল হক মোশতাক, মোস্তাফিজুর রহমান, একরামুল হক, খালেদ মোহাম্মদ আলী, রাখাল চন্দ্র বণিক, মোশারফ হোসেন, হরমুজ বিএসসি, খন্দকার ফারুক আহমেদ, আপেল মাহমুদ, মিলন মাহমুদ, সুমন মাহমুদ, আবদুল্লাহ সানি (ইঞ্জিনিয়ার), শিব নারায়ণ দাস, রফিকুল ইসলাম ('লিটল কমরেড'), হাবিবুর রহমান খান (নারায়ণগঞ্জ), সালাহউদ্দিন ইউসুফ,

মইনুল ইসলাম চৌধুরী আজাদ, মোয়াজ্জেম হোসেন খান মজলিশ, (শহীদ) নজরুল ইসলাম (জগন্নাথ কলেজ), (শহীদ) নজরুল ইসলাম (ঢাকা কলেজ), আবদুল মালেক শহীদুল্লাহ, আবদুল বাতেন চৌধুরী, গোলাম ফারুক ('হিটলার ফারুক'), (শহীদ) আবদুল ওয়াদুদ, (শহীদ) সাকুর, (শহীদ) মামুন (রাজশাহী), মজিবুল হক, আগা খান মিন্টু, তৈয়বুর রহমান (মিরপুর), মোহাম্মদ উল্লাহ (আদমজী), আহমদ উল্লাহ, অজিত রায়, আবদুল লতিফ, আবদুল জব্বার (কণ্ঠশিল্পী), মুরাদ (গোপীবাগ), ডা. শেখ হায়দার আলী, আবু বকর সিদ্দিক, মহিউদ্দিন আহমদ বুলবুল, ডা. সোলায়মান মন্ডল, ডা. গাজী আবদুল হক, ডা. কলিমুর রহমান, নাজিমউদ্দিন আহমেদ (বর্তমানে প্যারিসবাসী), (ডাক্তার, মরহুম) রফিকুল ইসলাম ('আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' প্রস্তাবের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা), শিল্পী শাহাবুদ্দিন, শেখ জামাল (বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় পুত্র), শিল্পী কামাল আহমেদ (বর্তমানে কানাডা প্রবাসী)সহ আরও অনেকে। 'নিউক্লিয়াস'-এর উদ্যোগে 'পাঠক্রম' নামে একটি সাহিত্য সংগঠন গঠিত হয়েছিল। এর দায়িত্বে ছিলেন আমিনুল হক বাদশা, মেসবাহ উদ্দীন আহমেদ এবং আবদুল হাই (মুন্সিগঞ্জ)।

ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য হয়েও আহমদ ছফা, আসাদ চৌধুরী, রশীদ হায়দার, সমুদ্র গুপ্ত, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, ফকির আলমগীর, রাহাত খানসহ বেশ কয়েকজন সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় ছাত্রলীগের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন।

প্রবীণ সাংবাদিকদের মধ্যে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, জহুর হোসেন চৌধুরী, সিরাজউদ্দীন হোসেন, আসাফউদ্দৌলা রেজা, সত্যেন সেন, এম আনিসুজ্জমান, এনায়েতুল্লাহ খান (*হলিডে*)সহ সে সময়ের রাজনৈতিক-সাহিত্য রচনায় পারদর্শী সবার সঙ্গে 'নিউক্লিয়াস'-এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মাহবুব তালুকদার, আবুল কাসেম ফজলুল হক, সাংবাদিক ওয়ালিউল্লাহর নামও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *দি পিপল* পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক আবিদুর রহমানের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ ছিল। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এবং পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের সঙ্গেও 'নিউক্লিয়াস' নেতৃবৃন্দ যোগাযোগ রাখতেন।

সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ, কে জি মোস্তফা, এহতেশাম হায়দার চৌধুরী (মিয়া ভাই), এন এম হারুন, মিজানুর রহমান, খোন্দকার আবু তালেব, নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী, আবদুল আওয়াল খান (দৈনিক *আজাদ*) আমার কাছ থেকে 'নিউক্লিয়াস'-এর গোপন কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হতেন।

ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম এবং *ইত্তেফাক*-এর কর্মাধ্যক্ষ এম এ ওয়াদুদ (মন্ত্রী দীপু মনির বাবা) ও আবদুল মোমিন তালুকদারের সঙ্গে 'নিউক্লিয়াস'-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

'নিউক্লিয়াস' প্রধানদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যাঁরা বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতেন তাঁরা হলেন মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মনি), নূরে আলম জিকু, চিত্তরঞ্জন গুহ, সৈয়দ আহমদ, আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, সুধীর কুমার হাজরা, হাসানুল হক ইনু, আ ফ ম মাহবুবুল হক, শরীফ নূরুল আম্বিয়া, মাসুদ আহমেদ রুমি, সাইফুল গণি চৌধুরী, (শহীদ)স্বপন কুমার চৌধুরী, ফজলে এলাহী, স্বপন আচার্য, কামরুল আলম খান খসরু, মোস্তফা মোহসীন মন্টু, মহিউদ্দিন, কামাল উদ্দিন ফীরু, তারন, এস এম সুলতান টিটু, মাজহারুল হক বাকি, ঝিলু শামসুন্নাহার ইকু, ফরিদা খানম সাকি, আফরোজা হক রিনা, রাশেদা বেগম, শিরিন আখতার, লুৎফা হাসিন রোজি, ফেরদৌসী হক লিনু, মশিউল আলম হান্নান, সৈয়দ আবেদ মনসুর, কে এম আখতারুল আলম খান, রেজাউল হক চৌধুরী, মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ, মাহবুবুর রহমান, হুমায়ুন কবীর ও ফখরুল আলম খানসহ অনেকেই।

চট্টগ্রাম কালুরঘাট থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কার্যক্রম পরিচালনার কাজে 'নিউক্লিয়াস' ও 'বিএলএফ'-এর যাঁরা সক্রিয় ছিলেন তারা হলেন শাহজাহান খান (বিমান), রাখাল চন্দ্র বণিক, এম এ হান্নান (আওয়ামী লীগ), ডা. এম এ মান্নান (বোয়ালখালী), আতাউর রহমান কায়সার (আনোয়ারা, বাঁশখালী), ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, শাহ-ই-জাহান চৌধুরী (বাঁশখালী), আবদুল হালিম, আবদুস সোবহান, আবদুল শাকুর (টিএনটি), ইঞ্জিনিয়ার মোছলেমউদ্দিন, আমিনুর রহমান, দেলোয়ার হোসেন, আহমেদ শরীফ মুনির, এস এম ইউসুফ, শওকত হাফিজ খান রুশ্নি, কফিল

উদ্দিন (এডভোকেট), ইন্দু নন্দন দত্ত, ডাক্তার মাহফুজুর রহমান, সাবের আহমেদ আজগরী প্রমুখ।

বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব 'নিউক্লিয়াস'-এর অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

## সামরিক শাসন জারি

'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র বিরোধী আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেলে মওলানা ভাসানীও তাঁর এতদিনের নীরবতা ভেঙে শেখ মুজিবের মুক্তি দাবি করেন। পল্টনে অনুষ্ঠিত তাঁর জনসভা ফেরত উত্তেজিত জনতা ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকন্সট্রাকশান (বিএনআর) অফিস, আবদুল গণি রোডে অবস্থিত প্রাদেশিক মন্ত্রী সুলতান আহমদ খান (কুলি সুলতান) ও আগরতলা মামলার প্রধান বিচারপতির বাড়িতে (বর্তমানে বাংলা একাডেমি) আগুন লাগিয়ে দেয়। বিচারপতি লুঙ্গি পরে ক্যান্টনমেন্টে পালিয়ে যান এবং পরের দিন পশ্চিম পাকিস্তান চলে যান। তারপর দিন সরকারিভাবে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার করা হয়।

১৯৬৯-এর ২৫ মার্চ আইয়ুব পদত্যাগ করেন। প্রধান সেনাপতি ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতায় আসেন। সামরিক শাসন জারির দিনটিতে আমি ছিলাম খুলনায়। ঢাকায় ফেরার সময় সন্ধ্যাবেলা পথের মধ্যে সামরিক শাসন জারির কথা রেডিওতে শুনলাম। আরিচা থেকে পদ্মা পার হয়ে মানিকগঞ্জ দিয়ে ঢাকায় আসার পথে মুজিব ভাইয়ের ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারের বাসায় ঢুকলাম। আমরা পাঁচ-ছয় জন ছিলাম। মুজিব ভাইয়ের বাসায় তখন কোনো লোকজন নেই। বোঝা গেল সামরিক শাসনের কারণে হয়তো লোকজন আসেনি, কিংবা মুজিব ভাই নিজেই যারা এসেছিল তাদেরকে চলে যেতে বলেছেন। আমি আমার সঙ্গীদের নিচতলায় রেখে দোতলায় যেতেই ভাবী (বেগম মুজিব) বললেন, 'আপনার ভাই ছাদে। ওখানে চলে যান।'

মুজিব ভাই ছাদের কোণে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে বললেন, 'তুই তো খুলনায় গিয়েছিলি, এখন ফিরলি?' বললেন, 'ইয়াহিয়ার মনোভাব বুঝতে হবে। কদিন আসিস না। কাউকে আসতে বলিস না। সতর্ক থাকিস।'

সাতদিন পর আমি নিজেই মুজিব ভাইয়ের বাসায় গেলাম। দেখা হতেই বললেন, 'কিরে, এ কয়দিনে একবারও আসলি না?'

আমি বললাম, 'আপনিই তো বলেছেন না আসতে।'

তিনি বললেন, 'আরে সেটা কি তোকে বলা নাকি?' আমি তো কীভাবে তোকে খবর দেব সেটাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না।'

তখন বিকেল। বাসায় কাউকে দেখতে পেলাম না। তিনি হেসে নিজে থেকেই বললেন, 'আওয়ামী লীগাররা সব ভিতু। ওরা এমন দুর্দিনে আসবে?'

সেদিন অনেকক্ষণ থাকলাম। প্রায় দুই-তিন ঘণ্টা। কাজ নিয়ে আলাপ হলো। সামরিক শাসন থাকায় জনসভা বা মিছিল করার ব্যস্ততা থাকবে না। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে সংগঠন গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা হলো।

হেসে আর কিছুটা আফসোসের ভঙ্গিতে বললেন, 'আওয়ামী লীগের সংগঠন তো, এমনিতে কিছু হবে না। সব কাজ তোদেরই করতে হবে'।

আমি বললাম, সারা দেশেই সংগ্রাম পরিষদের একটা কাঠামো গড়ে উঠেছে। শ্রমিক এলাকায় শ্রমিকদের মধ্যে প্রাথমিক সংগঠন গড়ে উঠেছে। গ্রামের দিকে কৃষকদের মধ্যে সেভাবে সংগঠন গড়ে ওঠেনি। ছিটেফোঁটা কিছু আছে। বললাম, আরও সাত-আট দিন অপেক্ষা করে কাজ শুরু করবো।

আমি বেরিয়ে আসার সময় মুজিব ভাই বললেন, 'তুই রেগুলার আসা-যাওয়া করিস।' হাসতে হাসতে বললেন, 'কথা বলারও তো লোক পাওয়া যায় না রে।'

এমনিতে মুজিবভাইয়ের সঙ্গে আমার রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতার বিষয়টা বলে বোঝানো যাবে না। আমি তো তাঁর পরিবারেরই একজন ছিলাম। তবে আমাকে যেতে না বললে আমি যেতাম না। কোনো কারণে হয়তো আমাকে পরের দিন আসতে বলেননি, আমিও যাইনি। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কী রকম ঘনিষ্ঠ ছিল একটি বিবরণ থেকে সেটা বোঝা যাবে। অনেকেই তাঁর সঙ্গে দেখা করছেন, কথা বলছেন, আমাকেও দেখলেন, আমি বসে আছি। আমার মতো করে। দোতলায় বসার ঘরে সবাই। আমাকে ইশারা করতেন বাথরুমের পাশের

ড্রেসিংরুম পার হয়ে গিয়ে দাঁড়াতে। টয়লেটে যাবার আগে ড্রেসিংরুমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলতে শুরু করতেন আমার সঙ্গে। কিছু কথা বলে টয়লেটে যেতেন, আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম, এরপর তিনি বেরিয়ে এসে আরও অনেকক্ষণ ড্রেসিংরুমে আমার সঙ্গে অন্যান্য জরুরি কথাবার্তা সেরে নিতেন। তখনই বলে দিতেন আগামী দিন আমি কখন আসবো।

## শ্রমিকদের মধ্যে কাজ

১৯৬৯-এ সামরিক শাসন বলবৎ অবস্থায়ই 'নিউক্লিয়াস'-এর মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হলো, সময়টাকে আমরা সংগঠন গড়ে তোলার কাজে ব্যবহার করবো। 'নিউক্লিয়াস'-এর মিটিংয়ে আরও সিদ্ধান্ত হলো, শ্রমিকদেরকে সংগঠিত করতে হবে। এর আগে শ্রমিকদের মধ্যে আওয়ামী লীগের কোনো তৎপরতা বা কার্যক্রম ছিল না। শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই 'নিউক্লিয়াস' কাজটি করার দায়িত্ব আমার ওপর দিল। এ যাবৎকাল 'নিউক্লিয়াস'-এ আমার দায়িত্ব ছিল আন্দোলনের কৌশল-পরিকল্পনা এবং স্বাধীনতার লক্ষ্যে তত্ত্বগত বিষয়াদি প্রণয়ন করা। সব ধরনের লিফলেট ও নির্দেশনামা তৈরি করা। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ও 'পিআইএ'-এতে সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্বও ছিল আমার। সাংবাদিকসহ বিদেশীদের থাকার জায়গা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল। আর পিআইএ অফিস ছিল ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সমাগমস্থল। এবার নতুন দায়িত্ব পড়লো শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার। সে এক দুরূহ কাজ। অবশ্য এর আগেই মিছিল, হরতালসহ আন্দোলন পরিচালনার জন্য শিল্প এলাকায় গোপনভাবে 'নিউক্লিয়াস' সেল এবং এক ধরনের লাইনভিত্তিক সংগঠন অর্থাৎ কমিটি গঠন করার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। তবে এ ধরনের কাঠামো দিয়ে সাময়িক আন্দোলনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা গেলেও, বড় ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয় না।

তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্রই শ্রমিক সংগঠনগুলো ছিল বামপন্থিদের—যেমন তোয়াহা-কাজী জাফর-আবুল বশর কিংবা নির্মল সেনদের দখলে। ব্যাপক ভিত্তিতে সংগঠন গড়ে তুলতে গেলে এদের

সঙ্গে মুখোমুখি হতে হবে, এটি আমি জানতাম। এ অবস্থায় বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীদের দল ত্যাগ (defection) করানোর যে পদ্ধতি সেটিই আমি বেছে নিলাম। আবদুল মান্নানকে সমাজবাদী দল থেকে বের করে নিয়ে আসার চেষ্টা করতেই অতি সহজে রাজি হলেন। আগামীতে জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হওয়া এবং শ্রমমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ আছে বলাতে প্রথমে উনি বিষয়টিকে হালকাভাবে নিলেন। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে আমার দক্ষতা এবং মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক দেখে তিনি তা বিশ্বাস করলেন। কাজটি যে সমাজবাদী দলের নেতাদের অগোচরেই করতে হবে সেটাও তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হলাম। শ্রমিক নেতা হিসেবে সারা দেশে শ্রমিকদের মধ্যে মান্নান ভাইয়ের ভালো পরিচিতি ছিল। আমি তাঁকে নিয়ে চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেটের চা বাগান এবং উত্তরবঙ্গের সৈয়দপুরে ঘুরলাম। তাঁর ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্যই এসব জায়গায় যে তাঁর সমর্থন ও সংগঠন থাকা দরকার, সেটাও আমি তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হলাম। বলা বাহুল্য আমার নিজের এসব জায়গায় কোনো পরিচিতি ছিল না। সংগঠন গড়ে তোলার বিষয়ে একটি মৌলিক ধারণা আমি পেয়েছিলাম সে সময়ের 'ভিয়েতকং'দের সংগঠন কাঠামো থেকে। এ বিষয়েও আমি 'নিউক্লিয়াস'-এর অনুমোদন নিয়েছিলাম। ভিয়েতকংদের সাহিত্য পড়া ও তাঁদের কার্যক্রম সম্পর্কে জানা 'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্যদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। ভিয়েতকংদের সংগঠনের বৈশিষ্ট্য ছিল এগারজন নিয়ে একটি সেকশন গঠন করা—সামনের জন 'লিডার', মাঝখানে নয়জন, শেষ ব্যক্তি 'ডেপুটি লিডার'। স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রামের সময় আমরা এ ধরনের সেকশনভিত্তিক সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিলাম। উত্তরবঙ্গে এই সেকশন কাঠামো গড়ার দায়িত্ব ছিল মার্শাল মনি ও মাসুদ আহমেদ রুমির ওপর। পশ্চিম অঞ্চলে এ কাঠামো গড়ে তোলার কাজ করেছিলেন নূরে আলম জিকু (তোফায়েল আহমদের ডেপুটি)।

সংগঠন কাঠামোর ব্যাপারে আমি আইরিশ স্বাধীনতা আন্দোলনের কৌশলও ভালোভাবে আত্মস্থ করি। নগরভিত্তিক গেরিলা যুদ্ধের ধারণাটি এসেছে মূলত এ আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রাম বা যুদ্ধের ইতিহাস থেকে। ভবিষ্যতের সশস্ত্র সংগ্রামে এ কৌশলটি যে আমাদের

কাজে লাগতে পারে, তা-ও আমি ভালোভাবেই বুঝেছিলাম। শ্রমিক এলাকায় এ ধরনের লাইনভিত্তিক সংগঠন গড়ার ধারণা মান্নান ভাইকে বলতেই তিনি সম্মত হলেন। তবে প্রত্যেক কারখানায় ও শিল্পাঞ্চলে যে আমাদের 'নিউক্লিয়াস'-এর কোর-কমিটি আছে সেটা তাঁকে জানানো হয়নি। এই পদ্ধতিতে কাজ করার ফলে প্রত্যেক শিল্পকারখানা ও শিল্পাঞ্চলে বিদ্যুৎগতিতে আমাদের সংগঠনের কাঠামো গড়ে তোলা গেল। সমাজবাদী দল কিংবা কাজী জাফর, তোয়াহা-হক কেউই আমাদের সাংগঠনিক ব্যাপ্তি ও সক্ষমতা টের পেলো না। ১৯৭০-এর নির্বাচনের সময় আমাদেরকে বড় বড় শ্রমিক সভা করতে দেখে তারা বিষয়টি আঁচ করতে পারলো। বুঝলো, বাধা দেওয়ার সময় শেষ হয়ে গেছে। একইভাবে চা বাগানের শ্রমিকদেরও আমরা সংগঠিত করি।

এ সময়ে মান্নান ভাই 'বিএলএফ'-এর চার কমাণ্ডারের সঙ্গে (সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ) তাঁকে যুক্ত করে পাঁচ কমাণ্ডারভিত্তিক কাজ করার প্রস্তাব দেন। কৌশলগত কারণে আমি প্রথম সুযোগেই এ প্রস্তাবটিতে সম্মত হলাম এবং কাজ শুরু করলাম। নীতিগতভাবে মনি ও তোফায়েল 'বিএলএফ'-এ শ্রমিকদের এ ধরনের অন্তর্ভুক্তি মানবে না—আমি এমনটাই ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু কার্যত দেখলাম, তারা 'বিএলএফ' ও শ্রমিকদের যৌথ কর্মকাণ্ডে সম্মত হলো। এ সিদ্ধান্ত আমাদের স্বাধীনতার লড়াইয়ে খুব সহায়ক হয়েছিল। এ পর্যায়ে আমরা অনেককেই শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে লাগাতে সমর্থ হই। সমান্তরালভাবে ছাত্র সংগঠনের কাজ এবং 'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিও চলতে থাকলো।

সামরিক শাসন জারি থাকার কারণে বড় শ্রমিক সভা করা সম্ভব হচ্ছিল না। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসার পরপরই এয়ার মার্শাল নূর খান চমক লাগানো কিছু কাজ করলেন। সেসবের মধ্যে ছিল শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ (ওয়েজ বোর্ড) ও শ্রম আদালতে শ্রমিক প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তি। এ ধরনের কাজের ফলে সামরিক শাসনের বিষয়ে মানুষের মধ্যে ভয়ভীতি অনেকখানি কমে যায়। এ সময়ে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের সরকারি উদ্যোগে পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়।

১৯৭০-এর প্রথমভাগে সামরিক শাসন শিথিল করা হলো। 'ঘরোয়া রাজনীতি' চালু হলো। সুযোগটাকে আমরা কাজে লাগালাম। শ্রমিক সংগঠন, ছাত্রলীগ এবং 'নিউক্লিয়াস'কে আরও সংগঠিত করার মাধ্যমে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হলো।

## ডাকসু নির্বাচন ১৯৭০

সামরিক আইনের অধীনে ডাকসু নির্বাচন দেওয়া হলো ১৯৭০ সালে। সেটিই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ছাত্রদের সরাসরি ভোটে ডাকসুর প্রতিনিধি নির্বাচন। এ সময় ভিপি পদের মনোনয়ন নিয়ে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে বেশ টানাপোড়েন শুরু হলো। শেখ শহীদ প্রথমদিকে ভিপি পদের জন্য আগ্রহী থাকলেও শেষ পর্যন্ত আ স ম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখনকে নিয়ে (রব-মাখন) প্যানেল হলো। এ প্যানেল বিপুল ভোটে জয়ী হলো। এ জয় সাধারণ ঘটনা ছিল না। কারণ, আগেই বলেছি, ছাত্রদের সরাসরি ভোটে সেবারই প্রথম ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রবের ভিপি পদে মনোনয়নের বিষয়টি ছিল কৌশলগত দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'স্বাধীনতার লড়াই'-এর জন্য যুবনেতা হিসেবে ডাকসুর ভিপি পদে রবকে আমাদের প্রয়োজন ছিল। শেখ শহীদ ভিপি হলে সে উদ্দেশ্য হয়তো পূরণ হতো না। এ ব্যাপারে শেখ মনি ও শেখ শহীদরা মুজিব ভাইয়ের হস্তক্ষেপ চেয়েছিল। মুজিব ভাই কিন্তু এ বিষয়ে একেবারেই নিরপেক্ষ ছিলেন। আমি নিজে এ নির্বাচন পরিচালনা করি। ইকবাল হল, মহসীন হল, সূর্য সেন হল, রোকেয়া হল, জগন্নাথ হল, এসএম হল, ঢাকা হল ও এফএইচ হল নিয়ে সমস্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা নির্বাচনের ১৫ দিন আগে থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত ভিন্ন এক চেহারা নেয়। সে সময় ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের সংসদ ছিল। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব হলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিশাল বিশাল মিছিল—আর সে সব মিছিলে বিভিন্ন আকারের পোস্টার, ফেস্টুন, শোষণের চিত্র সংবলিত কার্টুন, রব-মাখন ছাপ মারা গেঞ্জি, রাতের বেলা হাজার হাজার মশাল—সব মিলিয়ে সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য ও ঘটনা। নির্বাচনের আগের দিন যে র‍্যালি বের হলো তা দেখে মনে হলো যেন যুদ্ধ জয়ের পর বিজয় মিছিল।

আ স ম আবদুর রব জিতেছিল ৮৬ ভোটে। এ নির্বাচন উপলক্ষে আমাদের নিরাপত্তার দিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। খসরু, মন্টু, মহিউদ্দিন ও ফিরুর নেতৃত্বে আমাদের যে সংগঠিত 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী', তারা নির্বাচনী প্রচারকালে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় প্রতিটি হলে চীনের প্রাচীরের মতো প্রতিরক্ষার দেয়াল তুলে রেখেছিল।

## ছাত্রলীগের দুই ধারা

ডাকসু নির্বাচনের সময়ে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে দুটি বিপরীত ধারার অবস্থান সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি রব-শাজাহান সিরাজের নেতৃত্বে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি এবং বিপরীতে স্বাধীনতার প্রশ্নে তখনও যাদের মনোভাব ছিল দ্বিধান্বিত তাদের এক ধরনের জোট। স্বাধীনতার পক্ষে ছিলাম আমরা 'নিউক্লিয়াস' ও ছাত্রলীগের রব-শাজাহান সিরাজ গ্রুপ। অন্যদিকে শেখ মনির নেতৃত্বে স্বাধীনতার প্রশ্নে দোদুল্যমান শেখ শহীদ ও নূরে আলম সিদ্দিকী গ্রুপ। গোপনে প্রচারটা ছিল এ রকম : রব-সিরাজরা স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন হলে সশস্ত্র যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত। অপরপক্ষে নূরে আলম সিদ্দিকী ও শেখ শহীদরা পাকিস্তানিদের সঙ্গে আপোস করে তাদের অধীনেই পাকিস্তানের অংশ হিসেবে থাকতে চায়।

১৯৭০-এর এ পর্যায়ে ছাত্রলীগের নামে 'নিউক্লিয়াস'-এর বক্তব্য প্রচারিত হতো বিভিন্ন প্রকারের প্রচারপত্রের মাধ্যমে। এ সময়ে প্রচারপত্র তৈরিতে আমি যে কজনের সহযোগিতা পেয়েছিলাম তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—শামসুদ্দিন পেয়ারা, রেজাউল হক মুশতাক ও রায়হান ফিরদাউস মধু। এ কাজগুলোর সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করতো মাসুদ আহমেদ রুমি।

'নিউক্লিয়াস' এ সময়ে ঢাকায় স্বাধীনতার সরাসরি ঘোষণা সংবলিত কিছু পোস্টারিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের জন্য আমি, রাজ্জাক, হাসানুল হক ইনু, শরীফ নূরুল আম্বিয়া ও আবদুল্লাহ সানী—এই পাঁচজনকে নিয়ে টিম গঠন করি। সর্বমোট ৫০টি পোস্টার সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে লেখা হয়। তৎকালীন নতুন ঢাকায় ৩০টি এবং পুরনো ঢাকার নবাবপুর, সদরঘাট ও ইসলামপুর এলাকায় ২০টি পোস্টার লাগানো হয়। কাজটি যাতে দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করা

যায় তার জন্য হাসানুল হক ইনু তার বাবার গাড়িটি নিয়ে এসেছিল। আমরা রাত তিনটায় বেরিয়ে যাই। ভোর পাঁচটার মধ্যে পোস্টার লাগানো শেষ করা হয়। পোস্টারিং শেষে সকাল বেলায় আমরা সবাই মিলে ফুটপাতের দোকানে বসে চা খাই এবং সেই গাড়িতে চড়েই ফিরে আসি। এ পোস্টারিংই ছিল 'স্বাধীনতা'র প্রথম সরাসরি আহ্বান।

এর আগে ১৯৬৯-এর দিকে আমরা 'নিউক্লিয়াস' নিয়ে কিছু মৌলিক চিন্তা-ভাবনা শুরু করি। ৬-দফা ও ১১-দফায় উল্লেখিত স্বায়ত্তশাসনের দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আমরা এ সময় জনগণ বিশেষ করে ছাত্র-যুবকদের মধ্যে স্বাধীনতার চিন্তাকে নিয়ে যাওয়ার আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি। এটি আমাদের চিন্তা জগতে এবং আন্দোলনের ক্ষেত্রে নতুন মোড় ফেরাতে পারে, সে সম্ভাবনা মাথায় রেখে সে অনুযায়ী কার্যবিধি গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হই। আমাদের মনে হয়, জনগণের ব্যাপক অংশকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার আগে ছাত্র-যুবকদের মধ্যে এক দফার (স্বাধীনতার) দাবিটিকে পরিচিত ও জনপ্রিয় করে তোলা প্রয়োজন। এ জন্য ভবিষ্যতের সকল আন্দোলন-সংগ্রামে ৬-দফা ও ১১-দফা কর্মসূচি প্রচারের পাশাপাশি স্বাধীনতামুখী বিভিন্ন স্লোগান দেয়ারও পরিকল্পনা গ্রহণ করি। স্লোগান তৈরির জন্য আলাদা আলাদাভাবে তিনটি গ্রুপকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রথমটি আফতাব ও চিশতির নেতৃত্বে, দ্বিতীয়টি আবুল কালাম আজাদের (ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়) নেতৃত্বে আর তৃতীয়টি রফিকের ('লিটল কমরেড') নেতৃত্বে।

এ সময়ে ঢাকার বিভিন্ন দেয়ালে '৬-দফা ও ১১-দফা, না হলে এক-দফা', 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা', 'পিণ্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা', 'জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনবো', 'আগরতলার মিথ্যা মামলা মানি না মানি না'—এ ধরনের স্লোগানগুলো চিকা আকারে লেখা হতো।

### জয়বাংলা স্লোগান : পক্ষ-বিপক্ষ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও সশস্ত্র যুদ্ধে 'জয়বাংলা' স্লোগানটি এক নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। 'জয়বাংলা' এমন একটি স্লোগান যা বাংলাদেশের সশস্ত্র যুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধা তথা সমগ্র দেশবাসীকে

স্বাধীনতার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ ও উদ্দীপ্ত করেছিল। এই স্লোগান ছিল সশস্ত্র যুদ্ধকালীন বাঙালির প্রেরণার উৎস। যুদ্ধে সফল অপারেশন শেষে কিংবা যুদ্ধ জয়ের পর অবধারিতভাবে মুক্তিযোদ্ধারা মিলিত কণ্ঠে 'জয়বাংলা' স্লোগান দিয়ে চারপাশের জনগণকে বিজয়ের বার্তা পৌঁছে দিত। কোন পরিপ্রেক্ষিতে কখন, কীভাবে এবং কী বিশেষ প্রয়োজনে এ স্লোগানটির উৎপত্তি হয়েছিল, তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

১৯৬৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর, সোমবার। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একটি সভা ছিল। মধুর ক্যান্টিনের সে সভায় ১৭ সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস' যৌথভাবে পালনের কর্মসূচি প্রণয়ন নিয়ে আলোচনা চলছিল। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আহূত সে সভায় আলোচনার এক পর্যায়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ও ছাত্রলীগ নেতা (তৎকালীন জিন্নাহ হল, বর্তমানে সূর্যসেন হলের আবাসিক) আফতাবউদ্দিন আহমদ 'জয়বাংলা' স্লোগানটি উচ্চারণ করে। সভা চলাকালে অনেকটা আকস্মিকভাবেই সে সকলকে চমকে দিয়ে চিৎকার করে 'জয়বাংলা' স্লোগানটি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আরও সাত-আট জন কর্মী সমস্বরে তার সঙ্গে কণ্ঠ মেলায়। সেদিনের সেই সভায় আফতাব বেশ কয়েকবার 'জয়বাংলা' স্লোগানটি দেয়। শেষের দিকে উপস্থিত ছাত্রলীগের সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মীরাও তার সঙ্গে এই স্লোগানে যোগ দেয়। এভাবেই কিছুক্ষণ ঐ স্লোগান চললো। সেটাই এ বাংলার বুকে 'জয়বাংলা' স্লোগানের সর্বপ্রথম উচ্চারণ। স্লোগানদাতাদের অনেকেই ছিলেন 'নিউক্লিয়াস' বা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'-এর সদস্য। উল্লেখ্য, 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' তখন হাতে লেখা তিন পাতার একটি পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশ করেছিল, যার নাম ছিল 'জয়বাংলা'।

১৯৭০ সালের ১৮ জানুয়ারি, রবিবার। সেদিন পল্টনে আওয়ামী লীগের জনসভায় আমি 'জয়বাংলা' স্লোগানটি দিয়েছিলাম। স্লোগানটি সেদিন সকলের ভালো লেগেছিল। সকলেই আন্তরিকতার সঙ্গে ও গভীর আবেগে 'জয়বাংলা' স্লোগানকে গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানেরও এ স্লোগান বেশ মনে ধরে। এরপর ১৯৭০-এর ৭

জুন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসভায় তাঁর ভাষণে তিনি সর্বপ্রথম এ স্লোগানটি ব্যবহার করেন।

'জয়বাংলা' স্লোগানের বিষয়ে ছাত্রলীগের দুই-একজন এবং আওয়ামী লীগের সবারই (বঙ্গবন্ধু ছাড়া) ঘোর আপত্তি ছিল। আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটিতেও বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। সেখানে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ভারতঘেঁষা রাজনীতি করার অপপ্রচারকে 'জয়বাংলা' স্লোগান না দেওয়ার পক্ষে যুক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়। শুধু জাতীয় কমিটির সে সভাতেই নয়, সাধারণভাবেও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই (তাজউদ্দীন আহমদ ছাড়া) 'জয়বাংলা'র বিরুদ্ধে অবস্থান নেন।

বস্তুত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বৃহত্তর অংশ সে সময় 'জয়বাংলা' স্লোগানের সরাসরি বিরোধিতা করেন। তাঁরা এ স্লোগানের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর কাছে অভিযোগও করেন। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর সরাসরি উত্তর ছিল, 'এ বিষয় নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নাই।' বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে কোনো রকম সমর্থন না পেয়ে 'জয়বাংলা' স্লোগানের বিরোধিতাকারীরা এরপর ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে। তারা 'জয়বাংলা' স্লোগানকে ভারতের 'জয় হিন্দ' ও সিন্ধুর 'জিয়ে সিন্ধ'-এর সঙ্গে মিলিয়ে এক ধরনের বিদ্রূপ করতো। আর সুযোগ পেলে 'জয়বাংলা' স্লোগান দেওয়া ছাত্রলীগ কর্মীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতো।

১৯৭০ এর ৪ জানুয়ারি, রবিবার। সেদিন ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের অনুষ্ঠানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন প্রধান অতিথি। অনুষ্ঠানের শুরুতে 'জয়বাংলা' স্লোগান দেওয়া শুরু হলে দুই-একজন তাতে আপত্তি করেন এবং এ স্লোগানটি বন্ধ করতে বলার জন্য সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অনুরোধ জানান। তা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানে সেদিন বারবার 'জয়বাংলা' স্লোগান উচ্চারিত হতে থাকে।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁর বক্তব্য প্রদানকালে 'জয়বাংলা'র পক্ষে-বিপক্ষে তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করলেন না। বিষয়টি বুঝতে পেরে 'নিউক্লিয়াস'-এর কর্মীরা চার-পাঁচজন করে মিলে একটি গ্রুপ হয়ে সন্ধ্যার পর থেকে রাত পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন কলেজের হল-হোস্টেলগুলেতে 'জয়বাংলা' স্লোগান দিত। রাতের

অন্ধকারে হাতে লেখা পোস্টার লাগানো হতো ঢাকা শহরের সর্বত্র। এ নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের আপত্তি ও অভিযোগ এক পর্যায়ে মুজিব ভাই পর্যন্ত গড়ালো। আপত্তিকারীদের প্রতিনিধি হিসেবে কে এম ওবায়েদুর রহমানকে বঙ্গবন্ধুর কাছে পাঠানো হয়। ওবায়েদুর রহমান বঙ্গবন্ধুর কাছে 'জয়বাংলা'কে একটি গুরুতর আপত্তিকর স্লোগান হিসেবে তুলে ধরেন। আমি ঐ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মুজিব ভাই কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে পরবর্তী সময়ে বিষয়টির সুরাহা করবেন বলে জানান।

আসলে এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত বা সুরাহার কাজটা ছিল সে সময় অত্যন্ত জটিল ও কঠিন। কিন্তু স্বাধীনতার লক্ষ্যে 'জয়বাংলা' স্লোগানের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে এ বিষয়ে কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব 'নিউক্লিয়াস'-এর পক্ষ থেকে আমাকে দেওয়া হয়।

১৯৭০ এর ১৮ জানুয়ারি, রবিবার। সেদিন পল্টনে আওয়ামী লীগের জনসভা। আমাদের বিবেচনায় দিনটি ছিল স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছানোর এক সন্ধিক্ষণ। সেদিনের কর্মসূচি সফল করার দায়িত্ব বর্তেছিল 'নিউক্লিয়াস'-এর পক্ষ থেকে আমার ওপর। বলা বাহুল্য, সে দিনের গুরুত্বের কারণেই আমার ওপরে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৬৫-'৬৬ সালে ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন সৈয়দ মাজহারুল হক বাকি। ছাত্র রাজনীতির পর তিনি 'বিজ্ঞাপনী' নামে একটি বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, যার অফিস ছিল জিন্নাহ্ এভিনিউতে (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ)। সে সময় কামাল আহমেদ (বর্তমানে কানাডা প্রবাসী) ছিলেন একজন খ্যাতিমান অঙ্কন শিল্পী। তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। বয়সে তিনি আমার চাইতে বড় হওয়া সত্ত্বেও আমার সঙ্গে তার সখ্য ছিল। সেদিন শিল্পী কামাল আহমেদকে আনা হলো 'বিজ্ঞাপনী' প্রতিষ্ঠানে। সে সময় রবিবার ছিল সাপ্তাহিক ছুটির দিন। সৈয়দ মাজহারুল হক বাকি ও কামাল আহমেদকে আমি ৪x১০ ফুট মাপের এক টুকুরো কাঠের উপরে 'জয়বাংলা' শব্দটি লিখে দিতে বলি। লেখার পর কাঠটিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। তখন বেলা তিনটা। পাঁচটায় আওয়ামী লীগের জনসভা শুরু হবে। সে সময়ে শহর আওয়ামী লীগের সক্রিয় সদস্য পনের-বিশ জনের বেশি ছিল না। বাকিরা সবাই খ্যাতিমান এ্যাডভোকেট আবদুস

সালাম খানের (বঙ্গবন্ধুর মামা) নেতৃত্বাধীন ৬-দফার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পিডিএম)-এ চলে যায়। ফলে আওয়ামী লীগের জনসভা ও অন্যান্য সাংগঠনিক কার্যক্রমে 'নিউক্লিয়াস' সদস্যদেরই দায়িত্ব পালন করতে হতো। তখনই 'নিউক্লিয়াস'-এর রাজনৈতিক উইং হিসাবে 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স' (বিএলএফ) গঠন করা হয়। এ সময়ে ঢাকা শহরের সব স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং শহরের সবকটি ওয়ার্ডে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠনের পাশাপাশি 'বিএলএফ'-এর সদস্য সংখ্যাও খুব দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। গোটা বাংলাদেশেই অবস্থাটা তখন এ রকম। শুধুমাত্র ঢাকা শহরেই 'বিএলএফ'-এর সদস্য সংখ্যা তখন প্রায় সাড়ে তিন হাজারে পৌঁছে গেছে। আর জেলা ও থানা (বর্তমানের উপজেলা) পর্যায়ে এই সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। এ সংখ্যা গণআন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থান পর্ব পেরিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামকালে প্রায় সাত হাজারে উন্নীত হয়।

সেদিনের জনসভায় লোক সমাগম, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব 'বিএলএফ' সদস্যদের ওপর দেওয়া হয়। মূল দায়িত্বে ছিলেন কাজী আরেফ এবং মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মনি)। অন্যান্য জনসভার মতো সেদিনও কবিয়াল শফি আহমেদ সভার প্রারম্ভে প্রায় ঘন্টাব্যাপী তার জনপ্রিয় গান গেয়ে শোনালেন।

কামাল আহমেদের রংতুলিতে 'জয়বাংলা' স্লোগান লেখা সেই কাঠের খণ্ড দুটির একাংশ আগেই বেশ উঁচু করে নির্মাণ করা মঞ্চের মাঝামাঝি জায়গায় শামিয়ানায় আটকানো হার্ডবোর্ডের ওপর লাগিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি অপর অংশ লাগানো হয় জনসভা শুরু হওয়ার দশ-পনেরো মিনিট আগে। বেলা চারটা নাগাদ জনসভায় আগত মানুষের দ্বারা পল্টন ময়দানের আউটার স্টেডিয়াম ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। যেসব খুঁটিতে মাইক লাগানো হয়েছিল, প্রত্যেকটি খুঁটির গোড়ায় দুজন করে 'বিএলএফ' সদস্য নিয়োজিত ছিল। তাদের হাতে দেওয়া হয়েছিল একটি করে 'চিরকুট'। নির্দেশ ছিল আমি যখন মঞ্চ থেকে স্লোগান দেব ঠিক তখন এ 'চিরকুট' খোলা হবে। প্রায় ১০০টি মাইকের হর্ণ লাগানো বাঁশের খুঁটির গোড়ায় ছাড়াও গোটা পল্টনের বিশেষ বিশেষ জায়গায়ও 'বিএলএফ' সদস্যদের দায়িত্ব ভাগ করে

দেওয়া হয়েছিল। নিচে, মঞ্চের সামনে, পেছনে এবং চারপাশেও 'বিএলএফ' সদস্যরা বিশেষ নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল। একমাত্র মসজিদটি ছাড়া তখনকার আউটার স্টেডিয়ামে বলতে গেলে আর কোনো স্থাপনা ছিল না। পেছনে ডিআইটির (বর্তমানে রাজউক) দিকে বাস্কেটবল খেলার জন্য ছোট ছোট কাঠের গ্যালারির মতো কয়েকটি স্থাপনা ছিল। সে সময় পল্টন ময়দানে এক লক্ষের মতো লোকসমাগম হতে পারতো। লোকে লোকারণ্য অবস্থায় ১৯৭০ সালের ১৮ জানুয়ারির জনসমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষভাবে নির্মিত সভার বক্তৃতা মঞ্চটি ছিল বেশ কিছুটা উঁচুতে। মঞ্চের শামিয়ানায় আটকানো হার্ডবোর্ডের উপরে লাগানো কাঠের খণ্ডে উজ্জ্বল লাল রঙের দু'টি শব্দ 'জয়বাংলা' জ্বলজ্বল করছিল। মঞ্চটি বেশ উঁচু হওয়ার কারণে দর্শকরা দূর থেকেও তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। সভার শুরুতে তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর বক্তব্য রাখলেন। সভাপতি ছিলেন মুজিব ভাই।

মঞ্চে মুজিব ভাই, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও গাজী গোলাম মোস্তফা ছাড়া আর কোনো আওয়ামী লীগ নেতা ছিলেন না। গাজী গোলাম মোস্তফার ওপর একটি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, স্লোগান দেওয়ার জন্য মুজিব ভাই যেন আমাকে অনুরোধ করেন। তাজউদ্দীন আহমদের বক্তব্যের সময় মুজিব ভাই বললেন, 'সিরাজ, স্লোগান দে'। কথাটি তিনি দুবার বললেন। আমি এ মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। আমি অত্যন্ত আবেগমিশ্রিত ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে জনতাকে উদ্দেশ করে বললাম, 'বাংলাদেশের জন্য আজকের এ দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রিয় ভাই-বোনেরা, আপনারা দেখছেন ঐ উপরে জ্বলজ্বল করছে দুটি শব্দ 'জয়বাংলা'। আসুন, সাত কোটি মানুষের পক্ষ হয়ে আমরা সকলকে জানিয়ে দিই, আমাদের পরিচয় আমরা বাঙালি। আসুন, যার কণ্ঠে যত জোর আছে সবটুকু দিয়ে আমরা একই সঙ্গে বলে উঠি, 'জয়বাংলা'। আজ থেকে 'জয়বাংলা'-কে আমাদের ভবিষ্যৎ আন্দোলনের স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করা হবে। আসুন, আমরা সবাই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আওয়াজ তুলি 'জয়বাংলা'।' আমি আবারও বললাম, 'জয়বাংলা'। লক্ষ কণ্ঠের গগন বিদারী 'জয়বাংলা' স্লোগানের ধ্বনি দিগন্তকে মুখরিত করে তুললো। প্রত্যেক খুঁটির গোড়ায় চিরকুট

ইতিমধ্যে খোলা হয়ে গেছে। তাতে নির্দেশ ছিল মঞ্চের 'জয়বাংলা' স্লোগানের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে 'জয়বাংলা' বলার। শুধু পল্টনেই নয়, সভা শেষে ফিরে যাবার সময়ও সকলের মুখে মুখে ধ্বনিত হচ্ছিল 'জয়বাংলা'! প্রত্যয়দীপ্ত এক শব্দ 'জয়বাংলা', বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়ের ঘোষণা 'জয়বাংলা'। সেই থেকে বাংলাদেশের মানুষ 'জয়বাংলা' স্লোগানকে তাদের রণধ্বনি ও বিজয়বার্তা হিসেবে গ্রহণ করে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, 'নিউক্লিয়াস' (স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ)-এর সিদ্ধান্ত অনুসারে সেদিন আওয়ামী লীগের ঐ জনসভাতেই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ও জনসমক্ষে 'জয়বাংলা' স্লোগানের উদ্বোধন করা হয়। তাজউদ্দীন আহমেদের পর একে একে বক্তৃতা দিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলী। সবশেষে সভাপতি হিসেবে বক্তব্য দিলেন মুজিব ভাই। মুজিব ভাইকে বক্তব্য দেওয়ার আহ্বান জানানোর সময় আমি আবারও 'জয়বাংলা' স্লোগান দিলাম। তখন সভা থেকে লক্ষ কণ্ঠে প্রতিধ্বনি হলো—'জয়বাংলা'। লক্ষাধিক বাঙালির বাঁধভাঙ্গা আবেগ আর প্রত্যাশায় এ যেন এক নবজাগরণের ইঙ্গিত।

মুজিব ভাই বক্তৃতা করছেন, সে সুযোগে মঞ্চে বসা খন্দকার মোশতাক আহমেদ আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, 'ভাইডি, কামড়া সাইরে দিসো। তুমি বলেই পারলা, আর কেউ পারতো না! পৃথিবীর ইতিহাসে আর একজন মানুষ রাশিয়া বিপ্লবের স্লোগান হিসেবে দিয়েছিল, 'জমি, রুটি, স্বাধীনতা'। জানো, সে লোকটা ক্যাডা? লেনিন, লেনিন।' মুজিব ভাইয়ের বক্তৃতা শেষ। জনসভার লক্ষাধিক মানুষের কণ্ঠে একই আওয়াজ—'জয়বাংলা'। এ স্লোগান ১৯৭১-এ বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। আর সশস্ত্র যুদ্ধকে করেছিল ত্বরান্বিত। এ স্লোগান কণ্ঠে নিয়ে বাঙালিরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামে। রণাঙ্গনে বুলেটের চেয়েও শক্তিশালী ছিল এ 'জয়বাংলা' ধ্বনি। আন্দোলন-সংগ্রাম এমনকি সশস্ত্র যুদ্ধের কোনো পর্যায়ে কোনোদিন বাঙালিরা 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' কিংবা 'বাংলাদেশ চিরজীবী হোক' বলেনি। সময়ের ব্যবধানে সে 'জয়বাংলা' আজ ষোল-সতের কোটি মানুষের প্রিয় স্লোগান। মুজিব ভাই তাঁর ৭ মার্চের ভাষণ 'জয়বাংলা' স্লোগান দিয়েই শেষ করেছিলেন।

আজকাল দুই-একজন অতি-পাণ্ডিত্য জাহির করতে গিয়ে বলার চেষ্টা করছেন, বঙ্গবন্ধু নাকি তাঁর ৭ মার্চের ভাষণে 'জয়বাংলা' বলার পর 'জয় পাকিস্তান' বলেছিলেন। এরা আসলে পঞ্চম বাহিনীর লোক। এরা পাকিস্তান থাকতে পাকিস্তানিদের দালালি করতো। ২৫ মার্চের আগের দিন পর্যন্ত এরা পাকিস্তানিদের হয়েই কাজ করেছে। শেষে না পেরে এরা 'বাঙালি বন্ধু' হয়ে ওঠে।

## জাতীয় পতাকা

১৯৭১ সালের ২ মার্চ আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়। 'নিউক্লিয়াস'-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা তৈরির মূল দায়িত্বে ছিলেন কাজী আরেফ আহমেদ।

১৯৭০ সালের ৭ জুন, ৬-দফা দিবসে (১৯৬৬ সালের যে-দিনটিতে মনু মিয়া শহীদ হন) ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের পক্ষ থেকে পল্টন ময়দানে শেখ মুজিবকে অভিবাদন দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়। ছাত্রলীগ সিদ্ধান্ত নেয় যে, একটি 'বাহিনী' গঠন করে তাঁকে গার্ড অব অনার' প্রদান করা হবে। 'নিউক্লিয়াস' নেতা কাজী আরেফ আহমেদের ওপর এই অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পড়ে। বাহিনীর নাম দেওয়া হয় 'জয়বাংলা বাহিনী'। বাহিনীর অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয় আ স ম আবদুর রবকে। সিদ্ধান্ত হয়, বঙ্গবন্ধুকে 'ব্যাটালিয়ন ফ্ল্যাগ' হিসেবে একটি পতাকা প্রদান করা হবে। 'নিউক্লিয়াস' থেকেই বাহিনীর জন্য সে ব্যাটালিয়ন ফ্ল্যাগ তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৯৭০ সালের ৬ জুন সন্ধ্যায় ইকবাল হলের ১১৬ নম্বর কক্ষে মার্শাল মনি, শাজাহান সিরাজ ও আ স ম আবদুর রবকে ডেকে কাজী আরেফ 'নিউক্লিয়াস'-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফ্ল্যাগ তৈরির কথা জানান। ব্যাটালিয়ন ফ্ল্যাগই যে পরবর্তীতে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার স্থান অর্জন করবে অর্থাৎ জাতীয় পতাকা হিসেবে গৃহীত হবে, সে কথাও তিনি তাঁদের জানিয়ে দেন। মার্শাল মনি ও আ স ম আবদুর রব বলেন যে, পতাকার জমিন অবশ্যই বটলগ্রিন হতে হবে। আর শাজাহান সিরাজ বলেন, লাল রঙের একটা কিছু পতাকায় থাকতে

হবে। এরপর কাজী আরেফ পতাকার নকশা তৈরি করেন। বটলগ্রিন জমিনের উপর মাঝখানে গোলাকার লাল রঙের সূর্য এঁকে তিনি সবাইকে দেখান। সবাই একমত হন। তারপর আমার কাছ থেকে পতাকার সে নকশার অনুমোদন নেওয়া হয়। সে সময় পাকিস্তান সরকার জনগণকে বিভ্রান্ত করতে 'ইউনাইটেড স্টেটস অফ বেঙ্গল' নামের এক কাল্পনিক রাষ্ট্রের প্রচারণা চালাচ্ছিল। তাই কাজী আরেফ প্রস্তাব করে পাকিস্তানি অপপ্রচারের মোকাবেলায় পতাকার লাল সূর্যের মাঝে পূর্ব বাঙলা বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সোনালী রঙের একটি মানচিত্র দেওয়া উচিত। বাঙালির ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি প্রায়ই এসব আন্দোলনের পেছনে 'ভারতের হাত আছে', 'ভারতীয় এজেন্টদের কার্যকলাপ' কিংবা তাতে 'ভারতীয়দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে' বলে প্রচারণা চালাতো। তাছাড়া ঐ সময়টাতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান ও মিয়ানমারের আরাকানকে যুক্ত করে একটি কল্পিত 'ইউনাইটেড স্টেটস অফ বেঙ্গল'-এর মানচিত্র তৈরি করে পাকিস্তানি প্রশাসনযন্ত্র বিলি করতো। বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে নস্যাৎ করা ও জনগণের মধ্যে এ সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টিই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এ ধরনের প্রচারণা থেকে আমাদের পতাকাকে রক্ষা করার জন্য পতাকার লাল সূর্যের মাঝে বাংলাদেশের সোনালী আঁশ ও পাকা ধানের রঙে একটি মানচিত্র রাখার সিদ্ধান্ত হয়। 'নিউক্লিয়াস'-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই পতাকার এই নকশা করা হয়।

পতাকার কাপড় কিনে তা তৈরি করতে পাঠানো হয় কামরুল আলম খান খসরুকে। খসরু নিউমার্কেটের 'অ্যাপোলো' নামক একটি দোকান থেকে গাঢ় সবুজ ও লাল রঙের লেডি হ্যামিলটন কাপড় কিনে বলাকা বিল্ডিংয়ের তিনতলায় 'পাক ফ্যাশন' থেকে পতাকাটি সেলাই করায়। যে দর্জি পতাকাটা সেলাই করেছিলেন তার নাম আবদুল খালেক এবং তার সহযোগী ছিল মোহাম্মদ নাসিরউল্লাহ। দুজনেই ছিল অবাঙালি।

পতাকা সেলাই করে আনার পর সমস্যা হয় এর মাঝখানের সোনালী মানচিত্রটা আঁকা নিয়ে। কীভাবে কাকে দিয়ে সেই সোনালি রঙের মানচিত্র আঁকা যায়? এ সময় কুমিল্লার শিবনারায়ণ দাসকে

('নিউক্লিয়াস'-এর সদস্য) ইকবাল হলে ডেকে আনা হয়। তিনি জানালেন, মানচিত্রের ওপর শুধু রঙ করতে পারবেন, মানচিত্র আঁকতে পারবেন না। তখন হাসানুল হক ইনু ও সালাউদ্দীন ইউসুফ চলে গেলেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এনামুল হকের আহসানউল্লাহ হলের ৪০৮ নম্বর কক্ষে। তার কাছ থেকে অ্যাটলাস নিয়ে ট্রেসিং পেপারে আঁকা হয় বাংলাদেশের মানচিত্র। সোনালী রঙ কিনে আনা হয়। শিব নারায়ণ দাস ট্রেসিং পেপার থেকে দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে লাল বৃত্তের মাঝে আঁকলো মানচিত্র। মানচিত্রের ওপর দিল সোনালী রঙ। এভাবেই শিব নারায়ণ দাসকে দিয়ে লাল বৃত্তের মধ্যকার পূর্ব বাংলার ম্যাপের ডিজাইন আঁকিয়ে নেওয়া হয়। তৈরি হয় '১৫ ফেব্রুয়ারি বাহিনী'র (পরে 'জয়বাংলা বাহিনী') পতাকা। শিব নারায়ণ দাসের কাজ শেষ হওয়ার মধ্য দিয়েই একটি নতুন দেশের নতুন পতাকার জন্ম হলো।

সে রাতেই পতাকার সার্বিক অনুমোদনের জন্য 'নিউক্লিয়াস'-এর বৈঠক হয় ইকবাল হলের ১১৬ নম্বর কক্ষে। বৈঠকে পতাকাটি অনুমোদিত হয়। পরদিন সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঐ পতাকা ব্যাটালিয়ন ফ্ল্যাগ হিসেবে 'জয়বাংলা বাহিনী'কে প্রদান করেন। বাহিনীর পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করেন আ স ম আবদুর রব।

পতাকা তৈরির পুরো কাজটি হয়েছিল খুবই গোপনে। 'নিউক্লিয়াস'-এর মোট ২২ জন সদস্য এ পতাকা তৈরির কাজে অংশ নেন। তাঁরা হলেন কাজী আরেফ আহমদ, মনিরুল ইসলাম, আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, কামরুল আলম খান খসরু, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, হাসানুল হক ইনু, সালাউদ্দিন ইউসুফ, স্বপন কুমার চৌধুরী ('৭১ সালে শহীদ), মোয়াজ্জেম হোসেন খান মজলিশ, রফিকুল ইসলাম (লিটল কমরেড), আবদুল্লাহ সানি, এনামুল হক, শিব নারায়ণ দাস, মনিরুল হক, নজরুল ইসলাম ('৭১ সালে শহীদ), শেখ শহিদুল ইসলাম, চিশতী শাহ হেলালুর রহমান ('৭১ সালে শহীদ), মইনুল ইসলাম চৌধুরী আজাদ, গোলাম ফারুক, জিনাত আলী, শেখ মোহাম্মদ জাহিদ। বাঙালির আত্মপরিচয়ের প্রতীক সে পতাকা ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র

সংগ্রাম পরিষদ' আহূত লক্ষাধিক জনতার সামনে উত্তোলন করে ডাকসুর ভিপি আ স ম আবদুর রব। এই পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে 'নিউক্লিয়াস'-এর সামরিক-রাজনৈতিক পরিকল্পনায় নতুন মাত্রা যোগ হয়।

৩ মার্চ ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে স্বাধীনতাকামী ছাত্র-জনতার বিশাল সমাবেশে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ 'স্বাধীনতার ইশতেহার' পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে ছাত্র নেতা আ স ম আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন, নূরে আলম সিদ্দিকী এবং শাজাহান সিরাজের শপথবাক্য পাঠ শেষে 'জয়বাংলা বাহিনী'র উপ-প্রধান কামরুল আলম খান খসরু আনুষ্ঠানিকভাবে গান ফায়ারের মাধ্যমে সশস্ত্র যুদ্ধের ঘোষণা দেয়।

১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে পল্টন ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানি পতাকা পুড়িয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। 'জয়বাংলা বাহিনী'র চারটি প্লাটুন কুচকাওয়াজের মাধ্যমে ঐ পতাকাকে অভিবাদন জানায়। পরে মুজিব ভাইয়ের বাসভবনে গিয়ে তাঁর হাতে পতাকা তুলে দেওয়া হয়। তিনি তাঁর বাড়িতে ও গাড়িতে বাংলাদেশের এই পতাকা উত্তোলন করেন। ঐ পতাকা পরবর্তী সময়ে প্রবাসী সরকার অনুমোদন করে। ২৩ মার্চ বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ও গাড়িতে মানচিত্র খচিত ক্ষুদ্র সাইজের পতাকা উত্তোলনের সময়ও 'জয়বাংলা বাহিনী'র উপ-প্রধান কামরুল আলম খান খসরু গান ফায়ার করে।

## স্বাধীনতার ইশতেহার এবং জাতীয় সঙ্গীত

১৯৭১ এর ২ মার্চ স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রথম দিকনির্দেশনামূলক ঘটনা। এর পরের প্রধান কাজটি ছিল 'স্বাধীনতার ইশতেহার' প্রণয়ন এবং 'জাতীয় সঙ্গীত' নির্ধারণ করা। এ জন্য আমাদের হাতে ছিল মাত্র কয়েক ঘন্টা সময়। কারণ পরদিন ৩ মার্চ পল্টনে নির্ধারিত জনসভা। ২ মার্চ রাতেই ইকবাল হলে 'নিউক্লিয়াস' নেতৃবৃন্দের বৈঠক হয়। কী কী বিষয় নিয়ে

ইশতেহার রচিত হবে বৈঠকে নেতৃবৃন্দ তার সিদ্ধান্ত নেয়। ঘোষণায় নিম্নলিখিত বিষয়াদি থাকবে মর্মে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয় :

ক. আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা;

খ. পশ্চিম পাকিস্তানকে, বিশেষ করে সামরিক শাসক এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা;

গ. জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারণ করা;

ঘ. ইতিপূর্বে নক্সা করা পূর্ব বাংলার মানচিত্রসহ প্রদর্শিত/প্রকাশিত পতাকাকে স্থায়ীভাবে 'বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা' হিসেবে সুনির্দিষ্ট করা;

ঙ. বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে ঘোষণা করা ও মর্যাদা দেওয়া;

চ. স্কুল-কলেজসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, ব্যবসাকেন্দ্র ও শিল্পকারখানায় 'নিউক্লিয়াস'/'স্বাধীন বাংলাবিপ্লবী পরিষদ'/'বিএলএফ'-এর কমিটি বা 'সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা;

ছ. 'অসহযোগ আন্দোলন'কে পুরোপুরি সফল করার ব্যাপারে সক্রিয় হওয়া। সমান্তরাল প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে ছাত্র-যুব ব্রিগেড, নারী ব্রিগেড, শ্রমিক ব্রিগেড ও কৃষক ব্রিগেড গঠন করা।

জ. 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'/'বিএলএফ'/'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্যদের (ইতিমধ্যে যাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল সাত হাজারে) বিভিন্ন স্কোয়াডে বিভক্ত করে প্রাথমিক চিকিৎসা, বোমা তৈরি, অস্ত্র সংগ্রহ এবং প্রাথমিকভাবে অস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া;

ঝ. স্থানীয় পুলিশ, আনসার বাহিনী, ইউওটিসি, প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি সেনা ও ইপিআর সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা;

ঞ. পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর যে কোনো হামলার মুখে শহর ছেড়ে গ্রাম এলাকায় আশ্রয় নেওয়া এবং স্বাধীনতার পক্ষে সম্ভব সকল কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া;

ট. জনগণকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করার জন্য 'জয়বাংলা' সহ কী-কী স্লোগান দেওয়া হবে সে সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া;

ঠ. বঙ্গবন্ধুকে নেতা হিসেবে মেনে নিয়ে স্বাধীনতার পক্ষে সকল কাজ সম্পন্ন করা।

'স্বাধীনতার ইশতেহার' প্রণয়নের কাজটি সম্পাদন করার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়। কাজ শুরু হয় তোফায়েল আহমেদের রুমে। যে কোনো সময় যে কোনো কাজে প্রয়োজন হলে আমাদের দুজনকে যাতে পাওয়া যায়, সে জন্য রাজ্জাক ও কাজী আরেফ পাশের রুমে অপেক্ষমান থাকবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। আমি তোফায়েল আহমেদ ও ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি আবদুর রউফকে নিয়ে কাজ শুরু করি। তোফায়েল কিছুক্ষণ সঙ্গে থেকে 'সিরাজ ভাই যা বলেন তাই হবে' বলে আরেকটি জরুরি কাজে চলে যায়।

এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার বিভিন্ন কলেজে ছাত্রলীগের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত হিসেবে রবীন্দ্র, নজরুল, ডিএল রায় প্রমুখের লেখা বেশক'টি দেশাত্মবোধক গান গাওয়া হতো। সেগুলোর মধ্য থেকে তিনটিকে আমরা প্রাথমিক বিবেচনায় নিলাম : ববীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা...', ডিএল রায়ের 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা...' এবং নজরুলের 'চল্ চল্ চল্, উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল'।

প্রায় এক ঘন্টা ধরে জাতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হলো। নজরুলের 'চল্ চল্ চল্' তারুণ্যদীপ্ত ও অনুপ্রেরণাদায়ক হলেও গানটিকে জাতীয় সঙ্গীতের পর্যায়ে ফেলা যায় না বলে প্রথমেই বাদ দেওয়া হলো। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা...' গানটির চেয়ে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' বেশি আবেদনময়, সর্বজনগ্রাহ্য বলে আমার মনে হলো। আমি বললাম, 'আমার সোনার বাংলা'ই হবে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। রাজ্জাক ও কাজী আরেফ পাশের কক্ষে বসে পরের দিন অর্থাৎ ৩ মার্চের পল্টনের জনসভায় জনসমাগমের জন্য ঢাকা শহরে 'নিউক্লিয়াস' ও 'বিএলএফ' সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন। আমি দ্রুত বেরিয়ে এসে 'আমার সোনার বাংলা'কে জাতীয় সঙ্গীত

হিসেবে তাদের বিবেচনার জন্য উত্থাপন করি। 'নিউক্লিয়াস'-এর তিনজনই আমরা এ ব্যাপারে একমত হই।

এরপর আমি ও আবদুর রউফ প্রায় তিন ঘন্টা সময় নিয়ে ইশতেহারের একটি খসড়া প্রস্তুত করি। এই তিন ঘন্টার মধ্যে আমি রাজ্জাক ও আরেফকে দু'বার ডেকে পাঠাই এবং কয়েকটি বিষয়ে তাদের মতামত নিই। অনেক কাটাছেঁড়া, গুরুত্ব অনুসারে শব্দ ও বাক্যের পরিবর্তন ইত্যাদির পর খসড়াটি চূড়ান্ত করা হয়। অতঃপর আমি পাশের রুমে যাই ও সেখানে বসে 'নিউক্লিয়াস'-এর বৈঠকে এ বিষয়ে সর্বশেষ অনুমোদন নিই।

রাতের মধ্যেই ইশতেহারটি প্রচারপত্র আকারে ছাপানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই দায়িত্বে ছিল রায়হান ফিরদাউস মধু। ভোর হওয়ার আগেই পাঁচ হাজার কপি ছাপা হয়ে আসে। প্রচারপত্রটির শিরোনাম ছিল 'স্বাধীনতার ইশতেহার : জয়বাংলা'। পরদিন পল্টন ময়দানে বিকেল তিনটার ছাত্র-জনসভায় ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজকে 'স্বাধীনতার ইশতেহার' ঘোষণা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেই বিকেলে পল্টনে ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'-এর জনসভায় সে ইশতেহারটি পাঠ করলো। তার পড়া শেষে মুজিব ভাই আকস্মিকভাবে পল্টনে উপস্থিত হলেন। এটি ছিল তাঁর অনির্ধারিত উপস্থিতি। তাই তাঁর উপস্থিতিতে শাজাহান সিরাজ ইশতেহারটি আবার পড়ে শোনায়। স্বাধীনতার ইশতেহারটি ছিল নিম্নরূপ :

**স্বাধীনতার ইশতেহার : জয়বাংলা**

* স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হলো।

* গত তেইশ বছরের শোষণ, কুশাসন ও নির্যাতন একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে যে, সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে গোলামে পরিণত করার জন্যে বিদেশি পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র তা থেকে বাঙালির মুক্তির একমাত্র পথ স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকা। গত নির্বাচনের

গণরায়কে বানচাল করে শেষবারের মতো বিদেশী পশ্চিমা শোষকেরা সে কথার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে প্রমাণ করেছে।

৫৪ হাজার ৫ শত ৬ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার সাড়ে ৭ কোটি মানুষের জন্যে আবাসিক ভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ রাষ্ট্রের নাম 'বাংলাদেশ'। স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে :

(১) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালি জাতি সৃষ্টি ও বাঙালির ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে অঞ্চলে-অঞ্চলে ও ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসনকল্পে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েম করতে হবে।

(৩) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে।

**বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্যে নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে :**

(ক) বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করতে হবে।

(খ) সকল শ্রেণির জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা ও তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

(গ) শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সুসংগঠিত করে গ্রামে গ্রামে ও এলাকায় এলাকায় 'মুক্তিবাহিনী' গঠন করতে হবে।

(ঘ) হিন্দু-মুসলমান ও বাঙালি-অবাঙালি সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে।

(ঙ) স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং লুটতরাজসহ সকল প্রকার সমাজবিরোধী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

**স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা নিম্নরূপ হবে :**

(অ) বর্তমান সরকারকে বিদেশী উপনিবেশবাদী শোষক সরকার গণ্য করে বিদেশী সরকারের ঘোষিত সকল আইনকে বেআইনি বিবেচনা করতে হবে।

(আ) তথাকথিত পাকিস্তানের স্বার্থের তল্পিবাহী পশ্চিম পাকিস্তানি অবাঙালি মিলিটারিকে বিদেশি ও হানাদার শত্রু সৈন্য হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং হামলাকারী শত্রু সৈন্যকে খতম করতে হবে।

(ই) বর্তমান বিদেশী উপনিবেশবাদী শোষক সরকারকে সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

(ঈ) স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের ওপর আক্রমণরত যে-কোনো শক্তিকে প্রতিরোধ, প্রতিহত, পাল্টা আক্রমণ ও খতম করার জন্যে সকল প্রকার সশস্ত্র প্রস্তুতি নিতে হবে।

(উ) বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সকল প্রকার সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

(ঊ) স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের 'জাতীয় সঙ্গীত' হিসেবে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি...' সঙ্গীতটি ব্যবহৃত হবে।

(ঋ) শোষক রাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানের সকল দ্রব্য বর্জন করতে হবে এবং সর্বাত্মক 'অসহযোগ আন্দোলন' গড়ে তুলতে হবে।

(এ) উপনিবেশবাদী পাকিস্তানি পতাকা পুড়িয়ে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহার করতে হবে।

(ঐ) স্বাধীনতা সংগ্রামেরত বীর সেনানীদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের **সর্বাধিনায়ক**।

স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন আন্দোলনের এ পর্যায়ে **নিম্নলিখিত** জয়ধ্বনি ব্যবহৃত হবে।

'জয়বাংলা'—বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান হিসেবে ব্যবহৃত হবে

* স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ'—দীর্ঘজীবী হউক।
* স্বাধীন করো স্বাধীন করো—বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

* স্বাধীন বাংলার মহান নেতা—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।
* গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়ো—মুক্তি বাহিনী গঠন করো।
* বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো—বাংলাদেশ স্বাধীন করো।
* মুক্তি যদি পেতে চাও—বাঙালিরা এক হও।

বাংলা ও বাঙালির জয় হোক।

জয়বাংলা।

## শ্রমিক লীগ গড়ে তোলা

স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে স্বাধীনতার সংগ্রামে উন্নীত করার পর্যায়ে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার গুরুত্ব বেশি করে অনুভূত হতে থাকে। আওয়ামী লীগের অনুমতির অপেক্ষা না করেই আমাদের উদ্যোগে ঢাকার আদমজি, ডেমরা, পোস্তগোলা, তেজগাঁও, টঙ্গী, চট্টগ্রাম বন্দর, সীতাকুণ্ড ও নরসিংদীতে শ্রমিক সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে।

ঈশ্বরদীতে শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠে আকস্মিকভাবে ও ত্বরিতগতিতে। কমরেড সিরাজ ভাই নামে কমিউনিস্ট আন্দোলনের পোড়খাওয়া একজন শ্রমিক নেতা, যিনি সম্ভবত ছিলেন একজন ট্রেন ড্রাইভার, ঐ এলাকা ও আশপাশের অঞ্চলে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেন। নীতিগতভাবে আমাদের দেশের কমিউনিস্টরা ৬-দফা ভিত্তিক আমাদের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন সমর্থন করেনি। ঈশ্বরদীর সিরাজ ভাই ছিলেন আমার সহপাঠী নজরুল ইসলামের (বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী) বড় ভাই। সেই সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে আমি সিরাজ ভাইকে আমাদের পক্ষে কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করি। সাহসী, দক্ষ ও নিষ্ঠাবান এই মানুষটি তাঁর ২৬ বছর বয়স থেকে কমিউনিস্টদের নিয়ন্ত্রণাধীন শ্রমিক আন্দোলন করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তা কাজে লাগিয়ে গোটা উত্তরবঙ্গে রেলওয়ে এবং অন্যান্য শ্রমিক এলাকায় আমাদের সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেন।

এ সব সাংগঠনিক উদ্যোগ কাজে লাগিয়ে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয় 'নিউক্লিয়াস'-এ। মূল দায়িত্বে ছিলাম আমি। মান্নান ভাইকে এ কাজে পুরোপুরিভাবে পাই। ঢাকা শহরে চাকুরিজীবী কর্মচারীদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে অন্যতম ভূমিকা

পালন করেন পূর্ব পাকিস্তান ওয়াপদার আবদুল মান্নান (পরবর্তীকালে বিএলএফ-এর দিনাজপুরের পাঙ্গা বেইজ ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন এই মান্নান)।

তবে আমাদের এই শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ালো আওয়ামী লীগ। মুজিব ভাই ১৯৬৬-তে জেলে যাবার আগে আওয়ামী লীগকে ব্রিটিশ লেবার পার্টির মতো করে গড়ে তোলার যে ধারণা আমি তাঁকে দিয়েছিলাম তারই অংশ হিসেবে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার দিকে আমি মনোযোগ দিই। ছাত্র-যুবকদের পর স্বাধীনতার লড়াইয়ের জন্য জনগণের যে অংশটিকে সংগঠিত করা অতি আবশ্যক বলে আমার মনে হয়েছিল তা হলো শ্রমিক সমাজ। স্বাধীনতার আগে এদেশে শ্রমিকের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। সাত-আট লাখের মতো হতে পারে। সিরাজগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জের তাঁতি এবং সিলেটের চা বাগান শ্রমিকদের নিয়ে সংখ্যাটি বড়জোর ১০ লাখের কাছাকাছি ছিল। জনসংখ্যার তুলনায় এই সংখ্যা খুব বেশি না হলেও, এরা ছিল সংগঠিত শক্তি। স্বাধীনতার সংগ্রাম এগিয়ে নিতে এই সংখ্যা এক বিরাট শক্তি। কৃষকদের ব্যাপারে আমরা অবশ্য খুব একটা মনোযোগ দিতে পারিনি। এক্ষেত্রে ছিটেফোঁটা কিছু কাজ হলেও, সাধারণভাবে সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা কৃষকদেরকে সংগঠিত করার কোনো উপায় তখন পর্যন্ত আমরা বের করতে পারিনি।

শ্রমিকদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার বিষয়টি মুজিব ভাইকে বলার একদিনের মধ্যেই তিনি অনুমতি দিলেন। এ কথাও বললেন, 'তুই নিজে উদ্যোগ নিয়ে এ সংগঠন করবি।' তাঁর এ ধরনের নির্দেশের পেছনে আমার সাংগঠনিক দক্ষতা ছাড়া হয়তো বা ব্রিটিশ লেবার পার্টির ধরনে সংগঠন গড়ে তোলার জন্য জেলে যাবার আগে আমার দেওয়া প্রস্তাবটি তাঁর মনে ছিল। তবে এ বিষয়ে আমি কোনোদিন তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

এক রকম গোপনীয়তার সঙ্গে এবং সমাজবাদী দলের মান্নান ভাইকে ভিড়িয়ে আমি শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলতে শুরু করি। 'নিউক্লিয়াস'-এর পক্ষ থেকে মেসবাহ আমার প্রধান সঙ্গী হলো। এছাড়া আরেকটি সঙ্গী ছিল; তা আমার হোন্ডা মোটর সাইকেলটি।

অনেকটা গোপনেই আমি, মান্নান ভাই, ওয়াপদার মান্নান, দোকান কর্মচারী নেতা জহির এই শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিই। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, সম্মেলন করেই এই শ্রমিক সংগঠন গঠন করা হবে। যতটা সম্ভব মুজিব ভাইকে বিষয়টা জানালাম (তাঁকে খুঁটিনাটি সবকিছু জানানো হতো না)। সম্মতি তো আগেই পেয়েছি। তাঁকে এ সম্মেলন উদ্বোধন করতে হবে এমন ধারণাও তাঁকে দিলাম। তিনি অনেকটা সম্মত বলেই মনে হলো।

এদিকে আওয়ামী লীগে জানাজানি হয়ে গেল, শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলা হচ্ছে। গুঞ্জন থেকে পরে প্রকাশ্যে কথাবার্তা শুরু হলো। মুজিব ভাই সম্মেলন উদ্বোধন করবেন, সে জন্য তাঁর বক্তৃতা লেখার ভার আমার ওপর পড়লো। এটিও জানাজানি হয়ে গেল। পুরো আওয়ামী লীগ শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার বিরুদ্ধে চলে গেল। শ্রমিক সংগঠন গড়ার উদ্যোক্তা ও সমর্থক ছাত্রলীগ নেতারা একদিকে অবস্থান নিলো। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী বেশ কয়েকজন নেতা এর বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাতে এবং নিজেদের মধ্যে অনির্ধারিত ও অঘোষিত মিটিং করতে শুরু করলেন। তাঁদের তরফে কে এম ওবায়েদুর রহমানকে প্রতিনিধি করে মুজিব ভাইয়ের কাছে পাঠানো হলো। ইতিমধ্যে শ্রমিক সম্মেলনে মুজিব ভাইয়ের উদ্বোধনী বক্তৃতার জন্য তাঁর কাছ থেকে পয়েন্টস নিয়ে আমার ভাষণ লেখা প্রায় সমাপ্তির পথে। একদিন আমি লেখা বক্তৃতাটি মুজিব ভাইকে শোনাবার জন্য তাঁর বাসায় গেলাম। গিয়ে দেখি ওবায়েদুর রহমান সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত। মুজিব ভাই পাঁচ মিনিটের মধ্যে নিচে নামলেন। দুজনকে একসঙ্গে দেখে হেসে বললেন, 'কী, হঠাৎ করে প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারি একসঙ্গে?'

মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে আমার এই দেখা করাটা পূর্বনির্ধারিত ছিল। কিন্তু আমি বিষয়টা তোলার আগেই ওবায়েদুর রহমান বললেন, 'মুজিব ভাই, আওয়ামী লীগ থাকতে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার কোনো প্রয়োজন নাই। আওয়ামী লীগের প্রায় সকলেরই এ ব্যাপারে একই ধরনের মতামত। এভাবে যুবকরা, শ্রমিকরা, কৃষকরা, নারীরা আলাদা আলাদা সংগঠন গড়ে তুললে আওয়ামী লীগ রাখার আর দরকার কী?' শুনে তো মাথায় একেবারে বাজ পড়ার মতো অবস্থা! আওয়ামী লীগের

নেতারা যে শ্রমিক সংগঠন গড়ার বিষয়টি পছন্দ করছেন না, তা জানতাম। কিন্তু ব্যাপারটা এভাবে প্রতিরোধের পর্যায়ে এসে যাবে, তা ভাবতে পারিনি।

মুজিব ভাই বললেন, 'ওবায়েদ, আমি তো এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছি। আমি উদ্বোধন করবো এটিও বলেছি। সে জন্য উদ্বোধনী বক্তৃতা তৈরি করতে বলেছি সিরাজকে। আজকে সে বক্তৃতা ফাইনাল করার কথা।' একেবারে দুই বিপরীতমুখী সিদ্ধান্তের কারণে মুজিব ভাই কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। তিনি আমাদের দুজনকেই বললেন, 'আমাকে দু-তিন দিন সময় দে, আমি জানাবো।' মুজিব ভাইয়ের এ ধরনের কথার অর্থ আমি বুঝি। তবুও চিন্তায় পড়ে গেলাম। আমি 'নিউক্লিয়াস'-এ জানালাম বিষয়টা। ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গেও বসলাম। ছাত্রলীগ এবং শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে মুজিব ভাইয়ের বৈঠকের ব্যবস্থা করলাম। ছাত্রলীগ ও শ্রমিক নেতারা জোরালোভাবে মুজিব ভাইয়ের কাছে শ্রমিক সংগঠন গড়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরলেন। যে একটি মাত্র যুক্তিতে মুজিব ভাই রাজি হলেন, তা হলো, ভবিষ্যতে বড় কোনো আন্দোলনে ছাত্র-যুবকদের পাশাপাশি শ্রমিকদের অংশগ্রহণ করাতে হলে তাদের নিজস্ব সংগঠনের দরকার হবে। অদ্ভুতভাবে মুজিব ভাই সাড়া দিলেন এবং ইংরেজিতে বললেন, 'গো অ্যাহেড' (এগিয়ে যাও)। এরপর থেকে আওয়ামী লীগের বাধা খুব বেশি কাজে আসেনি। সারাদেশের সব সেক্টর থেকে প্রায় দুই হাজার প্রতিনিধি নিয়ে সম্মেলন হলো ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে। সংগঠনের নাম দেওয়া হলো 'জাতীয় শ্রমিক লীগ'। সভাপতি নূরুল হক মিয়া, সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান (সমাজবাদী)। আমি কার্যনির্বাহী পরিষদের ১ নং সদস্য। আওয়ামী লীগের তরফে বাধা কমে যাওয়ার আরও একটি কারণ ছিল আমাদের মধ্যে এক ধরনের বোঝাপড়া। মুজিব ভাই সম্মেলন উদ্বোধন করলেন না, গেলেনও না। তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতাটি আমাকেই পড়তে হলো। এভাবে গড়ে উঠলো শ্রমিক লীগ। সাড়া পড়ে গেল শ্রমিক এলাকায়। শ্রমিকদের মাঝে। সারাদেশে।

এতদিনকার শ্রমিক নেতাদের কাছেও এটি অসম্ভব একটা ব্যাপার বলে মনে হলো। আমি কিছুটা গোপনভাবে সমাজবাদী দলের মূল নেতাদের সঙ্গে, রেলওয়ে শ্রমিকদের নেতা মাহবুবুল হক ও চা বাগান

শ্রমিকদের নেতা কাজী জাফরের সঙ্গে আলোচনা করলাম। তাঁদের মধ্যে কাজী জাফর বললেন, 'সিরাজ, তুমি তো আমাদের কোমর ভেঙে দিলা।' মাহবুবুল হক ভাইয়ের সহানুভূতি পেলাম। তোয়াহা ভাইয়ের সঙ্গেও দেখা করলাম। ছাত্র-যুবকদের ও শ্রমিক সমাজের এ সংঘশক্তিকে কতখানি কাজে লাগানো সম্ভব তা প্রমাণের জন্য হরতাল ডাকা হলো। সমান্তরালভাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পক্ষেও একটি ঘোষণায় একই দিনে হরতাল আহবান করা হলো। মুজিব ভাইসহ রাজনৈতিক নেতারা করাচি থেকে এ হরতাল আহ্বান করেছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানসহ সারা দেশে সেদিন সর্বাত্মক হরতাল হলো। যে প্রয়োজনে এ হরতালের আহ্বান তাতে আমরা শত ভাগ সফল হই।

'বিএলএফ'-এর সদস্য সংখ্যা তখন ছয় হাজারের বেশি। তারা সংঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল। সামরিক শাসন কিছুটা শিথিল করা হলে ঘরোয়া রাজনীতি শুরু হলো। সে সুযোগে আমরা শ্রমিক লীগকে বড় একটি সংগঠনে পরিণত করতে পারলাম। আমার প্রধান কাজ ছিল শ্রমিক লীগের গণসংগঠনের অভ্যন্তরে 'নিউক্লিয়াস' এবং 'নিউক্লিয়াস'-এর সমর্থক সংগঠন গড়ে তোলা। এটা ছিল আমার জন্য এক বিরাট সুযোগ। আর আমি তা সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারলাম। এ পর্যায়ে যেসব শ্রমিক নেতা 'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্য বা সমর্থক হিসেবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সামনের কাতারে চলে আসেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবদুল মান্নান, রুহুল আমিন ভুঁইয়া প্রমুখ। এ ব্যাপারে মেসবাহর ভূমিকাও ছিল অসাধারণ। বলা যায় মেজবাহ শ্রমিক লীগে আমার প্রতিনিধিত্ব করতো।

ছাত্রলীগের অভ্যন্তরেও এ সময় 'নিউক্লিয়াস' ও 'বিএলএফ'-এর কাজ অনেক দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। ১৯৭০-এর শেষভাগে ইকবাল হলের মাঠে ছাত্রলীগের সম্মেলন হলো। তাতে নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাজাহান সিরাজ যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়। মুজিব ভাই এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ইতিমধ্যে আমরা বুঝতে পারলাম, গণআন্দোলন দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। গণআন্দোলনকে কাজে লাগিয়ে মিটিং-মিছিলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এবং সর্বস্তরে স্বাধীনতার কথা হয়তো বলা যায়, কিন্তু স্বাধীনতা

অর্জনের কৌশলগত দিকটি বের করে নিয়ে আসাও খুবই জরুরি। শুধু গণআন্দোলন দিয়ে তা হবে না।

এ সময়ে স্বাধীনতার পক্ষে একক স্লোগান 'জয়বাংলা'কে সামনে নিয়ে আসা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। একটি স্বাধীন দেশের জন্য জাতীয় পতাকা প্রয়োজন। তাও আমরা তৈরি করে ফেলি। 'জয়বাংলা' স্লোগান ও স্বাধীন বাংলার পতাকা তৈরির পেছনে উদ্দেশ্য ছিল জনগণের কাছে স্বাধীনতার ধারণাকে প্রাথমিকভাবে তুলে ধরা।

## ১৯৭০ এর নির্বাচন ও তার পর

সামরিক শাসনের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা এলো। মওলানা ভাসানী ও তাঁর সমর্থক ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের চীনপন্থী অংশ নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিরোধিতা করে। সিরাজ সিকদারের পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টিও নির্বাচনের বিরোধিতা করলো। আমরা নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ম্যান্ডেট নেওয়ার সুযোগে স্বাধীনতার পক্ষে জনসমর্থনকে কাজে লাগাবার কৌশল গ্রহণ করলাম। সে সময়ে আওয়ামী লীগে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন যথেষ্ট প্রার্থী ছিল না। আমি মুজিব ভাইকে বললাম চলমান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসা প্রায় ২০০ জনকে মনোনয়ন দিতে। তিনি তাই করলেন। এর ফলে প্রার্থী বাছাইয়ের সংকট থেকে আওয়ামী লীগ কিছুটা মুক্ত হলো—একথা তিনি আমাকে বলেছিলেন। আমরা এ দুইশত প্রার্থীকে জয়ী করার জন্য এক কঠিন কর্মসূচি হাতে নিলাম। প্রতি প্রার্থীর নির্বাচনী এলাকায় তিন থেকে পাঁচজন করে বিএলএফ কর্মীকে গণসংযোগ ও প্রচারণার জন্য নিয়োজিত করলাম। এভাবে নিউক্লিয়াস-এর প্রায় দেড় হাজার সদস্য মাঠ পর্যায়ে এ কাজের সঙ্গে যুক্ত হলো। এটি ছিল একটি সূক্ষ্ম ধরনের কাজ যার সম্পর্কে আওয়ামী লীগ এমনকি মুজিব ভাইও জানতেন না। এই দুরূহ কাজটি নির্ভুলভাবে সম্পাদন করার দায়িত্ব ছিল মার্শাল মনির ওপর এবং তার সহযোগী ছিল আ ফ ম মাহবুবুল হক। আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ ও নূরে আলম সিদ্দিকীসহ ছাত্রনেতারা সবাই প্রার্থীদের পক্ষে দেশব্যাপী জনসভা করলো।

সে সময়ে ১৯৭০-এর ১২ নভেম্বর ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের যে ঘটনাটি ঘটেছিল, তাতে দক্ষিণবঙ্গের প্রচার কাজে মুজিব ভাই ১৫ দিন ধরে ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। আমিনুল হক বাদশা তখন তাঁর প্রেস সেক্রেটারি। তাঁকে দিয়ে টেলিগ্রাম করালাম যেন তিনি ফিরে আসেন। কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। তারপর আমার নাম দিয়ে টেলিগ্রাম করা হলো। তিনি সফর কিছুটা সংক্ষিপ্ত করে ঢাকায় ফিরলেন।

ইতিমধ্যে ঢাকায় আমরা নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে ছাত্র-শ্রমিক মিছিল করতে লাগলাম। কারণ গুজব উঠেছিল জলোচ্ছ্বাসের কারণে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা কোনো অবস্থাতেই নির্বাচন পেছানোর পক্ষে ছিলাম না। '৬-দফা ও ১১-দফা, না হলে ১-দফা' (স্বাধীনতা)—এ আওয়াজ সারা দেশে গ্রাম-গঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। একে অন্য কোনো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার সুযোগ যাতে কেউ না পায় তার জন্য আমরা নির্বাচনের পক্ষে একনিষ্ঠভাবে প্রচারণা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

ঢাকায় ফিরে এসেই মুজিব ভাই তৎকালীন শাহবাগ হোটেলে সংবাদ সম্মেলন ডাকলেন। বিকাল ৫টায় সাংবাদিক সম্মেলনে যাওয়ার আগে বেশ কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে তাঁর একান্ত কথাবার্তা হলো। নির্বাচন স্থগিত বা পিছিয়ে দেওয়ার পক্ষে কোনো কথাই যেন না ওঠে সে বিষয়ে তিনি একমত হলেন।

এত বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোনো সাহায্য-সহযোগিতা এলো না, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের এ বিমাতাসুলভ মনোভাবের বিষয়টি তিনি তুলে ধরবেন, এটাই মোটামুটি স্থির হলো। সাংবাদিকদের জন্য এ সম্পর্কে একটা লিখিত বক্তব্য তৈরি হলো। দেশীয় সাংবাদিকদের তুলনায় বিদেশী সাংবাদিকের সংখ্যা ছিল প্রায় দ্বিগুণ। লিখিত বক্তব্য পাঠের পর প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি আবারও সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের জবাবে পাকিস্তান সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণ ও বাঙালিদের প্রতি অবহেলার বিষয়টি তুলে ধরলেন।

সংবাদ সম্মেলনটি প্রায় এক ঘন্টার মতো চলেছিল। একেবারে শেষ মুহূর্তে লন্ডনের *গার্ডিয়ান* পত্রিকার সাংবাদিক মুজিব ভাইকে প্রশ্ন

করে বসলেন, 'In that case will you declare independence?' (যদি তাই হয়, আপনি কি স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন?) দু-তিন সেকেন্ডের জন্য আমি বিহ্বল হয়ে গেলাম। কী বলবেন নেতা? স্বাধীনতার কথা বলা যাবে না, আবার সে সম্ভাবনাকে একেবারে অস্বীকার করাও যাবে না। আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি উত্তর দিলেন, 'Not yet'. (এক্ষুণি না)। এ কথার অর্থ, এখন নয়, 'স্বাধীনতা'র প্রয়োজন যখন হবে তখন। তাঁর এ উত্তর ছিল একজন পরিপক্ব রাজনীতিবিদের, যা ছিল মুজিব ভাইয়ের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। তাঁর সে উত্তরে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই উচ্ছ্বসিত হয়েছিলাম।

নির্বাচনের কাজকে আরও গতিসম্পন্ন করে জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার আবেগ সৃষ্টি করতে পারবো—এ চিন্তার ভিত্তিতে নির্বাচনকে কাজে লাগানোর জন্য প্রার্থীদের অঞ্চলে দায়িত্ব দেওয়া বিএলএফ সদস্যদের আমরা নির্দেশ পাঠালাম। কাজও হলো সেভাবে। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল, জাতীয় পরিষদের দুটি আসন (ময়মনসিংয়ের নান্দাইল ও পার্বত্য চট্টগ্রাম) ছাড়া বাকি সবগুলোতে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা জয়ী হয়েছে। প্রাদেশিক পরিষদের নয়টি ছাড়া সবকটি আসন পেয়েছে আওয়ামী লীগ। মুজিব ভাইও এ ধরনের ফলাফল আশা করেননি। যদিও এরকম একটি ভূমিধস বিজয়ের সম্ভাবনার কথা আমি তাঁকে নির্বাচনের দিন কয়েক আগেই বলেছিলাম। নির্বাচনী এলাকা থেকে বিএলএফ কর্মীদের পাঠানো রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে আমি ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হই। ইতিপূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার যেসব আলোচনা হয়েছে তাতে মুজিব ভাই ১৫০টি সিটের কথাও ভাবতে পারেননি। আমি তাঁকে ছাত্রলীগের মাধ্যমে গণসংযোগের কথা বলেছিলাম, ১৬৭টি সিট পাবেন তাও বলেছিলাম। ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় বিলম্বে নির্বাচন হয়। সেখানেও সবক'টি আসনেই আওয়ামী লীগ জয়ী হয়।

নির্বাচনের পর জনমত যাতে কোনোভাবেই ভিন্নদিকে চালিত না হয় এবং নির্বাচিত সদস্যরা ভিন্নমত পোষণ করতে না পারেন, সেজন্য বিজয়ী প্রার্থীদের শপথ নেওয়ার কর্মসূচি হিসেবে রেসকোর্স ময়দানে মুজিব ভাইকে জনসভা করার কথা বলতেই তিনি রাজি হয়ে গেলেন। ৩ জানুয়ারি, ১৯৭১ লক্ষ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে সেই জনসভা

হলো। জনসভাতেই শপথ অনুষ্ঠান হলো। এ জনসভায় জনসমাগমের দায়িত্ব ছিল 'বিএলএফ' সদস্যদের। এ সভাতেই তিনি 'জয়বাংলা' ও 'জয় পাকিস্তান'—দুটি স্লোগানই দেন। এটি ছিল তাঁর রাজনৈতিক রণকৌশলের অংশ। শত্রুকে বিভ্রান্ত করার নানা উপায়ের একটি। তবে যাঁরা তাঁর ৭ মার্চের বক্তৃতার সঙ্গে এটিকে মিলিয়ে ফেলেন তাঁদের মতলব ভিন্ন।

নির্বাচনে বিরাট সাফল্যের পর আমরা বুঝলাম সামনে সশস্ত্র লড়াই অনিবার্য। সে যুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিশেষ করে প্রতিবেশী ভারতের সমর্থন প্রয়োজন। অথচ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান প্রায় শূন্য। এ অবস্থায় আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে, 'নিউক্লিয়াস' ও 'বিএলএফ'-এর পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মুজিব ভাইকে বিস্তারিত জানানো প্রয়োজন। একদিন তাঁকে বললাম, 'আপনার সঙ্গে আমাদের জরুরি কথা আছে।' আমার মনে হলো আমার কথার গুরুত্ব তিনি বুঝলেন। বললেন, 'আগামীকাল ভোর পাঁচটায় আসবি।'

আমি ও রাজ্জাক ভোর পাঁচটায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে তাঁর বাসায় গেলাম। নিচের তলার বেডরুমে তিনি ও ভাবী শুয়ে আছেন। মুজিব ভাই জেগে। বললেন, 'এদিকে আয়।' আমি তাঁর পালঙ্কের এক পাশে বসলাম। রাজ্জাক নিচে মোড়ার ওপরে। ভাবী অন্যদিকে ফিরে ঘুমিয়ে। মুজিব ভাইয়ের হাতটা বাড়ানো ছিল। আমি ও রাজ্জাক দুজনে তাঁর হাত ধরলাম। বললাম, 'আমরা অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছি।' দশ-পনের সেকেন্ড পর বললেন, 'আমাকে কী করতে হবে, বল?' আমরা বললাম, 'বিদেশী সাহায্য, বিশেষ করে ভারতের সাহায্য প্রয়োজন।' আধা মিনিট সময় নিয়ে তিনি বললেন, 'যা, হবে। আমি তো লন্ডন যাচ্ছি, ব্যবস্থা হবে।'

বঙ্গবন্ধুর লন্ডন অবস্থানকালে মিরপুর-মোহাম্মদপুরে বাঙালি-অবাঙালি রায়ট শুরু হয়। ঢাকার অন্য কোথাও যেন এ ধরনের ঘটনা কেউ ঘটাতে না পারে তার জন্য আমরা আমাদের ছাত্র ও শ্রমিক ব্রিগেডকে সতর্ক করে দিলাম। আমি নিজে মোহাম্মদপুর-মিরপুর যেতে চাইলাম। পরিস্থিতি দেখে আর গেলাম না। তাজউদ্দীন ভাইকে বললাম, আমাদের পক্ষে এ পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব না। মুজিব ভাইকে দরকার। পরের দিন মুজিব ভাইয়ের বাসার টেলিফোন থেকে

তাজউদ্দীন ভাই তাঁকে ফোন করলেন, ঢাকার পরিস্থিতির কথা জানালেন। লন্ডন সফর সংক্ষিপ্ত করে ফিরে আসতে বললেন তাঁকে। ফোন করার সময় আমি তাজউদ্দীন ভাইকে বললাম, আমি যে পাশে আছি, সে কথা মুজিব ভাইকে জানাতে। তাজউদ্দীন ভাই তাই করলেন।

তিন-চারদিনের মধ্যে সফর সংক্ষিপ্ত করে মুজিব ভাই ঢাকা ফিরে এলেন। কখন আসবেন আমরা জানতাম। তৎকালীন তেজগাঁও এয়ারপোর্টে বিরাট মিছিল নিয়ে গিয়ে আমরা তাঁকে স্বাগত জানালাম। বিমানবন্দর থেকে ফেরার পথে তাঁর সঙ্গে একই গাড়িতে তাজউদ্দীন ভাই ও আমি ছিলাম। বাড়ি ফিরে তাজউদ্দীন ভাইয়ের সঙ্গে সামান্য কী যেন বললেন, আমি শুনিনি। এরপর তাজউদ্দিন ভাই চলে গেলেন।

রাজ্জাককে আমি আগে থেকেই মুজিব ভাইয়ের বাসায় থাকতে বলেছিলাম। তখন তাঁর দু'পাশে আমি ও রাজ্জাক। আমাদের ঘাড়ে হাত দিয়ে তিনি বললেন, 'সব ঠিক করা হয়েছে। ভারত অস্ত্র দেবে দেশের মধ্যে ট্রেনিংয়ের জন্য। পরে ভারতেও ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা হবে। বর্ডারের দুই জায়গা দিয়ে অস্ত্র আনার ব্যবস্থা কর তোরা। সাতদিনের মাথায় আমরা সীমান্তের দুটি জায়গা দিয়ে অস্ত্র আনার সম্ভাবনা বের করলাম। একটি চুয়াডাঙ্গা। সেখানকার এসডিও ছিলেন তৌফিক-ই-এলাহি চৌধুরী। দ্বিতীয়টি ঝিনাইদহ। ওখানকার এসডিপিও মাহবুব উদ্দিন আহমদ (এসপি মাহবুব)। আমার সঙ্গে তৌফিকের পারিবারিক সম্পর্ক এবং মাহবুবের সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক থাকার কারণে সহজে স্থান দুটি নির্ধারণ করার সুযোগ হয়।

১৯৭০-এর ১৮ ডিসেম্বর ভোর বেলায় মুজিব ভাই মনি, রাজ্জাক, তোফায়েল ও আমাকে তাঁর বাসায় যেতে বললেন। সময় [illegible] দেখলাম মুজিব ভাই নিজে [illegible] কারো সঙ্গে কথা বলছেন। আমরা যেতেই ভদ্রলোককে [illegible], চারজনকে দিয়েই সব কাজ।' আমরা আমাদের নাম বললাম। ভদ্রলোক তাঁর নাম বললেন, চিত্তরঞ্জন সুতার। কলকাতার ঠিকানা দিলেন। এদিনের ঘটনা সম্পর্কে কিছুটা বিবরণ অন্য প্রসঙ্গে আগেই দিয়েছি।

১৯৭১-এর ১৮ জানুয়ারি দুপুর বেলা মুজিব ভাই আমাদের চারজনকে তাঁর বাসায় খেতে বললেন। গিয়ে দেখি তাজউদ্দিন ভাইও আছেন। বললেন, আমার অবর্তমানে তাজউদ্দিনের সঙ্গে আলোচনা করে সব কাজ করবে। কলকাতার ঠিকানাটা আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন। আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের কাজ সঠিকভাবেই এগুচ্ছে। এখন প্রয়োজন দেশের ভেতরে কারা ও কী কী ট্রেনিং নেবে তা ঠিক করা।

অস্ত্র সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হলো 'খসরু বাহিনী'কে। ফার্স্টএইড প্রশিক্ষণ এবং বোমা তৈরির জন্য জায়গা ঠিক করা হলো প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠকে। বেছে বেছে বিএলএফ সদস্যদের মধ্য থেকে ট্রেনিংয়ের জন্য সদস্য সংগ্রহ করা হলো। ট্রেনিং চলতে থাকলো। এ ট্রেনিং-এর দায়িত্বে ছিল শরীফ নূরুল আম্বিয়া ও হাসানুল হক ইনু।

যুদ্ধের সময় বেতার যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বুয়েটের ট্রান্সমিশন যন্ত্রটি ব্যবহার করা যায় কি না তা শরীফ নূরুল আম্বিয়ার মাধ্যমে আমি একদিন দেখতে চাইলাম। বিষয়টি আমার জ্ঞানের মধ্যে না থাকার কারণে আম্বিয়া আমাকে ইলেকট্রিক বিভাগের প্রফেসর নুরুল্লাহর কাছে নিয়ে গেল। প্রফেসর নুরুল্লাহ জানালেন, ট্রান্সমিটারটি অকেজো হয়ে আছে, তবে যন্ত্রপাতি লাগিয়ে ঠিক করা যাবে। প্রফেসর নুরুল্লাহকে নিয়ে আমি ও আম্বিয়া মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গেলাম। মুজিব ভাই প্রফেসর নুরুল্লাহকে ট্রান্সমিটার ঠিক করতে বললেন। এর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হবে তারও ব্যবস্থা করা হবে বললেন। প্রফেসর নুরুল্লাহ ফিরে গিয়েই ইলেকট্রনিকস বিভাগের এক মেধাবী ছাত্র ফজলুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে কাজ শুরু করলেন। সমন্বয়কের দায়িত্বে ছিল শরীফ নূরুল আম্বিয়া। সশস্ত্র যুদ্ধের সময় এই ট্রান্সমিশন যন্ত্রটিকে কেরানিগঞ্জ থেকে চালু করা হবে এমনই সিদ্ধান্ত হলো।

ইকবাল হলের মাঠে খসরু (তার সহযোগী ছিল মোস্তফা মোহসিন মন্টু) প্রায় ৭০ জন বিএলএফ সদস্যকে অস্ত্র ট্রেনিং দিতে শুরু করে। রাতের বেলা এই ট্রেনিং দেওয়া হতো। প্রশিক্ষক ছিলেন সিরাজুল ইসলাম দুদু ও গাজী মতিউল হক পেয়ারু। একইভাবে অস্ত্র সংগ্রহের কাজও চলছিল। ঢাকা শহরের তখনকার অভিজাত এলাকাগুলোতে যাদের কাছে অস্ত্র ছিল তাদের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা হলো। দু'টি

বড় অস্ত্রের দোকান থেকে আধুনিক রাইফেল নিয়ে আসা হলো। মালিকরা প্রথমে বাধা দিলেও পরে স্বেচ্ছায় দিয়ে দেয়। তারা শুধু পুলিশে ডায়রি করে রাখে।

সেবার ২১ ফেব্রুয়ারি পালন উপলক্ষে বাংলা একাডেমিতে মুজিব ভাইয়ের বক্তৃতা দেওয়ার কথা। সেই বক্তৃতায় তিনি আগামীতে পূর্ব পাকিস্তানের নাম কী হবে তা তুলে ধরবেন। সেই সময় *পূর্বদেশ* পত্রিকা ভবিষ্যতে পূর্ব পাকিস্তানের নাম কী হতে পারে সে বিষয়ে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ঐ প্রতিবেদনে সম্ভাব্য কয়েকটি নামের মধ্যে ছিল বঙ্গদেশ, পূর্ব বাংলা ও বাংলাদেশ।

বাংলা একাডেমিতে বক্তৃতা দিতে আসার আগে মুজিব ভাই আমাকে ও রাজ্জাককে তাঁর বাসায় ডাকলেন। আমরা নিউক্লিয়াস থেকে নাম ঠিক করে গিয়েছিলাম 'বাংলাদেশ'। বাসায় গিয়ে মুজিব ভাই ঘুম থেকে ওঠার আগে ভাবীর সঙ্গে কথা বলতে তিনিও বললেন, পূর্ব পাকিস্তানের নাম বাংলাদেশই হওয়া উচিত। কাপড় পরতে পরতে মুজিব ভাই বললেন, 'আজকে তো আমাকে নামের ব্যাপারে কিছু বলতে হবে। কোনটা বলবো, তোরা বল?'

আমরা বললাম, 'আপনি কী ঠিক করেছেন বলেন। সেটাই হবে।'

তিনি বললেন, 'আমার মতে নামটা হওয়া উচিত বাংলাদেশ।' ভাবী, আমি ও রাজ্জাক শব্দ করে একসঙ্গে হেসে উঠলাম। তিনি কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, কী হয়েছে?'

ভাবী বললেন, 'ওরা তো এ নামটাই ঠিক করে এসে আমাকে বললো। আমিও বলেছি বাংলাদেশ হলেই ভালো হয়।'

মুজিব ভাই বললেন, এ ধরনের কঠিন বিষয়ে তোমরা যদি তোমাদের ভাবীসহ আগেভাগেই সিদ্ধান্ত নিতে পারো, তাহলে তো আমার কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়।'

এদিকে বাংলা একাডেমিতে সাধারণত এ ধরনের সভায় কোনভাবেই দুই হাজারের বেশি শ্রোতা হয় না। আমরা বিএলএফ সদস্যদের বিপুল সংখ্যায় সুশৃঙ্খলভাবে ঐ সভায় উপস্থিত থাকতে বলি। তারা প্রায় পাঁচ হাজারের মতো উপস্থিত ছিল। তাদের করণীয় সম্পর্কে আগেই নির্দেশ দেওয়া ছিল। মুজিব ভাই 'বাংলাদেশ' বলার

সঙ্গে সঙ্গে 'পূর্ব পাকিস্তান না বাংলাদেশ?—বাংলাদেশ, বাংলাদেশ!' এই শ্লোগানে জনসভা ফেটে পড়লো।

ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি আমরা অস্ত্র আনার জন্য ডাক্তার আবু হেনাকে শ্রী চিত্তরঞ্জন সুতারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে কলকাতায় পাঠাই। আবু হেনা ফিরে এসে ফেব্রুয়ারির শেষ ও মার্চের প্রথমদিকে অস্ত্র পাঠানোর কথা আমাদের জানালেন। আমরা সীমান্তবর্তী ঐ দুটি স্থানের কথা শ্রী চিত্তরঞ্জন সুতারকে জানিয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে ট্রেনিং-এর জন্য সারা দেশে আরও কিছু কেন্দ্র আমরা খুললাম।

## ৭ মার্চের ভাষণ

এবার আলোচনা করবো, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' প্রসঙ্গটি নিয়ে।

১৯৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে পুলিশ, বিডিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে 'ডিফেকশান'-এর পরিকল্পনা করে 'নিউক্লিয়াস'। ৭ মার্চের পর থেকে স্বাধীনতার পক্ষে যাবতীয় প্রচার র্কমকাণ্ড বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামেই পরিচালিত হতো। 'নিউক্লিয়াস'-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩ মার্চ ঘোষিত 'স্বাধীনতার ইশতেহার'-এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলা আছে। 'নিউক্লিয়াস' (সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক এবং কাজী আরেফ আহমেদ), 'বিএলএফ' হাই কমান্ড (সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, শেখ ফজলুল হক মনি এবং তোফায়েল আহমেদ) ও আওয়ামী লীগ হাই কমান্ড (সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলী)—সবার সঙ্গে আলোচনা করেই মুজিব ভাই তাঁর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধুর মুখে উচ্চারিত 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম' বাক্যটি সংযোজনের একটি পটভূমি আছে। যেমন ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের পেছনেও রয়েছে এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের প্রথমদিকে আমি ও আবদুর রাজ্জাক মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে বৈঠক করি। বৈঠকে 'নিউক্লিয়াস' ও 'বিএলএফ' গঠন এবং এর সাংগঠনিক বিস্তৃতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করি। 'নিউক্লিয়াস' সম্পর্কে তিনি আগে থেকে অবগত ছিলেন না। এ বৈঠকেই আমরা মুজিব ভাইকে আশ্বস্ত করি যে, স্বাধীনতার লক্ষ্যে 'নিউক্লিয়াস' এবং 'বিএলএফ'-এর কর্মী বাহিনী সাংগঠনিকভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ। দেশের সর্বত্র এমনকি প্রতিটি থানা পর্যায়ে এই সংগঠিত ও প্রশিক্ষিত সদস্যরা স্বাধীনতার সপক্ষে জনসমর্থন সৃষ্টি ও অন্যান্য সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা অভ্যন্তরীণ যে কোনো পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম।

বৈঠকে আমরা আরও বলি, এখন প্রয়োজন বিদেশের–বিশেষ করে প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতের–সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ স্থাপন করা। ভবিষ্যতে বিদেশি সাহায্য-সহযোগিতার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং প্রয়োজনবোধে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ ও ট্রেনিং প্রদানের ব্যবস্থা করা।

ঐ বৈঠকের কয়েক দিন পরে মুজিব ভাই লন্ডনে যান এবং সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ দূতের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। লন্ডন থেকে দেশে ফিরে তিনি 'নিউক্লিয়াস' নেতৃবৃন্দকে ডেকে ভারতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। সে অনুযায়ী আমরা 'নিউক্লিয়াস' নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের দু'টি সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারত থেকে অস্ত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা সম্পন্ন করি। এরপরই মার্চের ২৫ তারিখ পাকিস্তান বাহিনীর আক্রমণের মুখে ভারত থেকে অস্ত্র আনার বিষয়টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়, যা পরে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধের রূপ গ্রহণ করে।

১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে প্রথম সাক্ষাতেই শ্রী চিত্তরঞ্জন সুতার বিএলএফ নেতৃবৃন্দকে ২১, ড. রাজেন্দ্র রোড, নর্দার্ন পার্ক, ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০০২১ এই ঠিকানাটি মনে রাখতে বলেন। আমরা চারজন ঐ ঠিকানাটি কয়েকবার মুখে মুখে উচ্চারণ করি এবং মুখস্থ করে রাখি। মুজিব ভাই নিজেও কয়েকবার ঠিকানাটি আওড়ান।

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি মুজিব ভাই বিএলএফ-এর চার নেতা ও আওয়ামী লীগ হাই কমান্ডের নেতা তাজউদ্দীন আহমেদকে নিয়ে স্বাধীনতার বিষয়ে আলোচনায় বসেন। বৈঠকে মুজিব ভাই তাজউদ্দীনকে স্বাধীনতার প্রশ্নে 'বিএলএফ'-এর চার নেতার ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। বৈঠকে তিনি বলেন ভবিষ্যতে কখনও যদি তাঁর অনুপস্থিতি ঘটে তাহলে বিএলএফ-এর চার নেতা তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করেই স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সমস্ত কৌশল নির্ধারণ করবে। বৈঠকে এ ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টিও পুনরায় তিনি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাঁর বেতার ভাষণের মাধ্যমে ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য গণপরিষদের অধিবেশন বাতিল করলে ছাত্র-জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দিলকুশার হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি দলের বৈঠকে ছিলেন। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুকুম দেন। শুরু হয় স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

মার্চের ৩ তারিখ মধ্যরাতে মুজিব ভাই 'বিএলএফ'-এর চার নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ সময় বিএলএফ-এর পক্ষ থেকে মুজিব ভাইকে আওয়ামী লীগের একটি 'হাইকমান্ড' গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। মুজিব ভাই বললেন, তিনি নিজেও এরকমই ভেবেছেন। মার্চের ৪ তারিখে বঙ্গবন্ধু 'বিএলএফ'-এর চার নেতাকে (আমি, শেখ ফজলুল হক মনি, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ) ডেকে আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড গঠন সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি জানান, তাঁর নেতৃত্বেই আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড গঠন করা হয়েছে। হাইকমান্ডে অন্য যাঁরা সদস্য রয়েছেন তাঁরা হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলী। হাইকমান্ড গঠনের পর থেকে মুজিব ভাই প্রতি রাতেই আন্দোলনের সকল বিষয় নিয়ে আওয়ামী লীগ হাইকমান্ডের চার নেতা এবং বিএলএফ-এর চার নেতার সঙ্গে আলোচনায় বসতেন।

৭ মার্চের ভাষণের বিষয় নিয়ে ৫ মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু প্রথমে বিএলএফ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। সেদিনই আওয়ামী লীগ হাইকমান্ডের সঙ্গেও তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সে সময় হাইকমান্ড সদস্যদেরকে তিনি বিএলএফ-এর প্রস্তাবসমূহের ব্যাপারে অবহিত করেন। একই দিনে পৃথকভাবে আবারও বিএলএফ-এর আমাদের সঙ্গে ভাষণের বিষয়াদি নিয়ে তিনি আলোচনায় বসেন। সেদিন অধিক রাতে ৭ মার্চের ভাষণের বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। তা হলো, ভাষণটি খুবই আবেগময় হতে হবে এবং মূল ভাষণটি তিন ভাগে বিভক্ত থাকবে। আমাদের তরফে যে তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়, তা হলো—

এক. সংক্ষেপে অতীত ইতিহাসের বর্ণনা

দুই. নির্বাচনের ম্যান্ডেট অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবির পাশাপাশি যুগপৎভাবে অসহযোগ ও স্বাধীনতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া

তিন. 'স্বাধীনতা'র আহ্বান জানিয়ে বক্তৃতা শেষ করা।

৬ মার্চের সকাল থেকেই মুজিব ভাই বিএলএফ ও আওয়ামী লীগ হাই কমান্ডের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন। বৈঠকের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড 'মুক্তির সংগ্রাম' শব্দটি দিয়ে বক্তৃতা শেষ করার কথা বলেছে। তখন বিএলএফ-এর পক্ষ থেকে আমরা স্পষ্টভাবেই বলি, 'মুক্তির সংগ্রাম' ও 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' দুটো কথাই বক্তৃতার এক লাইনে থাকতে হবে এবং সে লাইন দিয়েই বক্তৃতা শেষ করতে হবে। তখন মুজিব ভাই আবার আওয়ামী লীগ হাইকমান্ডের কাছে বিষয়টি তুলে ধরেন। ৬ তারিখ বিকাল নাগাদ আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম' এই ঘোষণা দিয়ে বক্তৃতা শেষ করার বিষয়ে একমত হয়েছে বলে মুজিব ভাই আমাদের জানালেন।

উল্লেখ্য, ৪, ৫ ও ৬ মার্চ এই তিনদিন প্রতি দুই-তিন ঘণ্টা অন্তর আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড ও বিএলএফ হাইকমান্ডের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে বঙ্গবন্ধুর বৈঠক হতো। প্রতিটি সভার প্রসঙ্গ ছিল ৭ মার্চের বক্তৃতার বিষয়বস্তু। তবে ৬ মার্চ সন্ধ্যায় বিএলএফ-এর পক্ষ থেকে

মুজিব ভাইকে জানানো হয়, উক্ত লাইনটি ঘুরিয়ে বলতে হবে—অর্থাৎ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এভাবে বলতে হবে। এর কিছুক্ষণ পরে মুজিব ভাই আমাদের জানালেন যে, আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড আমাদের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হয়েছে। তখন বিএলএফ হাইকমান্ড ৭ মার্চের বক্তৃতার জন্য মুজিব ভাইকে পয়েন্টগুলো লিখে দেয়। প্রায় দু'ঘণ্টা পরে মুজিব ভাই প্রথবারের মতো বিএলএফ হাইকমান্ডকে তিনি কীভাবে জনসভায় বক্তৃতা করবেন তা শোনালেন। ৬ মার্চ রাত ১২টায় বিএলএফ হাইকমান্ডের সঙ্গে মুজিব ভাইয়ের পুনরায় আলোচনা হয়। তিনি তখন আবারও বক্তৃতাটি আওড়ালেন। তিনি 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে তাঁর বক্তৃতা শেষ করে আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন হলো?'

আলোচনার এ পর্বে বিএলএফ হাইকমান্ড খুব সূক্ষ্ম একটি বিষয় মুজিব ভাইয়ের কাছে তুলে ধরে। তা হলো 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম' কথাটা উচ্চারণের পর জনসভা থেকে যে গর্জন উঠবে সে শব্দে ঐ লাইনের শেষ অংশ 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ভালোভাবে শোনা যাবে না। সে কারণে জনতার গর্জন শেষ হওয়ার পর মুজিব ভাই যেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম', এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বাক্যটি দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করেন এবং 'জয়বাংলা' বলে বক্তৃতা শেষ করেন।

আজ বিষয়টিকে সামান্য বলে মনে হলেও সে সময়ের জন্য এ লাইনটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একভাবে দেখতে গেলে সেটাই ছিল প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-ঘোষণা। তাঁর ঐ বক্তৃতার অসম্পাদিত রেকর্ডে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' দুবার শোনা যায় এবং ঠিকই প্রথমবার জনতার জয়ধ্বনির কারণে ঐ লাইনের শেষাংশটি চাপা পড়ে গিয়েছিল। পুনরাবৃত্তি করার কারণে বক্তৃতাটি সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আজ ৭ মার্চের বক্তৃতাটি যখন মাঠে-ময়দানে বাজানো হয়, তখন দ্বিতীয়বারের উচ্চারণটি শোনা যায়। প্রথমবারেরটি সম্পাদনা করে বাদ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ বেতারের আর্কাইভে তাঁর অসম্পাদিত বক্তৃতাটি এখনও সংরক্ষিত আছে।

৬ মার্চ মধ্যরাতের ঐ আলোচনায় মুজিব ভাই উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে বললেন, বক্তৃতা করতে গিয়ে আবেগ ও উত্তেজনায় 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বাক্যটি দ্বিতীয়বার বলতে যদি তিনি ভুলে যান তাহলে পাশ থেকে কেউ একজন যেন তাঁকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। সিদ্ধান্ত হলো আ স ম আবদুর রব মঞ্চে তাঁর পাশে বসবে এবং তিনি যদি দ্বিতীয়বার ঐ কথাটি উচ্চারণ করতে ভুলে যান তাহলে সে তাঁর পাঞ্জাবীর কোনা ধরে হালকা একটু টান দেবে, যাতে করে তিনি বুঝতে পারেন বক্তৃতার শেষ বাক্যটি তাঁকে আবারও বলতে হবে।

এই হলো বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের ইতিহাস!

## চরম আর্থিক সংকট

১৯৬৮ থেকে '৭০-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত আড়াই বছর আমরা চরম অভাব-অনটনের ভেতর দিয়ে কাটাই। বড় কষ্টে এ দিনগুলো অতিবাহিত করেছি। ইকবাল হল কেন্দ্রিক আমাদের কাজকর্মে ৫০/৬০ জন সংগঠককে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে হতো। হাতে হাতে রিলে পদ্ধতিতে যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল আমাদের। ইপিআরটিসি, রেলওয়ে ও ট্রেলিগ্রাফ অফিসে আমাদের বিভিন্ন 'সেল' ছিল। এই সেলগুলো সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যাপারে একনিষ্ঠভাবে কাজ করতো।

ঢাকাভিত্তিক 'বিএলএফ' সংগঠকদের প্রতিদিন যাতায়াত ও খাওয়া-দাওয়ার বাবদ যে অর্থের প্রয়োজন, তার ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সারাদিনে এক বেলা খেয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটাতে হতো। শ্রমিকদের মধ্যে ২০ জন ও ছাত্রলীগের মধ্য থেকে (বিএলএফ) ৩০ জন করে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কাজ করতো। পায়ে হেঁটে ঢাকা শহরের এ মাথা থেকে ও মাথায় যেতে-আসতে হতো। এর জন্য কাউকে বাস ভাড়া দেওয়া সম্ভব হতো না। রাত জেগে থাকাটাও 'নিউক্লিয়াস'ও 'বিএলএফ'-এর ট্রেনিংয়ের অংশ ছিল। এমনও দিন গিয়েছে দুই-আনা চার-আনা করে মোট দেড় টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছি। পায়ে হেঁটে মিরপুর, সেখান থেকে দশ-বারো আনা দিয়ে বিরাট একটা কাঁঠাল কিনে মাথায় করে নিয়ে আসা, তারপর আট

আনার মুড়ি কিনে তা দিয়েই দশ-বারো জনের রাতের খাবারের প্রয়োজন মেটাতে হতো।

মাঝে মাঝে আমিনুল হক বাদশা ও আবু বকর সিদ্দিক হলের খাবার তাদের রুমে আনিয়ে রাখতো। গভীর রাতে ফিরে আমি তার অর্ধেক খেতাম। সে খাবার খেয়েই পরের দিন রাত পর্যন্ত থাকতে হতো। মাঝে-মধ্যে হলের প্রভাবশালী ছাত্ররা দু'তিন সের চালের ভাত এবং তার সঙ্গে বড় গামলায় বেশি করে ডাল, টমেটো ও পেঁয়াজ সংগ্রহ করে রাখতো। ওগুলো মিশিয়ে পনের-বিশ জনে খেতাম। মাঝে মধ্যে একেবারে না খেয়েও থাকতে হয়েছে আমাদের অনেককে।

১৯৬৮ সালের মাঝামাঝি একদিন মুজিব ভাবী একজন লোক মারফত আমাকে বাসায় ডেকে পাঠালেন। আমি যেতেই তিনি আমার হাতে একটা খাম দিলেন। খুলে দেখি ২০০ টাকা। ভাবী বললেন, 'আপনার ভাই প্রতি মাসে আমার কাছ থেকে আপনাকে এই টাকাটা নিতে বলেছেন।' মুজিব ভাই জেল থেকে বের হওয়া পর্যন্ত প্রতি মাসে (দুই-এক মাস বাদ গিয়েছে) ভাবী আমাকে খামটা দিতেন। আমাকে মাসের একেবারে প্রথমদিকে ফোন করতে বলতেন। আমাদের কোড ওয়ার্ড ছিল 'ইটালা' (ইটওয়ালা)। উনি সে অনুযায়ী আমাকে যেতে বলতেন। পরে জেনেছি মুজিব ভাই জেল থেকেই ভাবীকে বলেছিলেন ঐ টাকাটা আমাকে দিতে।

১৯৬৭-'৬৯ মধ্যে 'নিউক্লিয়াস' (বিএলএফ)-এর সদস্য সংখ্যা তিন হাজার ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে প্রায় এক হাজার সদস্য প্রতিদিন নিয়মিতভাবে আমাদের কাজে অংশ নিত। এরা ছিল সার্বক্ষণিক কর্মী ও সংগঠক। বাড়িঘর ও বাবা-মার সঙ্গে এদের সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। এই সদস্যদের স্তরভেদ ছিল। আর সে অনুযায়ী তাদের কষ্ট সহ্য করার বিশেষ ধরনের ট্রেনিং দেওয়া হতো। যেমন—রেল লাইন ধরে সাত-আট মাইল হাঁটা ও ফিরে আসা। রাত জেগে থাকা। খাবার এমনিতেই জুটতো না, তার পরেও কম খাওয়া এবং পানি ছাড়া কিছুই না খেয়ে ২/৩ দিন থাকার ট্রেনিং ছিল বাধ্যতামূলক। একেবারে উপরের পর্যায়ের ১০০ 'নিউক্লিয়াস' সদস্যের জন্য নিয়মিত লেখাপড়া করা ছিল বাধ্যতামূলক। ভবিষ্যত রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তোলাই ছিল এ ধরনের কঠোর প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য।

এছাড়াও মার্জিত স্বভাব-চরিত্র এবং সাধারণ জীবনযাপন, নিজেকে বুদ্ধিদীপ্ত ও আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলা এবং বিয়ে না করা ছিল অন্যতম শর্ত।

'নিউক্লিয়াস' সদস্যের জন্য কষ্ট স্বীকারের প্রশিক্ষণ হিসেবে এক পর্যায়ে আগুনের উপর আঙুল বা হাত রাখা, গাড়ির বা ঘরবাড়ির দরজার সংযোগস্থলে হাত রেখে দরোজা বন্ধ করার প্রস্তাব দিলেও 'ভেটো'র কারণে দ্বিতীয়টি বাতিল হয়ে যায়। একইভাবে অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনে ডাকাতির প্রস্তাবও 'ভেটো'তে বাতিল হয়ে যায়।

১৯৭১ সালের প্রথম দিকে 'বিএলএফ' ও 'জয়বাংলা বাহিনী'র সদস্য সংখ্যা এবং সেই সঙ্গে কর্মকাণ্ডের পরিসর বৃদ্ধি পায়। কেরানিগঞ্জে রতন-গগন-মাখনদের বাড়ি এ সময় 'নিউক্লিয়াস' ও 'বিএলএফ'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। আমাদের তিনজন ছাড়াও 'নিউক্লিয়াস'-এর কেন্দ্রীয় সদস্য নয় কিন্তু উপরের দিকের সদস্য যেমন মার্শাল মনি, আ স ম আবদুর রব, মেসবাহউদ্দিন, শরীফ নূরুল আম্বিয়া, হাসানুল হক ইনু, নুরে আলম জিকু, কামরুল আলম খান খসরু ও মোস্তফা মোহসীন মন্টুসহ প্রায় ৫০ জনকে এ ঠিকানাটির সঙ্গে পরিচয় করানো হয়। তাদের সঙ্গে আলোচনায় ভবিষ্যৎ কার্যক্রম, যথা—'বিএলএফ'-এর সংগঠন 'রেখা' (লাইন) এবং 'জয়বাংলা বাহিনী'র ভবিষ্যৎ কার্যক্রম (গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কিত) প্রাধান্য পেতো। খসরু-মন্টুদের সংগৃহীত অস্ত্র দিয়ে ট্রেনিংয়েরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভবিষ্যতে বাড়িটির কোনদিকে কোন কোন জায়গায় অস্ত্র লুকিয়ে রাখা যাবে তাও ঠিক করা হয়েছিল। ভারত থেকে আনা অস্ত্র সেখানে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত হয়। চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ পয়েন্ট হয়ে অস্ত্র গ্রহণ করার মূল দায়িত্ব দেওয়া হয় খসরু, মন্টু, আম্বিয়া ও ইনুর উপর।

১৯৭১ সালের প্রথমদিকেই আমরা নিশ্চিত হলাম যে, স্বাধীনতার জন্য গেরিলা যুদ্ধই উত্তম পন্থা। এই ভাবনা মাথায় রেখে আমরা সারা দেশের জন্য সম্ভাব্য গেরিলা যুদ্ধের পরিকল্পনা করি। এ সময় ঢাকার বাইরে জেলা পর্যায়েও 'জয়বাংলা বাহিনী' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। তাদের ট্রেনিং দেওয়ার কথাও ভাবা হয়।

আমরা 'বিএলএফ'-এর চারজন (আমি, মনি, রাজ্জাক ও তোফায়েল) প্রায়ই মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে ভবিষ্যতের আন্দোলন নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতাম। তিনি আমাদের পরিষ্কারভাবেই বলতেন, কেবল গণতান্ত্রিক পথে অর্থাৎ মিটিং-মিছিল দিয়ে স্বাধীনতা আসতে পারে না। সম্ভাব্য সশস্ত্র যুদ্ধের কথাও তাঁর মুখ দিয়ে প্রায়ই বেরিয়ে আসতো। এ ব্যাপারে তিনি আমাদের চারজনকে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়ার কথাও বলতেন। আমার সঙ্গে তাঁর ঢাকাসহ গোটা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সামরিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার বিষয়েও বিশদ আলোচনা হতো। এ প্রসঙ্গে (আমাদের 'স্বাধীনতার ইশতেহার'-এ উল্লেখিত) প্রয়োজনে শহর ছাড়াও গ্রাম এলাকায় ঘাঁটি গড়ার কথাও বলতেন। পাকিস্তানিদের আক্রমণের মুখে শহরে আমাদের প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে গেলে তখন গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ গড়ার ওপর গুরুত্ব দিতেন। অবশ্য তাঁর এবং আমাদেরও ধারণায় ২৫ মার্চের অতর্কিত, ব্যাপক ও নৃশংস আক্রমণের বিষয়টি ছিল না।

তখন সারা দেশে সড়কভিত্তিক যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা এখনকার তুলনায় পাঁচ শতাংশও ছিল না। রেল এবং ইপিআরটিসির বাসই যাতায়াত ও পরিবহনের প্রধান মাধ্যম ছিল। যদিও তারও আওতা ছিল খুবই সীমিত। অবশ্য নদীপথে যোগাযোগের ব্যবস্থা রাস্তাঘাটের চাইতে ভালো ছিল।

রেল ব্যবস্থায় প্রতিরোধ সংগঠন শক্তিশালী করার উপর জোর দিতে তিনি আমাকে বলতেন। সে অনুযায়ী 'বিএলএফ' চট্টগ্রাম, লাকসাম, আখাউড়া, সিলেট, সৈয়দপুর, পার্বতীপুর, দর্শনা, যশোর, খুলনা ও গোয়ালন্দসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিরোধের কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। প্রতিরোধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্লিপার তুলে ফেলা, কালভার্টগুলো অকেজো করে দেওয়া, বিশেষ বিশেষ জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে বাধা সৃষ্টি করা—এসব পরিকল্পনা নেওয়া হয়। প্রয়োজনে বিস্ফোরক তৈরি করে এসব কাজে লাগানো, সিগন্যাল ব্যবস্থা অকেজো করে দেওয়ার প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল।

আবদুর রাজ্জাকের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হলো (মুজিব ভাইই দিলেন) সারাদেশের আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের বিশেষ করে 'বিএলএফ' কর্মীদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার। এ জন্য

রাজ্জাক সারাদেশকে চার ভাগে ভাগ করে (চট্টগ্রামমুখী, সিলেটমুখী, খুলনামুখী ও রাজশাহীমুখী এভাবে) 'টিম' গঠন করে এবং তাদের সঙ্গে দ্রুততার সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা তৈরি করে। এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একদিন মুজিব ভাই বললেন, 'আমরা সময় পাবো কি না তাও সন্দেহ হয়।'

শহরের প্রতিরোধ ভেঙে পড়লে আমাদের শহরতলী ও গ্রামে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এ জন্য আমরা নির্দেশনামা হিসেবে সর্বত্র দুটি লিফলেট পাঠিয়েছিলাম।

শেখ ফজলুল হক মনির ওপর মুজিব ভাই দায়িত্ব দেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর সৈনিকদের সেনাবাহিনী থেকে বের করে নিয়ে আসার। এ বিষয়ে প্রথমদিকে মনি বা আমাদের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। মুজিব ভাই তাঁর দেওয়া একটি সূত্র ব্যবহার করার কথা বললেন। সেটি ব্যবহার করে আমরা কেবল এক 'ক্যাপ্টেন বেগ'-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হই। তাঁকে নিয়ে আমরা রতন-গগনদের বাড়িতে যাই। বাড়িটি আমাদের সম্ভাব্য ট্রেনিংয়ের জায়গা হিসেবে নির্ধারণ করা ছিল। তবে এ বিষয়ে আমরা খুব বেশি অগ্রগতি অর্জন করতে পারিনি।

তোফায়েলের ওপর দায়িত্ব ছিল সে মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে সার্বক্ষণিকভাবে যুক্ত থাকবে এবং মুজিব ভাইয়ের বিশেষ কোনো নির্দেশ থাকলে তা আমাদেরকে জানাবে।

১৯৭১-এর ২১ ফেব্রুয়ারির পরপরই মুজিব ভাই আমাদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। রাজ্জাক ও তোফায়েল তখন নির্বাচিত সংসদ সদস্য। আমাদের সঙ্গে আলোচনার এক পর্যায়ে মুজিব ভাই সংসদ নেতা, উপনেতা, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও হুইপ নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উত্থাপন করেন। তিনি ময়মনসিংহের সৈয়দ নজরুল ইসলামকে জাতীয় পরিষদের ডেপুটি লিডার, প্রফেসর ইউসুফ আলীকে স্পিকার এবং শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনকে হুইপ করার কথা বলেন। আসন্ন জাতীয় সংসদের বৈঠক সামনে রেখে ১ মার্চ দেশব্যাপী সভা-সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত হয়।

১ মার্চ একদিকে ঢাকার পূর্বাণী হোটেলে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যদের সভা আর তাঁদের ওপর চাপ রাখার জন্য পাশাপাশি একই সময়ে দেশব্যাপী সভা-মিছিলের আয়োজন করা হয়। এসব কর্মসূচি

চলাকালেই দুপুরে পাকিস্তান বেতারের সংবাদে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক ৩ মার্চের সংসদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করার কথা জানা যায়। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এ ঘোষণা গোটা জাতিকে স্তম্ভিত করে দেয়।

খবরটা পাওয়ার পর আমি মোটর সাইকেলে ইকবাল হল থেকে হোটেল পূর্বাণীর দিকে রওয়ানা হলাম। ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রলীগের সদ্য-প্রাক্তন সভাপতি আবদুর রউফ ও সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে ছাত্রদের মিছিল শুরু হয়। তার সঙ্গে চারদিক থেকে বন্যার মতো আরও মিছিল এসে যুক্ত হয় এবং সবাই শহীদ মিনারে জড়ো হয়। সেখান থেকে ডাকসুর ভিপি আ স ম আবদুর রব ২ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রতিবাদ সভার ঘোষণা দেন।

আমি মোটর সাইকেলে হোটেল পূর্বাণীতে যাওয়ার পথে মোহাম্মদ শাহজাহানের নেতৃত্বে পোস্তগোলা থেকে আগত ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরির শ্রমিকদেরসহ বিরাট একটি মিছিল দেখতে পাই। আমি তাঁকে পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের সভায় সবাইকে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দিতে বলি। এরপর আমি হোটেল পূর্বাণীতে গেলাম। তখন সংসদীয় দলের সভা প্রায় শেষ পর্যায়ে। একটি সাদামাটা বিবৃতি দেওয়া হলো। অবিলম্বে সংসদ আহ্বানের দাবি জানিয়ে। ঐ সন্ধ্যায় আমরা জিন্নাহ হলের নাম পরিবর্তন করে মাস্টার দা সূর্যসেন হল রাখি।

সেদিন আর মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা করার সুযোগ হলো না। 'বিএলএফ' নেতাদের সঙ্গেও বসা সম্ভব হলো না। ছোট পরিসরে 'নিউক্লিয়াস'-এর বৈঠক থেকে সিদ্ধান্ত নিলাম, পরের দিন অর্থাৎ ২ মার্চের সভায় বাংলাদেশের নতুন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। আ স ম আবদুর রবকে ডেকে এই সিদ্ধান্ত জানানো হলো। কথাটা শোনার পর তাকে খুবই উত্তেজিত দেখলাম। সে উত্তেজনা কেবল নতুন একটি পতাকা উত্তোলনের আবেগ থেকে নয়, তার চেয়েও বড় কিছু করার প্রত্যয় যেন তার চোখেমুখে ফুটে ওঠে। যথারীতি ২ মার্চ কলাভবনের গাড়ি বারান্দার ছাদ থেকে পতাকা উত্তোলন করা হয়। ডাকসুর জিএস আবদুল কুদ্দুস মাখন, ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজের

উপস্থিতিতে রব পতাকা উত্তোলন করে। এই পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে লক্ষাধিক ছাত্র-জনতার সমাবেশে স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ পায়।

২ মার্চের ঐ সমাবেশ থেকে ৩ মার্চ পল্টনে জনসভা অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়া হয়। এর আগে ১ মার্চ রাতেই 'নিউক্লিয়াস'-এর পক্ষ থেকে আমরা পরবর্তী আন্দোলন কর্মসূচি আর 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'-এর নামে পরিচালনা করার প্রয়োজন নেই বলে সিদ্ধান্তে আসি। কারণ আমাদের মনে হলো 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' নিয়ে এগুতে গেলে ভবিষ্যতে ছাত্রলীগ ও ডাকসু ছাড়া অন্যদের (ছাত্র ইউনিয়নের দুই গ্রুপ ও এনএসএফ) তরফ থেকে বাধা আসতে পারে। এ চিন্তা থেকে আমরা ডাকসু ও ছাত্রলীগ দিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। 'নিউক্লিয়াস'-এ তা অনুমোদিত হয়। এভাবেই ২ মার্চের পতাকা উত্তোলন-এর মতো ইতিহাস সৃষ্টিকারী ঘটনাটি ঘটানো সম্ভব হয়। সেদিন সন্ধ্যা হতে হতেই আমরা 'নিউক্লিয়াস' থেকে ৩ মার্চের জনসভায় স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিই।

৩ মার্চ পল্টনের জনসভায় শাজাহান সিরাজের ইশতেহার পাঠের প্রায় শেষ পর্যায়ে হঠাৎ দেখলাম মুজিব ভাই পনের-বিশজনকে নিয়ে পল্টনের মঞ্চের দিকে আসছেন। তাঁর আসার এ খবরটা আমার জানা ছিল না। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো আলাপও এর আগে আমার হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই ইশতেহার পাঠ বন্ধ হয়ে গেল। মুজিব ভাই মঞ্চে উঠলেন। মুজিব ভাইয়ের সামনেই ঘোষিত হলো 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম হলো।'

সভার অন্যান্য ঘোষণার মধ্যে ছিল জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত এবং সামনের দিনের সশস্ত্র সংগ্রামের ইঙ্গিত ও নির্দেশনা।

মুজিব ভাই পাঁচ মিনিটের মতো বক্তব্য দিলেন। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভার কথা বললেন। ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার ৭ মার্চের জনসভা সম্পর্কে কথা হয়েছে। আমি আজও জানি না কী কারণে মুজিব ভাই সেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে পল্টনের জনসভায় হাজির হয়েছিলেন। ঐ সভায় উপস্থিত জনতার আকাঙ্ক্ষা ছিল হয়তো মুজিব ভাই সেখান থেকেই সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। কিন্তু ৭ মার্চের সভার কথা বলার পর বিষয়টি আর এগুলো না।

৭ মার্চের জনসভা থেকে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা বাস্তবায়নের সব দায়িত্ব এসে পড়ে 'নিউক্লিয়াস' ও 'বিএলএফ'-এর ওপর। ইতিমধ্যে গঠিত ছাত্র-যুব-শ্রমিক-কৃষক ও নারী-ব্রিগেডের নেতৃত্বে সারা দেশে আন্দোলন চলছিল। এ বিষয়ে মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের, বিশেষ করে আমার ও রাজ্জাকের প্রতিদিন দুই-তিনবার আলোচনা হতো। ওসব আলোচনার বিষয় ছিল অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য। মুজিব ভাই আমাদেরকে (বিএলএফ) বলেছিলেন, 'তোদের ছাড়া অসহযোগ বা অন্য কোনো কর্মসূচি সফল হবে না।'

২০ মার্চ থেকে ঘটনাপ্রবাহ দ্রুতগতিতে এবং ভিন্নখাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে। মিটিং-মিছিল ভিত্তিক আন্দোলন অপ্রয়োজনীয় ও অযথেষ্ট হয়ে পড়ছিল। জনগণ নিজেরাই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আরম্ভ করলো পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে। গাজীপুর, টঙ্গী, চট্টগ্রাম, সৈয়দপুর এসব স্থানে পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে সরাসরি সংঘাত শুরু হলো।

১৫ মার্চ ইয়াহিয়া ঢাকায় এলেন, মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করতে। আলোচনায় মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে আওয়ামী লীগ হাইকমান্ডের সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলীও ছিলেন। এক পর্যায়ে ভুট্টোও ঢাকায় এলেন। ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো আলোচনা হলো। আলোচনার পর প্রতিদিন প্রেসনোট ইস্যু করা হতো। আওয়ামী লীগের তরফে আলোচনার ফলাফল জানিয়ে প্রেসনোট লিখতেন তাজউদ্দীন সাহেব। ১ মার্চের পর থেকে সংবিধান রচনার জন্য আওয়ামী লীগের তরফে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। যার সদস্য ছিলেন ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, প্রফেসর নুরুল ইসলাম, ড. মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, রেহমান সোবহান ও নূর মোহাম্মদ মিয়াসহ বেশ কয়েকজন। এ সময় আমি একদিন মুজিব ভাইকে বললাম, 'এঁরা যে সংবিধান তৈরি করছেন সেটি কি পাকিস্তানের না বাংলাদেশের? আর ওখানে আপনার প্রতিনিধি কে?' তিনি বললেন, 'ঠিকই তো বলেছিস! তুই ওদের সঙ্গে একটু বসবি?'

আমি পরের দিন গেলাম। আমাকে আমার বক্তব্য বলতে বলা হলো। আমি বললাম, সংবিধানে ৬-দফার পূর্ণাঙ্গ অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। বিশেষ করে দুই মুদ্রা এবং পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে এক লক্ষ মিলিশিয়া থাকতে হবে। তাঁরা সকলে এক বাক্যে বললেন, 'সেক্ষেত্রে তো পাকিস্তান থাকে না। তবে আমাদের এখানে বসে লাভ কী?'

সেদিন সন্ধ্যে বেলায়ই ঐ কমিটির পক্ষ থেকে মুজিব ভাইকে বলা হলো, 'সিরাজের কথা শুনলে তো পাকিস্তানই থাকে না। সেক্ষেত্রে আমাদের এ সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রয়োজন কী?'

এদিকে পরিস্থিতি ক্রমে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে লাগলো। মুজিব ভাই তাঁর সঙ্গে ইয়াহিয়ার এবং ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সঙ্গে তাঁর কী আলোচনা হয় তা জানানোর জন্য প্রতিদিন রাত ১০টার পরে আমাকে তাঁর বাসায় থাকতে বলতেন। সবাই চলে যাবার পর তিনি আমার সঙ্গে বসতেন।

প্রথমদিন আলোচনার পর মুজিব ভাই বললেন, 'সিরাজ, আলোচনা তো একদিনে শেষ হবে না। এটি গড়িয়ে গড়িয়ে চলবে।'

আমি আমার সে সময়কার বুদ্ধি ও মেধা দিয়ে বললাম, 'মুজিব ভাই, আমাদের স্বাধীনতার লক্ষ্যটি যেন কোনোভাবেই ইয়াহিয়া বুঝতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।'

তিনি বললেন, 'ঠিকই বলেছিস।'

ইয়াহিয়া বা ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনায় যাবার আগে মুজিব ভাই আওয়ামী লীগ হাইকমান্ডকে তাঁর বাসায় আসতে বলতেন। আমাকেও যেতে বলতেন। তিনিসহ আওয়ামী লীগাররা যেন মুজিব কোট পরে আলোচনায় যায়, সেটি যাতে নিশ্চিত করা হয়, আমি তা বলতাম। খন্দকার মোশতাক আহমেদ ছাড়া আর সবাই মুজিব কোট পরতেন। তারা ফিরে আসা পর্যন্ত আমি মুজিব ভাইয়ের বাসায় থাকতাম। সংবাদপত্র ও বিদেশি গণমাধ্যমগুলো আলোচনায় অগ্রগতি হচ্ছে বলে সংবাদ দিত।

২১ মার্চ মুজিব ভাই বৈঠক থেকে ফিরে এসে জানালেন, নামেমাত্র এক পাকিস্তান রেখে দুই অংশের জন্য দুই প্রধানমন্ত্রী এই ঐকমত্যের ভিত্তিতে আলোচনা শেষ হয়েছে। ২২ মার্চ ফলাও করে

এ সমঝোতার কথা প্রচারিত হলো। সংবাদপত্রগুলো লিখলো, আলোচনা সফল হয়েছে।

সে রাতে মুজিব ভাইকে খুব গম্ভীর ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখলাম। পরের দিন ২৩ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে 'প্রতিরোধ দিবস'। ঐদিন মুজিব ভাই ইয়াহিয়ার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে যান। 'নিউক্লিয়াস' থেকে আমরা ঠিক করলাম, মুজিব ভাই গাড়িতে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। মুজিব ভাই এতে আপত্তি জানালেন। তিনি স্পষ্টতঃ এর বিপক্ষে ছিলেন। পরে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'-এর চাপে তিনি তাঁর গাড়িতে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা লাগাতে রাজি হন। যাবার আগে খসরু রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ করে তাঁকে অভিবাদন জানালো, আমাদের দিক থেকে যা ছিল আসলে সশস্ত্র যুদ্ধের ইঙ্গিত। হাসানুল হক ইনু মুজিব ভাইয়ের গাড়িতে পতাকা লাগিয়ে দিল। এভাবেই মুজিব ভাই ইয়াহিয়ার সঙ্গে কথা বলতে গেলেন। পরের দিন আবারও সংবাদপত্রে সফল আলোচনা ইত্যাদির কথা বলে খবর পরিবেশিত হলো।

২৩ মার্চ রাত ৮টার দিকে মুজিব ভাইয়ের বাড়ি থেকে প্রায় সবাই চলে যায়। যথারীতি আমি ১০ টায় ৩২ নম্বরে উপস্থিত ছিলাম। রাজ্জাক এসে বললো, 'সিরাজ ভাই, কী করবেন?' আমি তার দিকে তাকাতেই পেছনে দেখলাম মনি, তোফায়েল, আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ ও শেখ শহীদ। আমি ও রাজ্জাক দুজনেই দুজনকে বললাম, এ বিষয়ে আমাদের বসতে হয়। তখন 'নিউক্লিয়াস'-এর আলাদাভাবে বসার সময় নেই।

বসার জন্য সেখান থেকে সবাই আমরা একসঙ্গে আওয়ামী লীগের ট্রেজারার খুলনার মোহসীন ভাইয়ের বাসায় গেলাম। তাঁর বাসা লালমাটিয়ায়। যাওয়ার আগে মুজিব ভাইয়ের সামনে যেতেই বললেন, 'কিরে, কোনো কথা আছে'? তখন তিনি একা। তাঁকে খুবই চিন্তিত দেখলাম। বললাম, আমরা রাতে দেখা করবো। তিনি ২টার পরে আমাদের আসতে বললেন।

মোহসীন ভাইয়ের বাসায় আমরা প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে কথা বললাম। প্রথমে আমি বৈঠকের ফলাফলের কথা জানালাম। অন্যরা বললো, 'সে তো আমরাও জানি। এখন মুজিব ভাইকে কীভাবে রাজি

করানো যায়? দুই প্রধানমন্ত্রীর ফর্মুলা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।' আমি বললাম, আমরা সবাই একমত থাকলে মুজিব ভাই রাজি হবেন। রাত ঠিক আড়াইটায় মুজিব ভাইয়ের বাসার দোতলায় আমি, রাজ্জাক, মনি, আ স ম রব, শাজাহান সিরাজ ও শেখ শহীদ মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে বসলাম। সেখানে আরও ছিলেন বেগম মুজিব ও মমিনুল হক খোকা মামা। মুজিব ভাই-ই কথা তুললেন। তিনি বললেন, 'কী করতে হবে বল। কীভাবে কী করবো?'

আমরা বললাম, এ চুক্তি বাংলার মানুষ কোনোভাবেই গ্রহণ করবে না। আর এবার না হলে কোনোদিনই বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীনতার পক্ষে আনা যাবে না।

উনি বললেন, 'আমিও তা-ই মনে করি। কিন্তু কী বলে আলোচনা ভাঙতে হবে?' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সিরাজ, তুই কী বলিস?' তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যা বলার কাল সকালেই বলতে হবে। ইয়াহিয়া কাল চলে যাবে।'

মুজিব ভাইসহ আমরা সবাই কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। আমি বললাম, একটাই সমাধান আছে, আলোচনা ভেঙ্গে দিতে হবে। মুজিব ভাই বললেন, 'কোনটা'? পরক্ষণেই বললেন, 'ও হ্যাঁ বুঝেছি।' তখন ভোর সাড়ে চারটা। মুজিব ভাইয়ের চোখ লাল। তামাকের পাইপ কামড়ে ধরেছেন। এটি তিনি সাধারণত কঠিন সময়েই করতেন।

পরে বললেন, 'তোরা যা। একটা উপায় বের করতে হবে।'

আমরা বেরিয়ে আসার সময় আমাকে বললেন, 'তুই পাঁচ মিনিট পরে যা।'

অন্য সবাই নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, 'দুই মুদ্রা ব্যবস্থা চুক্তির মধ্যে থাকতে হবে।'

মুজিব ভাই বললেন, 'হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি'।

আমি এরপর এক লক্ষ মিলিশিয়ার কথা যোগ করলাম।

তিনি বললেন,'মিলিশিয়ার ব্যাপারে আমি তাদেরকে আগেই বলেছি। এখন দুই মুদ্রার বিষয়টাই আলোচনা ভাঙার একমাত্র উপায়।'

তিনি আমাকে পরদিন সকাল দশটার দিকে আসতে বললেন।

আমি বললাম, 'দরকার নেই। আপনি আলোচনা থেকে ফিরে এলেই আমি আসবো।'

আমি দুপুরে গেলাম। তিনি বললেন, 'ইয়াহিয়া আমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে।'

মুজিব ভাই বললেন, 'আগামীকাল রাতেই ওরা আক্রমণ করবে। প্রথম পর্যায়েই প্রতিরোধটা যেন শক্ত হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।' আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'কাউকে বলিস না। আমি বাসাতেই থাকবো। আমাকে না পেলে ওরা উন্মাদের মতো আচরণ করবে আর সে সুযোগে আমাকে মেরেও ফেলবে।'

এটিই স্বাধীনতার আগে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা।

২৫ মার্চ রাতে মুজিব ভাই জাতির উদ্দেশে পুলিশের মাধ্যমে যে বার্তা দিয়েছিলেন তা হলো : The enemy has struck us. Hit them back. Victory is ours, Insha Allah. Joy Bangla. Mujibur Rahman. (শত্রুরা আমাদের আঘাত করেছে। আপনারা পাল্টা আঘাত করুন। ইনশাল্লাহ বিজয় আমাদের হবেই। জয়বাংলা। মুজিবুর রহমান)

এ বার্তার ব্যাপারে মুজিব ভাই আমার সঙ্গে আগে আলাপ করেছিলেন এবং এর ২/৩টা খসড়াও তৈরি করেছিলেন। ড. কামাল হোসেন এটির মুসাবিদা করে দেন। তাজউদ্দীন ভাই ও আমাকে দেখিয়ে তিনি বললেন, এটি মুজিব ভাইয়ের কাছে নিয়ে যান।

ঐ তিনটি বাক্যই জাতির উদ্দেশে মুজিব ভাইয়ের শেষ আহ্বান ছিল।

আমি ২৫ মার্চ ভোর রাত পাঁচটা পর্যন্ত লালবাগ থানার ওসির রুমে কাটিয়েছি। সেখানে এই বার্তা আমি নিজে শুনেছি। ২৬ মার্চ সকালে আমি বুড়িগঙ্গা নদী পার হই। ২৬-২৭ মার্চ কেরানিগঞ্জে মন্টুদের এলাকায় ছিলাম। ২৭ মার্চ জিয়াউর রহমানের ঘোষণা শুনি। ২৭ তারিখ রাতে 'নিউক্লিয়াস'-এর সবাই আমরা রতন-গগনদের বাড়িতে জড়ো হলাম। আমি, রাজ্জাক, আরেফ, মনি, তোফায়েল, রব, শাজাহান সিরাজ, খসরু ও ক্যাপ্টেন বেগ। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডাক্তার আবু হেনা, শেখ মনি, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ এইচ এম কামরুজ্জামান কলকাতা চলে গেলেন। আমি, রাজ্জাক, খসরু, সুমন মাহমুদ বাবুল, ক্যাপ্টেন বেগ একসঙ্গে খুলনা পর্যন্ত গেলাম। সেখান থেকে দুই ভাগ হয়ে রাজ্জাক ও খসরু সাতক্ষীরা দিয়ে কলকাতা গেল।

আমি প্রথমে পটুয়াখালি গেলাম। সেখানে মেজর জলিলের সঙ্গে আমার দেখা হলো। নাজমুল হক নামে একজন ম্যাজিস্ট্রেটও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। কাজী আরেফ ঢাকার দায়িত্বে থাকলো। বলা হলো, যতদিন সম্ভব সে এখানে থেকে 'বিএলএফ' সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

এরপর আমি, নুরুল ইসলাম (প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য) ও নাজমুল হক চুয়াডাঙ্গায় গিয়ে সেখানে মেজর আবু ওসমান চৌধুরী ও তৌফিক-ই-এলাহির সাক্ষাৎ পেলাম। তাঁরা বললেন, কলকাতা থেকে তাঁদের কাছে বার্তা এসেছে, যে কোনোভাবেই হোক আমাকে যেন নিরাপদে কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়।

আমি নুরুল ইসলাম ভাইসহ গেদে বর্ডার দিয়ে পশ্চিম বাংলায় ঢুকলাম। ৩১ মার্চ আমি কলকাতা পৌঁছাই। কলকাতায় পৌঁছানোর পর মালেক উকিল আমাকে শ্রী চিত্তরঞ্জন সুতারের বাড়িতে নিয়ে যান। যাবার সময় মালেক উকিল বললেন, 'তোমার জন্য বারবার দিল্লি থেকে বার্তা আসছে।' চিত্ত সুতারের বাড়িতে গিয়ে সেখানে মনি, রাজ্জাক ও তোফায়েলকে পেলাম।

এরপর প্রবাসী সরকারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হলো। আমাদের উদ্যোগে তাঁদের মধ্যেকার ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে সরকার গঠনের কাজ চূড়ান্ত করা হলো। শেখ মুজিব প্রেসিডেন্ট, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট, তাজউদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রী ও খন্দকার মোশতাক আহমেদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

১৯৭১-এর ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে প্রবাসী সরকার শপথ নিল। সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের চারজনকে (আমি, মনি, রাজ্জাক ও তোফায়েল) সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটমেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হলো। ইতিমধ্যে আমরা আমাদের আগের যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলাম। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের একজন প্রতিনিধি মেজর জেনারেল সুজন সিং উবান (S S Uban)-এর সহায়তায় আমরা সংগঠিত হতে শুরু করি। দেরাদুনের টান্ডাওয়া ও আসামের হাফলংয়ে 'বিএলএফ'-মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা হয়। এভাবে সাত হাজার 'বিএলএফ' সদস্যকে আমরা ট্রেনিং দিতে সক্ষম হই। প্রশিক্ষণ শেষে তারা অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং

অন্য সকল মুক্তিযোদ্ধা (এফএফ)-এর সঙ্গে মিলে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। নভেম্বরের শেষ নাগাদ 'বিএলএফ' ও 'এফএফ'-এর মিলিত শক্তি সমগ্র বাংলাদেশের শহর ও গ্রাম এলাকায় জনগণকে স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়।

ডিসেম্বরের ৪ তারিখ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। মাত্র এগারো দিনের মাথায় ১৫ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর সম্পূর্ণ পরাজয়ের মধ্য দিয়ে সে যুদ্ধ শেষ হয়। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রমনা রেসকোর্সে (বর্তমানের সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে ৯৫ হাজার পাকিস্তানি সৈন্যের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত সারাদেশে থানা, মহকুমা ও জেলা পর্যায়ে প্রবাসী সরকারের অধীনে মুক্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা নিজস্ব প্রশাসন চালু রাখে।

বস্তুত ঐ ২৪/২৫ দিনই প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে দেশ পরিচালিত হয়েছিল। এর আগে বা পরে, আজ পর্যন্ত, আর কখনোই তা হয়নি। মুজিব ভাই ১০ জানুয়ারি ১৯৭২-এ দেশে ফিরলেন। ১২ জানুয়ারি তিনি রাষ্ট্রপ্রতির পদে ইস্তফা দিয়ে তাজউদ্দীন আহমদের কাছ থেকে নিজেই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তাজউদ্দিনকে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ ঘটনাটি ঘটে আমাদের সম্পূর্ণ অমতে। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে আমি মুজিব ভাইকে একটি ১৫-দফা সুপারিশমালা দিই।

## ১৫-দফা সুপারিশমালা

১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের কোনো এক সময় 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' (বিএলএফ)-এর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বৈঠক হয়। বঙ্গবন্ধু আমাদের চারজনকে (সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ) দেশ পরিচালনার বিষয়ে একটি সুপারিশমালা দিতে বলেন। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে আমি ১৫-দফা কর্মসূচির একটি খসড়া তাঁকে দিই। নতুন

রাষ্ট্রটি কীভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, এ কর্মসূচিতে আমি তা উল্লেখ করেছিলাম। প্রস্তাবগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. অসম্পূর্ণ সশস্ত্র যুদ্ধ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনায় রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত একটি 'বিপ্লবী জাতীয় সরকার' দ্বারা দেশ পরিচালিত হবে। সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেওয়া সকল দল ও গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত এ সরকারের প্রধান থাকবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

২. কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হবে সশস্ত্র যুদ্ধের পরীক্ষিত নেতৃত্ব দ্বারা, যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা ধারণ করেন।

৩. বঙ্গবন্ধুর মর্যাদার বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বঙ্গবন্ধু থাকবেন সকল দলের উর্ধ্বে। প্রয়োজনবোধে তিনি রাজধানীর বাইরে অবস্থান করবেন। তাঁকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতির চেতনা বিকাশের ধারা প্রবাহিত হবে।

৪. বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হবে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনার আলোকে, কোনো দেশের অনুকরণে নয়। সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেওয়া সকল দল ও গ্রুপের প্রতিনিধিদের নিয়ে 'সংবিধান প্রণয়ন কমিটি' গঠন করা হবে।

৫. চিরাচরিত প্রথার সেনাবাহিনী গঠন না করে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনায় জাতীয় পর্যায়ে 'রেভল্যুশনারি (বিপ্লবী) গার্ড বাহিনী' গঠন করা হবে। সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিক, এফএফ এবং বিএলএফ-সহ মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে এ বাহিনী তৈরি করা হবে। এর সমান্তরাল অন্য কোনো বাহিনী থাকবে না।

৬. রেভল্যুশনারি গার্ডের মধ্যে থাকবে—

   ক. বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 'জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী', যা হবে 'পিপলস আর্মি'।

   খ. কৃষিকাজে সহায়তা দেওয়ার জন্য রেভল্যুশনারি 'কৃষক ব্রিগেড'।

   গ. শিল্প এলাকার জন্য রেভল্যুশনারি 'লেবার ব্রিগেড'।

৭. নির্যাতনকারী পুলিশ বাহিনীর বদলে পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সমন্বয়ে 'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী' গঠন করা হবে। 'পুলিশ' নামটি ব্যবহার করা হবে না।

৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আপাতত বন্ধ থাকবে। মুক্তিযোদ্ধা-শিক্ষক-ছাত্রদের নিয়ে ছোট ছোট 'স্কোয়াড' তৈরি করে বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। এক বছরের মধ্যে ৬০ শতাংশ মানুষকে সাক্ষরতার আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

৯. উচ্চশিক্ষার সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। শিক্ষার জন্য ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হবে। উচ্চ শিক্ষার জন্য গৃহীত ব্যাংকঋণ শিক্ষা শেষ করে কর্মক্ষেত্রে যোগ দিয়ে পরিশোধের ব্যবস্থা থাকবে।

১০. ব্রিটিশ-পাকিস্তানি আমলের ধারাবাহিকতায় জেলা-মহকুমা-থানায় প্রশাসনের কোনো 'ক্যাডার' বা 'গোষ্ঠী'কে জনপ্রশাসনের দায়িত্বে রাখা যাবে না।

১১. সশস্ত্র যুদ্ধের সময় যারা জেলা-মহকুমা-থানা পর্যায়ে 'কমান্ডার'-এর দায়িত্ব পালন করেছেন, তারাই জনপ্রশাসনের দায়িত্বে থাকবেন।

১২. জনপ্রশাসনে ব্রিটিশ-পাকিস্তানি আদলে প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ এসব শ্রেণিবিন্যাস থাকবে না। কাজের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের জন্য যে স্তর হয়, তা অবশ্যই থাকবে।

১৩. সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ বেতনের অনুপাত হবে ১:৭।

১৪. 'সমবায় ভিত্তিক অর্থনীতি' চালু হবে। পরিত্যক্ত কলকারখানা মুক্তিযোদ্ধা-শ্রমিক-কর্মচারীদের 'সমবায়ে'র মাধ্যমে পরিচালিত হবে। 'সমবায়'-এর জন্য ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।

১৫. কেবল ভারত ও রাশিয়ার ওপর নির্ভর না করে চীন, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

কর্মসূচিটি দেখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেটা তাঁর টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দেন। সর্বদলীয় সরকারের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর প্রাথমিক সম্মতি ছিল। তবে তাঁর মনে হয়েছিল, এটির বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না।

তাঁর সঙ্গে আমার এ বিষয়ে আলোচনার সারাংশ—

**মুজিব :** অন্য কোনো দল আসবে না। সুতরাং ঐ চিন্তা বাদ দাও।

**আমি :** কথাবার্তা বলতে হবে সবার সঙ্গে। তোয়াহা (কমিউনিস্ট নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা) ভাইকে আমি যেমন করেই হোক ম্যানেজ করবো। সিরাজ শিকদারকেও আমি আনতে পারবো।

**মুজিব:** আমার মনে হয় না এটি সম্ভব হবে। আমার দলের অনেকেই এটি পছন্দ করবে না।

তখনকার গণভবনের সবুজ চত্বরে একদিন সন্ধ্যায় আমার কাঁধে হাত রেখে বঙ্গবন্ধু অনেকক্ষণ হেঁটেছিলেন। এক পর্যায়ে বলেই ফেললেন, 'পারলাম না রে, সিরাজ!' আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতাদের সকলেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন।

## ছাত্রলীগের দ্বিধা-বিভক্তি

স্বাধীনতার আগেই ১৯৭০ সালের ১২ আগস্ট ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সংগঠনের প্রচার সম্পাদক স্বপন চৌধুরী 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' গঠনের যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তা ছাত্রলীগের ভেতরে দুটি ভাগকে স্পষ্ট করে তোলে। দেখা যায় একভাগ স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে, অন্যভাগ কেবল স্বায়ত্তশাসনের দাবিতেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে চায়।

আমরা (আমি, রাজ্জাক, আরেফ) 'বিএলএফ'কে এমনভাবে সংগঠিত করার উদ্যোগ নিই যাতে তা কোনোভাবেই কোন্দলের শিকার না হয়। বিশেষ করে আসন্ন সশস্ত্র সংগ্রামের দিনগুলোতে এ ধরনের কোন্দল যে প্রাণহানি ঘটাতে পারে, সে সম্পর্কে আমরা সচেতন ছিলাম, আর এ ব্যাপারে আমার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। ফলে সফলভাবেই আমরা সেই পর্যায়টি অতিক্রম করি। স্বাধীনতার পর ছাত্রলীগের দুই জায়গায় দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বিভক্তিটা প্রকাশ্য ও চূড়ান্ত রূপ নেয়।

স্বাধীনতার পর ছাত্রলীগের প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২-এর ২১-২৩ জুলাই। ১৯৬০-এর দশকের শুরু থেকেই ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে একটি প্রগতিশীল রাজনীতির ধারা জন্ম নিয়েছিল। 'নিউক্লিয়াস'-এর সৃষ্টিও হয় এ প্রগতিশীল ধারার ভেতর

থেকেই। এই ধারাটি মূলত বাঙালিদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতার পক্ষে গোপনে ছাত্রলীগ সদস্যদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাতো। এ ধারার আরেকটি লক্ষ্য ছিল ভবিষ্যতের স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো কী হবে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে একটি স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করা। সে সময়ে বিশ্ব জুড়ে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বেশ শক্তিশালী ছিল। বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলোতে যেসব জাতীয় মুক্তি আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল তারও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য ছিল সমাজতন্ত্র। ছাত্রলীগের প্রগতিশীল অংশটি বিশ্বব্যাপী উপনিবেশবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলোর ব্যাপারে খোঁজ-খবর রাখতো ও তাদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতো। সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্বে, যুদ্ধ চলাকালে এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'নিউক্লিয়াস'-এর নেতৃত্বাধীন ছাত্রলীগের এই প্রগতিশীল ধারাটি ছাত্রলীগের মূলধারায় পরিণত হয়।

এ সময়ে এ ধারার বিরোধী একটি অতি দুর্বল ধারাও ছাত্রলীগে ছিল যাদের আদর্শ জাতীয়তাবাদেই সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ জাতীয় মুক্তি অর্জনের পরে রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আগের মতোই ঔপনিবেশিক ও পুঁজিবাদী থেকে যাবে এমনটাই তারা চাইতো।

১৯৭২-এর ছাত্রলীগ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে এই দুই ধারার বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধু যেহেতু নিজে সশস্ত্র যুদ্ধের পুরো সময়টা পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন, তিনি যুদ্ধের এই সশস্ত্র পর্বটা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত ছিলেন না। এদিকে তাঁর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের একমাত্র তাজউদ্দীন আহমদ ছাড়া বাকি নেতাদের সকলেই ছিলেন একেবারে সাবেকী ধরনের রাজনীতির ধারক ও বাহক। রাষ্ট্রীয় চার নীতিতে সমাজতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত হলেও এদের কেউই সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না। অনেকে ছিলেন এমনকি কট্টর পুঁজিবাদের সমর্থক। দেশ স্বাধীন হওয়ার মুহূর্ত থেকেই শেখ ফজলুল হক মনিও ঐ দলের হয়ে গেলেন।

বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে সশস্ত্র যুদ্ধের সংগঠন ও পরিচালন প্রক্রিয়া এবং তার অগ্রগতির বিবরণ, যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর বাইরেও ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক বিশেষ করে তরুণদের ভূমিকার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করতে পারেননি। এ সম্পর্কে তাঁর বাস্তব ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা

ছিল না। ফলে স্বাধীনতা যুদ্ধের মূলশক্তিটিকে তিনি কখনোই বুঝতে বা ঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারেননি।

ছাত্রলীগের প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী অংশ আলাদাভাবে তাদের সম্মেলনের আয়োজন করে। প্রগতিশীল অংশ তাদের সম্মেলনের স্থান নির্ধারণ করে পল্টন ময়দানে। অন্য অংশ রেসকোর্স ময়দানে তাদের প্যান্ডেল খাটায়। উভয় গ্রুপই তখনও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি সমভাবে অনুগত ছিল। উভয় গ্রুপই তাঁকে তাদের সম্মেলনে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানালে তিনি উভয় গ্রুপকেই তাদের সম্মেলনে যাবেন বলে কথা দেন। সম্মেলনের আগের রাতেও ছাত্রলীগের প্রগতিশীল অংশের নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তায় তিনি জানিয়েছিলেন যে, তিনি কোনো সম্মেলনেই যাবেন না। অন্য গ্রুপকেও তিনি একই কথা বলেন। কিন্তু পরদিন সকালে বঙ্গবন্ধু পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের প্রগতিশীল অংশের বিশাল সম্মেলনে উপস্থিত না হয়ে হাজির হলেন রেসকোর্সে কয়েকশত ছাত্রের উপস্থিতিতে ছাত্রলীগের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের সম্মেলনে। বঙ্গবন্ধুর এই প্রকাশ্য অবস্থান ছাত্রলীগের ভাঙনকে স্থায়ী রূপ দেয়।

একই দিনে দু জায়গায় ছাত্রলীগের দুই অংশের দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের আগের রাতেও মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে আমার একান্ত আলোচনা হয়। তিনি আমাকে ধারণা দিয়েছিলেন দুই সম্মেলনের কোনোটিতেই তিনি যাবেন না। রবদের সম্মেলনের জন্য আমাকে কয়েক হাজার টাকা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'সিরাজ, আমি কমিউনিস্ট হতে পারবো না।' একথা বলার সময় তাঁর অভিব্যক্তি থেকে মনে হলো, তিনি কোনোমতেই রবদের সম্মেলনে যাবেন না। আবার 'আমি কমিউনিস্ট হতে পারবো না'—একথার অর্থ এও হতে পারে যে, আমার ও তাঁর রাজনীতি ভবিষ্যতে আর এক পথ ধরে এগুবে না।

রাত দেড়টার দিকে আমি তাঁর বাসা থেকে বের হই। তখন সেখানে আর কেউ নেই। আমি এসএম হলে ফিরে আসি। ভোর পাঁচটার দিকে *দৈনিক বাংলা* থেকে একজন আমার কাছে এসে বললো, শেখ সাহেব রেসকোর্সের ছাত্রলীগ সম্মেলনে যাবেন, এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং গভীর রাতে মনিকে তা জানিয়েছেন। অর্থাৎ আমি তাঁর বাসা থেকে বের হবার পর অজ্ঞাত কোনো কারণে মুজিব ভাই আমাকে

দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখতে পারলেন না। মুজিব ভাই কাউকে কিছু না জানিয়ে বলা যায় নিজেই এই সিদ্ধান্ত নেন। সেদিন পল্টনে ছাত্রলীগ সম্মেলনের নেতৃত্বে ছিলেন আ স ম আবদুর রব আর রেসকোর্সে ছিলেন নূরে আলম সিদ্দিকী।

এভাবে দুই জায়গায় দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রলীগের দ্বিধাবিভক্তি চূড়ান্ত হয়ে গেল। এ বিভক্তির পরেও আ স ম আবদুর রবের অনুসারী ছাত্রলীগ মুজিব ভাইয়ের প্রতি অনুগত ছিল। ইতিমধ্যে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে বাংলাদেশের নতুন সংবিধান রচিত হলো। আমরা এ সংবিধানকে ভারত-পাকিস্তান-ব্রিটেনের অনুকরণে রচিত সংবিধান বলে আখ্যায়িত করলাম। বস্তুত এটি ছিলও তাই। স্বাধীনতা সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষার কোনো ধরনের প্রতিফলন এ সংবিধানে ছিল না। তা সত্ত্বেও এ আধাখেঁচড়া ও বিদেশী সংবিধানের অনুকরণে তৈরি দলিলকেই আমরা 'A bad constitution is better than no constitution' (বাংলা প্রবাদে যেমন বলা হয় 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো') হিসেবে গ্রহণ করি।

সে সময় আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের জন্য ১ জানুয়ারি ১৯৭২ সাল থেকে 'গণকণ্ঠ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটি স্বাধীনতা যুদ্ধের আদর্শ-উদ্দেশ্য ও চেতনা ধারণ করে পাঠক মহলে, বিশেষ করে তখনও যুদ্ধের উত্তাপে টগবগ করতে থাকা যুব সমাজের মধ্যে যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল তা কেবল সে সময়ে যারা এটি দেখেছেন তারা ছাড়া আর কারও পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

একটি পত্রিকা কী করে একটি জাতির সুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার শিখা হয়ে উঠতে পারে *গণকণ্ঠ* ছিল তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯৭৫ সালে'বাকশাল' গঠনের মাধ্যমে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রায় আড়াইশ সাংবাদিক ও প্রেসকর্মী এর ফলে বেকার হয়ে পড়েন।

১৯৭২-এর জানুয়ারিতে বিভক্তির পর সারা দেশে ছাত্রলীগের দুটি সংগঠন পরস্পর বিরোধী ও সংঘাতমূলক অবস্থানে চলে যায়। দেশের বিভিন্ন স্থানে দুই গ্রুপের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষও ঘটতে থাকে। ১৯৭৩-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে রবপন্থী ছাত্রলীগের আ ফ ম মাহবুবুল হকের নেতৃত্বাধীন প্যানেলের

বিপুল ভোটে জয়লাভের সম্ভাবনা দেখে হলে হলে ব্যালট বাক্স ছিনতাই করা হয়। অভিযোগ করা সত্ত্বেও মুজিব ভাই এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নিলেন না। এ সময় শ্রমিকদের নিয়ে 'লাল বাহিনী' গঠন করে তাদেরকে অত্যাচারের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হলো। মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিছুটা শীতল হলেও তখনও পর্যন্ত আমাদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। আমি তাঁকে নিরপেক্ষ থাকার জন্য অনুরোধ করি। মাঝে মধ্যে মনে হতো তিনি বুঝি বা নিরপেক্ষ। আবার দেখতাম ছাত্রলীগের এক পক্ষকে (নূরে আলম সিদ্দিকী) শর্তহীন আশীর্বাদ দিয়ে যাচ্ছেন।

আমি মুজিব ভাইকে বারবার কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য অনুরোধ করি। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে সারা দেশে 'কৃষক ব্রিগেড' গড়ে তোলা হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশেও তিনি 'কৃষক ব্রিগেড' গড়তে রাজি ছিলেন। একদিন হঠাৎ সংবাদপত্রে দেখলাম আবদুর রব সেরনিয়াবাতকে প্রেসিডেন্ট করে কৃষক লীগ গঠন করা হয়ে গেছে। আমি মুজিব ভাইকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, 'এটা মনি করেছে।' আমি তাঁর এ কথাটি গ্রহণ করতে পারলাম না। মনে হলো আমাদের পথ আলাদা হয়ে যাচ্ছে। অনন্যোপায় হয়ে আবদুল মালেক শহীদুল্লাহকে সভাপতি ও হাসানুল হক ইনুকে সাধারণ সম্পাদক করে আমরা পৃথক কৃষক লীগ গঠন করি।

এদিকে ১৯৭২-এর অক্টোবরে শেখ মনিকে সভাপতি ও মোস্তফা মোহসীন মন্টুকে সাধারণ সম্পাদক করে 'যুবলীগ' গঠিত হয়। আমরা 'নিউক্লিয়াস'-এর তিন সদস্য (আমি, রাজ্জাক ও কাজী আরেফ) এ নিয়ে আলোচনায় বসি। তখন আর 'বিএলএফ' কার্যকর ছিল না। দীর্ঘ সময় ধরে আমরা আলোচনা করলাম। এ জটিল পরিস্থিতিতে কী করণীয় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে দেখলাম যে, আমাদের 'নিউক্লিয়াস'-এরই সদস্য আবদুর রাজ্জাক আমাদের চাইতে শেখ মনির গ্রুপের প্রতি অধিক সহানুভূতিসম্পন্ন এবং মুজিব ভাইয়ের প্রতি আনুগত্যে একেবারে অন্ধ। ১৯৬২-তে 'নিউক্লিয়াস' গঠনের পর থেকে দীর্ঘ ১০ বছর আমাদের তিনজনের মধ্যে কখনো কোনো বিষয়েই মতপার্থক্য ঘটেনি। এই প্রথম আমাদের মধ্যে ভিন্নমত দেখা গেল।

এরকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় রাজ্জাকও উদ্বেগ প্রকাশ করলো। আমি ও আরেফ আমরা দুজনও 'নিউক্লিয়াস'-এর মধ্যে এভাবে ভিন্নমত দেখা দেওয়াতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। বহু আলোচনার পর আমরা রাজ্জাককে মুজিব ভাইয়ের পক্ষে থাকার এবং রাজনীতিতে পুরোপুরিভাবে সক্রিয় হবার ব্যাপারে অনুমতি দিলাম। একই সঙ্গে আমরা এই সিদ্ধান্তও নিলাম যে, পরস্পর বিরোধী শিবিরে অবস্থান করলেও আমাদের দুজনের সঙ্গে রাজ্জাকের সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। মনির নেতৃত্বে যুবলীগ গঠিত হওয়াতে আমাদেরও বিকল্প সংগঠন গড়ে তোলা ছাড়া উপায় ছিল না। এর প্রধান দুটি কারণ : প্রথমত সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসা হাজার হাজার 'বিএলএফ' সংগঠক, কর্মী ও সদস্য সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা মনির যুবলীগের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয় কারণটি ছিল আরও জটিল। আমি আওয়ামী লীগের কোনো পদে ছিলাম না। এমনকি সদস্যও নয়। সে অবধি রাজনীতিতে আমার ভূমিকা এবং সশস্ত্র যুদ্ধে আমাদের অংশগ্রহণ আওয়ামী লীগ বা কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ হয়ে ছিল না। পরিস্থিতি যখন এ রকম তখন যে সমস্যাটি সবচেয়ে প্রকট হয়ে দেখা দিল তা হলো, আমাদের পক্ষের হাজার হাজার কর্মী-সংগঠক কী করবে? আদর্শগত দিক থেকে মনি এবং আমি দুটি আলাদা স্রোতের মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই মনি মুজিব ভাইয়ের পক্ষে থাকবে। অথবা বলা যায়, মুজিব ভাই মনির পক্ষে থাকবেন।

আমার চিন্তায় তখন যে বিষয়টি প্রাধান্য পেল তা হচ্ছে, আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বে একটি যুব সংগঠন গড়ে তোলা যায় কিনা তা দেখা। তা না হলে আমাদের হাজার হাজার সংগঠক, কর্মী ও সমর্থকরা কোথায় যাবে? তারা কি আওয়ামী লীগ করবে? তা তো সম্ভব নয়। তাহলে তাদের জন্য একটি রাজনৈতিক স্পেস (স্থান) সৃষ্টি করা খুবই জরুরি এবং সেটা হতে পারে একটি নতুন রাজনৈতিক সংগঠন।

সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের দিনগুলোতে আওয়ামী লীগ নেতাদের রাজনৈতিক চরিত্র ও নৈতিকতার যে চিত্র আমাদের সংগঠকরা দেখেছে, তাতে তাদের পক্ষে আওয়ামী লীগ করার কোনো প্রশ্নই আসে না। মুজিব ভাইও নিরপেক্ষতা বজায়

না রেখে মনি ও নূরে আলম সিদ্দিকীর দিকে ঝুঁকতে থাকেন। মোটকথা, নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের পর মাঠ পর্যায়ে তখন অন্য একটি রাজনৈতিক-দার্শনিক পরিস্থিতি দৃশ্যমান হয়ে উঠলো।

সারা দেশে তখনকার সাংগঠনিক পরিবেশে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের অব্যবহিত নিচের স্তরের কর্মী-সংগঠকদের শতকরা আশি ভাগই ছিল আ স ম আবদুর রবের সমর্থক। আওয়ামী লীগ থেকে সম্ভবত তাদের হাই কমান্ড মনে করতে থাকলো যে, ঐ সময় সারা দেশে সকল স্তরের আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে যারা আসবে তাদের প্রায় সবাই হবে রব গ্রুপের। এমন অবস্থা হোক, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব কোনোভাবেই সেটা চাননি। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই রব গ্রুপের মেধাসম্পন্ন অনেক সংগঠক সশস্ত্র গ্রুপের হত্যাকাণ্ডের শিকার হলো। সে সময়ের প্রশাসন সশস্ত্র গ্রুপগুলোকে প্রচ্ছন্ন বা সরাসরি সহায়তা দান করতো।

এ জটিল পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় নির্ধারণ করার জন্য আমি 'নিউক্লিয়াস' ও 'বিএলএফ'-এর উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন বোধ করলাম। দীর্ঘ আলোচনার পর রাজনৈতিক দল গঠন করা ছাড়া ঐ পরিস্থিতি মোকাবেলার আর কোনো উপায় আছে বলে আমাদের মনে হলো না। নতুন রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার বিষয়ে আমি ও আরেফ একমত হই। কৌশল হিসেবে এ ব্যাপারেও আমরা একমত পোষণ করি যে, আমাদের নবগঠিত রাজনৈতিক দল কোনোভাবেই মুজিব বিরোধী ভূমিকা নেবে না। তবে রাজনৈতিকভাবে এ দল আওয়ামী লীগের বিরোধী হবে।

আদর্শগত দিকটি নিয়ে আলোচনার পর আমরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে দলের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করলাম। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জেগে ওঠা একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর সমগ্র জনগণকে যাতে শ্রেণিশোষণের হিংস্রতার মুখে পড়ে থাকতে না হয় তার জন্য আমরা 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'কে আমাদের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিই। রবপন্থি ছাত্রলীগ 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে সুসংগঠিত হতে থাকে। এরপর প্রশ্ন দেখা দেয়, নতুন রাজনৈতিক দলটিকে কোন আদলে দাঁড় করানো যায়।

অতীতে রাজনৈতিক দলগুলো যেভাবে গড়ে উঠেছে, সে পুরানো সাংগঠনিক ও আদর্শিক চরিত্র বজায় রেখে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সদ্য বেরিয়ে আসা বাংলাদেশের বিরাট যুবশক্তিকে নতুন কোনো রাজনৈতিক সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে না। এছাড়া, সেই একই সশস্ত্র সংগ্রামের কারণে জনগণের বিভিন্ন অংশ নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, এই পরিবর্তিত বাস্তবতাও আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে। যেমন:

১. যুব সমাজ, যারা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল শক্তি। রাজনীতি সচেতন আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা এর অন্তর্ভুক্ত।

২. নিয়মিত সৈনিক, যারা স্বাধীনতার সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছে।

৩. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা।

৪. জনপ্রিয় এবং কলুষমুক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

এ চার ক্যাটাগরি থেকে ছয়জনকে নিয়ে ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল'-এর আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। মেজর জলিল ও আ স ম আবদুর রব হন সে কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক। আহ্বায়ক কমিটির অন্য সদস্যরা ছিলেন শাজাহান সিরাজ, সুলতান উদ্দিন আহমদ, বিধান কৃষ্ণ সেন, নূরে আলম জিকু ও রহমত আলী (পরে তিনি আওয়ামী লীগে ফিরে যান)। যুবলীগ গঠনের পর মাত্র চার-পাঁচদিন সময়ের মধ্যে এর চাইতে ভিন্ন কিছু করা সম্ভব ছিল না। আমরা ভাবলাম, কিছু দিনের মধ্যে সম্মেলন অনুষ্ঠান করে এ আহ্বায়ক কমিটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দলে রূপান্তর করা যাবে, অর্থাৎ তার জন্য প্রয়োজনীয় সময় আমরা পাব।

## জাসদের আদর্শ

অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ে কী চরিত্র নিয়ে নতুন রাজনৈতিক দলটি সংগঠিত হতে যাচ্ছে সে চিন্তাভাবনা আমাকে আলোড়িত করে। আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি :

১. যে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে দেশ স্বাধীন হলো সে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' দলের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে থাকতে হবে।

২. জাতীয়তাবাদকে ধারণ করার পাশাপাশি আমাদেরকে সমাজতন্ত্রের অভিমুখে নিজেদের চালিত করতে হবে।
৩. বাংলাদেশের জনগণের অভ্যন্তরীণ নানা পার্থক্য ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।
৪. সদ্য সশস্ত্র সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসা যুবসমাজ স্বভাবতই হবে স্বাধীনচেতা। সেই যুব সমাজকে প্রধান শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেই দলকে সংগঠিত করতে হবে।
৫. আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এ সংগঠন যাতে কোনো বিশেষ দেশ বা শক্তির ক্রীড়নকে পরিণত না হয়, তাও বিবেচনায় রাখতে হবে।

উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়কে প্রধান শর্ত হিসেবে বিবেচনা করে সারা দেশে গড়ে উঠতে লাগলো জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা 'জাসদ'-এর সংগঠন।

এ সময় কোনো কোনো মহল 'জাতীয় সমাজতন্ত্র' কথাটার সঙ্গে নাৎসিদের 'ন্যাশনাল সোস্যালিজম'-এর মিলের উল্লেখ করে নতুন এই দলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে। তবে তাদের সে অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই নবগঠিত এ দলটি জনগণের মধ্যে বিপুল আগ্রহ এবং যুবসমাজের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। সে সময়কার প্রতিষ্ঠিত দলগুলো, বিশেষ করে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) সরকারকে নিঃশর্ত সমর্থন দিচ্ছিল। অন্যদিকে সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টি সরকারের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করছিল। জাসদ ও সর্বহারা পার্টির রাজনৈতিক কর্মসূচি সরকার ও আওয়ামী লীগকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। জাসদ মূলত হরতাল বা ধর্মঘটের কর্মসূচি দিয়ে এবং সর্বহারা পার্টি সশস্ত্র উপায়ে সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

মুজিব ভাইয়ের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও কিছু কিছু ভুল সিদ্ধান্তের সুযোগ নিয়ে তাঁরই দলের অভ্যন্তরে ঘাপটি মেরে থাকা একটি গোষ্ঠী সুকৌশলে সেনাবাহিনীর একাংশকে কাজে লাগিয়ে তাঁকে ও সে-সময় বিদেশে থাকা তাঁর দুই কন্যা বাদে পরিবারের আর সবাইকে হত্যা

করে। এভাবে মুজিব ভাইকে সরিয়ে তাঁর দলই খন্দকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়েও শাসকশ্রেণির মধ্যে একইভাবে ক্ষমতার পালা বদল চলতে থাকে। পঁচাত্তরের সেই বিয়োগান্তক হত্যাকাণ্ডের সময় জাসদ নেতৃত্বের সবাই ছিলেন কারাগারে। এর আগে দলটির হাজার হাজার কর্মী, সংগঠক ও সমর্থক 'রক্ষীবাহিনী'র অত্যাচারের শিকার হয়।

পাকিস্তান থেকে ফেরত আসার পর শেখ মুজিবুর রহমান নামের যে মানুষটি—তাঁর জন্য কোনো পদ বা বিশেষণের প্রয়োজন ছিল না। গান্ধী ও মাও সে তুং-এর মতোই তাঁর দেশের মানুষের কাছে তো বটেই, বিশ্বের কাছেও তিনি ছিলেন একজন অতি মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী। অথচ দুঃখজনকভাবে প্রধানমন্ত্রী হওয়াটাই তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিল। এ বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ আমাকেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চায়।'

যেদিন তিনি গণভবন (সুগন্ধা) ছেড়ে ৩২ নম্বরকে প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর ও পরে রাষ্ট্রপতির বাসভবন হিসেবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন, তা যে নিরাপত্তার দিক থেকে একেবারেই দুর্বল—এ কথা আমি তাঁকে বারবার বলার পরও, তিনি তা অগ্রাহ্য করলেন।

মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ তাঁর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মাসখানেক আগে। 'বাকশাল' গঠন প্রশ্নে আমি কখনোই তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারিনি। সম্ভবত তিনি বাকশালকে তাঁর রাজনীতির নতুন কৌশল হিসেবেই নিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে 'জাতীয় সরকার' গঠন আর ১৯৭৫-এ 'বাকশাল' গঠন যে এক কথা নয়, তা তিনি সম্ভবত অনুধাবন করতে পারেননি।

শেষ সাক্ষাতে তিনি আমাকে ভারতে চলে যেতে বললেন। তখন বাকশাল কায়েম হয়েছে। আমি তাঁর কাছে ঢাকার সর্বমহলে সামরিক শাসনের গুঞ্জনের কথা তুলতেই তিনি বললেন, 'আমি জানি, ওটা আমার বিরুদ্ধে নয়। ওটা তাজউদ্দীনদের বিরুদ্ধে।' এটি শুনে আমি নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি আরও বললেন, 'বেশি কিছু হলে তারা

আমাকে রেখেই যা করার করবে। আর তার চেয়ে বেশি খারাপ কিছু হলে আমাকে মনপুরায় নিয়ে রাখবে।'

আমার মনে হলো, এ কী শুনছি?

১৯৭৫-এর আগস্টের এক বা দুই তারিখে আমি ভারতে গেলাম। এরপরেই ঘটলো দুঃখজনক ১৫ আগস্ট। বেলা ১১টার দিকে রেডিওতে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা শুনলাম। তখন আমি কোলকাতায়। ঘটনাটিকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারিনি। তাঁর পরিণতি রাজনৈতিকভাবে না হয়ে, এভাবে যে মর্মান্তিকভাবে হলো, আর সেটাও পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ—এ সত্যটি মেনে নিতে আমার খুবই কষ্ট হয়েছে। কারো রাজনৈতিক বিরোধিতা আর তাঁকে সপরিবারে হত্যা দুটো এক জিনিস নয়।

ভারতে আমার ভিসার মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ায় আমি ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করেছিলাম। তার জন্য পাসপোর্ট জমা দিই। পাসপোর্ট জমা দেওয়ার ১৫ মিনিট পরই আমাকে অফিসের ভেতরে ডেকে নিয়ে যায়। একজন বড় অফিসারের সামনে বসতে দেওয়ার পর তিনি আমাকে বললেন, 'আপনার তো পাসপোর্ট বাতিল করা হয়েছে।' আমি বিষয়টি বুঝতে না পারায় অফিসার বললেন, 'আপনার তো পাসপোর্ট এখন বৈধ না। কারণ আপনাকে পারসোনা নন-গ্রাটা (অবাঞ্ছিত ব্যক্তি) ঘোষণা করা হয়েছে।' আমি জানতে চাইলে আরও বললেন, 'বৈধ পাসপোর্ট না হলে ভিসা দেওয়া যায় না। হয় আপনি ভারত ছেড়ে খুব তাড়াতাড়ি চলে যান, নতুবা নতুন পাসপোর্ট সংগ্রহ করুন।' আমি দিল্লিতে আমাদের হাইকমিশন অফিসে যোগাযোগ করতেই বলা হলো, ১১ আগস্ট আমার পাসপোর্ট বাতিল করা হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে জিয়ার শাসনামলেও সরকারি দমননীতির পাশাপাশি জাসদ এক রাজনৈতিক কূটকৌশলের শিকার হয়। এ সময় দল ভাঙাভাঙির সরকারি ষড়যন্ত্রে জাসদ বিভক্ত হয়। আমি নিজে কখনো কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হইনি। এটি আমার ঘোষিত নীতি। তবে আমি জেলে থাকার সময়

(১৯৭৯-'৮১) একবার জাসদ আমাকে তাদের সংগঠনভুক্ত করে। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে আমি পদত্যাগ করে আমার অদলীয় রূপ বজায় রাখি।

## ছাত্রলীগের বিভক্তির মধ্য দিয়ে নতুন রাজনীতির যাত্রা শুরু

জাসদ গঠনের অব্যবহিত পরের কয়েকমাস সময় ছিল দেশের জন্য খুবই ঘটনাবহুল। দলীয়ভাবে সরকারের কিছু কিছু কার্যক্রম দেশে দারুণ অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে। পরিত্যক্ত বাড়িঘর দখল, ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে লাইসেন্স-পারমিট নিয়ে তা বিক্রি করা ছিল ক্ষমতাসীনদের কাজ। সে সময়ে সরকার সমর্থক ছাত্রলীগকে 'মুজিববাদী ছাত্রলীগ' বলা হতো এবং ছাত্রলীগের উভয়গ্রুপের কর্মীদের মধ্যে প্রায়ই মারামারি হতো। জাসদ নেতৃবৃন্দকে জেলে না পুরে বরং জাসদ সমর্থক বিরাট জনগোষ্ঠীকে রক্ষীবাহিনী দিয়ে নির্যাতন, হয়রানি ও অত্যাচারের মাত্রা ক্রমে বাড়তে থাকে। সরকার ও সরকারি দলের কৌশল ছিল জেলা-মহকুমা পর্যায়ের জনপ্রিয় জাসদ নেতৃবৃন্দকে আঘাত না করে কর্মী-সমর্থকদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে তাদেরকে নিজেদের দলে ভেড়ানো। এ কৌশল প্রয়োগ করে তারা অনেকখানি সফলও হতে শুরু করেছিল।

আমরা তখন জাসদ রাজনীতিকে এককেন্দ্রিকতা থেকে সরিয়ে একাধিক অংশে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ঠিক করলাম, জাসদ হবে প্রকাশ্য রাজনীতির ধারক। জাসদ রাজনীতির মূল নিয়ামক শক্তি হিসেবে ১৯৬২ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত 'নিউক্লিয়াস' ও 'বিএলএফ'-এর সঙ্গে যুক্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিদেরকে গোপনে সংগঠিত করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে সারাদেশ থেকে বেছে বেছে সত্তর-আশিজনকে নিয়ে 'সেন্ট্রাল অর্গানাইজিং কমিটি' (সিওসি) গঠন করা হলো। এছাড়া গোপনভাবে কাজ করা ও আদর্শিক দিক-নির্দেশনার জন্য এগারজনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন এবং 'লড়াই' নামে একটি প্রকাশনার মাধ্যমে সংগঠনের প্রকাশ্য ও গোপন কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শামসুদ্দিন পেয়ারাকে 'লড়াই' সম্পাদনার দায়িত্ব দেয়া হয়।

এ সময় তৃণমূল পর্যায়ে সরকার দলীয় কর্মী ও রক্ষী বাহিনীর নির্যাতনের মুখে জাসদের অনেকের মধ্যেই আওয়ামী লীগে যোগদানের একটি প্রবণতা দেখা দেয়। সে অবস্থায় জাসদকে সংগঠিত রাখার লক্ষ্যে আমরা কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করি। যার অন্তর্ভুক্ত ছিল আওয়ামী লীগকে ব্যস্ত রাখা, পাকিস্তানপন্থি অযোগ্য আমলাদের পরিচয় জনগণের সামনে প্রকাশ করা, দলের কিছু শক্ত ঘাঁটি তৈরি করা, পর্যায়ক্রমে ঢাকাসহ জেলা ও মহকুমাগুলোয় প্রাত্যহিক আন্দোলনের ধারা সৃষ্টি করা। তারপর এ দুইয়ের সমন্বয়ে অর্থাৎ শক্ত ঘাঁটি ও শহরে উপর্যুপরি আন্দোলনের ধাক্কা সৃষ্টি করে আওয়ামী লীগ সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। এ কৌশলের অংশ হিসাবে 'সিওসি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা শহরের বাইরে সারা বাংলাদেশে ঘাঁটি আকারে গড়ে তোলার জন্য ৪০টি স্থান নির্দিষ্ট করা হয়। এ জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়। এ ব্যাপারে প্রস্তুতিও সমানভাবে চলতে থাকে।

আওয়ামী লীগ সরকারের অনিয়মের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য জনসভা ও মিছিলকে প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে জাসদ-এর নেতৃত্বে সারাদেশে জেলা, মহকুমা ও থানা পর্যায়ে নিয়মিত সভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯৭৪-এর অক্টোবর-নভেম্বরে আওয়ামী লীগ সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার সময় নির্ধারণ করে আন্দোলনের এ পর্যায়ে ১৭ মার্চ ১৯৭৪ ঢাকায় বড় আকারে জনসভা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সেদিন কর্মসূচি অনুযায়ী পল্টনে বিরাট জনসভা শেষে মেজর জলিল ও আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বে একটি মিছিল মন্ত্রিপাড়ায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলীর বাসার সামনে উপস্থিত হয়। মিছিলটি ছিল একেবারেই শান্তিপূর্ণ। অথচ কোনো রকম উস্কানি ছাড়াই পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী সে মিছিলে বেপরোয়াভাবে গুলিবর্ষণ শুরু করে। গুলিতে জাসদ-এর এগারজন কর্মীর মৃত্যু ঘটে। মেজর জলিল ও আ স ম আবদুর রব গ্রেফতার হন। রক্ষীবাহিনী, পুলিশ ও বিভিন্ন বাহিনীর এই

সংঘবদ্ধ আক্রমণ সহ্য করা নিরস্ত্র কর্মীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। জাসদ কর্মী ও সমর্থকরা এক ধরনের কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থার মধ্যে পতিত হয়। আন্দোলনে ভাটা পড়ে। এ অবস্থায় সরকার পদত্যাগের বাধ্য করার আন্দোলন-কর্মসূচি পরিবর্তন করা হয়।

গ্রেফতারের বাইরে থাকা নেতৃবৃন্দ অতঃপর লোকচক্ষুর আড়ালে অর্থাৎ গোপন অবস্থানে (আন্ডারগ্রাউন্ড) চলে যান। প্রকাশ্য রাজনীতি সীমিত হয়ে আসতে থাকে। দলের তরফে এ সময় গোপন রাজনীতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। জেলা ও মহকুমা শহরগুলোতে ছাত্রদের মধ্যে জাসদের আদর্শকে কেন্দ্র করে কর্মপরিধি বাড়ানো হয়। শ্রমিকদের সমর্থনের জন্য তাদের মধ্যেও গোপন রাজনীতি অব্যাহত রাখা এবং দ্রুততার সঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

গ্রাম পর্যায়ে কৃষি-মজুর ও কৃষকদের সমর্থন লাভের জন্য 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এ 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী'র কাজ ছিল গ্রামের গরিব কৃষককে জমিজমার কাজে সহায়তা করা। কীভাবে চাষাবাদ করলে গরিব ও প্রান্তিক চাষীরা তাদের উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনতে পারবে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য থেকে সাধারণ কৃষকরা রক্ষা পেতে পারে তার উপায় খুঁজে বের করা। 'সিওসি' পর্যায়ে বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করা এবং তা যেন কার্যকর করা যায় তার ব্যবস্থা করা। এর ফলে জাসদের পক্ষে গ্রামের কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের সমর্থন বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষ করে ক্ষেতমজুর, ছোট কৃষক এবং বর্গাচাষীদের মধ্যে 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী'র কাজের ফলে জাসদের রাজনীতির প্রতি তাদের আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছিল। সে কারণে 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী'র সদস্যদের নির্যাতন করা হয় ও বিভিন্ন অজুহাতে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা শুরু হয়। বগুড়া, পাবনা, রংপুর, যশোর, খুলনা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও নোয়াখালীতে 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' সদস্যরা এই ধরনের অত্যাচারের শিকার বেশি হয়। এ সময় কোনো কোনো স্থানে রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী'র সদস্যদের মুখোমুখি সংঘর্ষও হয়। সে সময় আত্মরক্ষার জন্যই 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' কোথাও কোথাও রক্ষীবাহিনীর কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয় এবং তারা তিনটি থানার (মাদারীপুরের

রাজের, টাঙ্গাইলের ঘাটাইল ও বগুড়ার ধুপচাঁচিয়া) অস্ত্র লুট করে। মাদারীপুরে শাহজাহান খানের নেতৃত্বে এই থানা লুট হয়। এছাড়াও 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও বগুড়ার ধুপচাঁচিয়া থানার কয়েকজন ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়ি থেকে টাকা আদায় করেছিল। সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' রুখে দাঁড়ানোর কারণেও 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী'র বহু সদস্যকে রক্ষীবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এ পর্যায়ে 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' প্রশাসনের কাছে 'গণবাহিনী' নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তী সময়ে এটি 'বিপ্লবী গণবাহিনী' নামে পরিচিত হতে থাকে, যদিও 'সিওসি' অথবা জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটি কখনও এ নামের কোনো সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেনি কিংবা কাউকে তা করার অনুমতি দেয়নি।

'গণবাহিনী'র নামে সে সময়ে নানা ধরনের সত্য-মিথ্যা রটনা ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৬-এর সেপ্টেম্বরে সিওসির শেষ মিটিংয়ে (ঢাকায় সাইদ ভাইয়ের বাসায়) 'গণবাহিনী'র কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। বাস্তবে 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী'র কার্যক্রমকেই গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ 'গণবাহিনী'র কার্যক্রম বলে মনে করতো। এটি ছিল জাসদ সম্পর্কিত গণবিভ্রান্তির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সিওসির কোনো রকম অনুমোদন ছাড়াই এবং তাদের অজান্তেই বিচ্ছিন্নভাবে 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী'র কিছু কিছু সদস্য কোথাও কোথাও কিছু কিছু অঘটন ঘটিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে থানা আক্রমণ ও বিত্তশালীদের কাছ থেকে জবরদস্তিমূলক অর্থ আদায়।

'গণবাহিনী'র কার্যক্রম স্থগিত হওয়ার কিছুদিন আগে ঢাকা শহরে 'গণবাহিনী'র নাম ব্যবহার করে কিছু কর্মকাণ্ড এই শহরের অধিবাসীদের মধ্যে এক আতঙ্কজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ১৯৭৫-এর নভেম্বর নাগাদ এসব ঘটনা ঘটানো হয়েছিল, যার সঙ্গে কেন্দ্রীয় জাসদ বা সিওসি'র কোনো যোগাযোগ ছিল না। যেমন : হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিস্ফোরণ, বায়তুল মোকাররমে সাইকেল বোমা, কয়েকটি বাসে যাত্রী নামিয়ে দিয়ে আগুন লাগানো, জিয়াউল আবেদিনকে গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট সন্দেহ করে 'সিওসি'র

অনুমোদন ছাড়া হত্যা করা। ২৬ নভেম্বর ভারতীয় হাইকমিশনারো ওপর সশস্ত্র আক্রমণসহ বেশ কয়েকটি ঘটনাও এভাবেই ঘটেছিল। এসব কোনো ঘটনাই 'সিওসি'কে জানিয়ে বা তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হয়নি। আসলে অতিউৎসাহী কিছু যুবক নিজেদের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণে 'গণবাহিনী'র নাম ব্যবহার করেছিল। ভারতীয় হাইকমিশনে অভিযানের ব্যাপারে কোনো কেন্দ্রীয় অনুমোদন যে ছিল না শুধু তাই নয়; যারা সেই হামলা করেছিল তাদের আট-দশজনের বাইরে অর কেউ এ বিষয়ে কিছু জানতোই না।

## বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা

গণঅভ্যুত্থানের পরিস্থিতি সৃষ্টি না হওয়ায় আমরা রাজনীতির ভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করি। এর মধ্যে প্রধান হলো, সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' গড়ে তোলা। ১৯৭৩-এর মাঝামাঝি থেকে জাসদ সভাপতি মেজর জলিলের নেতৃত্বে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের প্রায় সব ইউনিটে এবং বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'র সংগঠন গড়ে ওঠে।

ঢাকার চারপাশে প্রায় ৪০টি স্থানে ঘাঁটি গঠন এবং ঢাকাসহ জেলা ও মহকুমা শহরে গণবিস্ফোরণমূলক আন্দোলন গড়ে তুলে সরকারের পতন ঘটানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবার পর ক্ষমতা দখলের ভিন্ন একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সেটি হলো, সেনাবাহিনীর মধ্যে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'র নেতৃত্বে সিপাহীদের অভ্যুত্থান এবং যুগপৎভাবে সে অভ্যুত্থানের সমর্থনে ঢাকাসহ শহর এলাকায় ছাত্র-যুবক এবং শ্রমিকদের গণঅভ্যুত্থান ঘটানো। এভাবে ছাত্র ও শ্রমিকদের গণঅভ্যুত্থান ও 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'র নেতৃত্বে সেনা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখল করা।

ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে পরিচালিত আমাদের এ অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল ৩ নভেম্বর খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে সংঘটিত সেনাঅভ্যুত্থান ও তার মাধ্যমে সামরিক বাহিনীতে তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়ায় যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সুযোগকে কাজে লাগানো।

কর্ণেল আবু তাহেরের ওপর এ অভ্যুত্থানের নীলনকশা প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সে লক্ষ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য ৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় সিওসির একটি বৈঠক বসে। সেখানে কর্ণেল তাহের তার পুরো পরিকল্পনাটি তুলে ধরেন। আলোচনার শেষ পর্যায়ে জিয়াউর রহমানের অবস্থান কী, এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি ইংরেজিতে বলেন, 'He will be at my knees' (সে আমার হাঁটুতে পড়ে থাকবে)। এরপর আমি পরিকল্পনা অনুযায়ী অভ্যুত্থান ঘটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমিটিকে পরামর্শ দিই এবং কমিটি তা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে। সভার শেষে বিদায়ের সময় আমি কর্নেল তাহেরকে বললাম, 'কোনো অবস্থায় যেন এটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানে পরিণত না হয়।' তিনি বললেন, 'It will happen right at one O'clock'.(রাত ঠিক ১টায় এটি ঘটবে)।

অভ্যুত্থানের পর ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম যে কথাটি ঘোষণা করা হলো তা ছিল, "বাংলাদেশের বীর বিপ্লবী জনগণ, 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' ও 'বিপ্লবী গণবাহিনী'র নেতৃত্বে বাংলাদেশে 'সিপাহী-জনতার বিপ্লব' সংঘটিত হয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা হয়েছে। জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করা হয়েছে।" বাংলাদেশ বেতার তখন শাহবাগে। সেখান থেকে শামসুদ্দিন পেয়ারা টেলিফোনে আমার নির্দেশ মতো এ ঘোষণাটি লিখে তা স্বকণ্ঠে বেতারে প্রচার করে।

এরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে সারাদেশের বেশ কয়েকটি জেলায় পুলিশ, আনসার ও বিডিআর সদস্যরা গণবাহিনীর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়। কয়েক ঘণ্টা বিলম্বে হলেও ঢাকা শহরে ছাত্রদের এবং ঢাকার আশেপাশে সৈনিকদের মিছিল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের দিকে আসতে থাকে। সিওসি হাই কমান্ডের সিদ্ধান্ত ছিল জিয়াউর রহমান ও কর্ণেল তাহেরের সঙ্গে বিপ্লবী সৈনিকরা শহীদ মিনারে এসে ছাত্র-শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিত হবে। সেখানে 'কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল' গঠন হবে। কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সৈনিকদের প্রস্তাবিত ১২-দফা মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে। এবং কমান্ড কাউন্সিলের পরিকল্পনা অনুযায়ী 'জাতীয় সরকার' গঠন করা হবে।

কিন্তু এ সময়ই খন্দকার মোশতাক আহমেদের সমর্থক এক দল আমলা ও সেনাকর্মকর্তা আমাদের এ সব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। জিয়াউর রহমানও সেই বাধার বিরুদ্ধে কিছু করতে না পেরে তাদের সহযোগিতা করলেন।

৩ নভেম্বর খালেদ মোশারফের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান পদ গ্রহণ করার বিষয়টি সাধারণ সৈনিক ও বেশিরভাগ অফিসারের মনঃপুত ছিল না। খালেদ মোশারফ যে জিয়াউর রহমানকে বন্দি করলেন সেটিও সাধারণ সৈনিক ও বেশির ভাগ অফিসার মেনে নিতে পারলেন না। এতে সেনাবাহিনীতে এক অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হয়। তার ফলে রাষ্ট্রক্ষমতায় কেবল বিশৃঙ্খলাই নয়, এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় আমরা মনে করি, এটাই আমাদের (জাসদ, গণবাহিনী, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা) ক্ষমতা গ্রহণের উপযুক্ত সময়। নভেম্বরের সে কয়দিন ঢাকা শহরে এবং শ্রমিক এলাকাগুলোতে ছাত্র-যুবক এবং শ্রমিকরা গণআন্দোলনের স্রোত সৃষ্টি করে।

৪ নভেম্বর সন্ধ্যায় আমি, ড. আখলাকুর রহমান ও কর্ণেল তাহের লালমাটিয়ায় আখলাকুর রহমান সাহেবের বাসায় মিলিত হই। এই প্রথমবারের মতো 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'র সৈনিকদের সংগঠিত অবস্থার কথা ড. আখলাক ও কর্ণেল তাহেরকে জানাই। ১৯৭৪-এর ১৭ মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়িতে স্মারকলিপি দিতে গিয়ে জলিল-রবের গ্রেফতারের পর 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'র কাজ সমন্বয়হীন হয়ে পড়ে। মেজর জলিল এ দায়িত্ব পালন করতেন। ক্যান্টনমেন্টে তাঁদের নিজস্ব একটি 'কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল' ছিল।

আমরা তিনজন (আমি, আখলাক, তাহের) মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, দেশে তখন যে অনিশ্চয়তা ও ক্ষমতাবলয়ে যে শূন্যতা বিরাজ করছিল, তা থেকে দেশকে রক্ষা করতেই বাইরের ছাত্র-যুবক-শ্রমিক এবং ভেতরের সৈনিক সংস্থার যোগসাজশে একটি বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটানো অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। ড. আখলাক ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে যোগাযোগের লিঙ্ক প্রতিষ্ঠা ও তার জন্য 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'র সহায়তার কথা তুললে কর্ণেল তাহের বললেন, 'I shall find it out' (আমি সেটা খুঁজে বের করবো)।

কর্ণেল তাহের এরপর ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'র নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হলেন। প্রশ্ন উঠলো, কে ছাত্র-শ্রমিক-সৈনিকদের এ অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে থাকবেন? তখনকার পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই জিয়াউর রহমানের নাম আসে। এ ব্যাপারেও কর্ণেল তাহের বললেন, 'I can handle that too' (আমি সে ব্যাপারটাও সামলাতে পারবো)।

নভেম্বরের ৪, ৫ ও ৬ তারিখ অভ্যুত্থানের আয়োজন ও প্রস্তুতিতে চলে গেল। এর মধ্যেই 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'র মাধ্যমে কর্ণেল তাহেরের কাছে জিয়াউর রহমান বার্তা পাঠালেন, 'Free me Taher, save me' (তাহের আমাকে মুক্ত কর, আমাকে বাঁচাও)।

কর্ণেল তাহের এসব ঘটনা আমাদের কাছে রিপোর্ট করলেন এবং সৈনিক সংস্থার মাধ্যমে একটি সফল বিপ্লব যে ঘটানো সম্ভব, তাও বললেন। এ বিষয়ে সৈনিক সংস্থার সঙ্গে তাঁর আলোচনা ও বিস্তারিত পরিকল্পনার কথাও জানালেন। এসব প্রস্তুতির আলোকে ৬ নভেম্বর রাত একটায় (৭ তারিখ) অভ্যুত্থানের সময় নির্ধারণ করা হয়। ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যান্টনমেন্টের বাইরে ছাত্র-শ্রমিকদের মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদি ঘটিয়ে সেনাবিদ্রোহের সঙ্গে তাকে একাকার করে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী সংযোগ স্থাপনে এ শক্তিসমূহ প্রচণ্ড ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, ৭ নভেম্বরের ভোর বেলা (অনুমান ৬টার দিকে) জিয়াউর রহমান ও কর্ণেল তাহেরের নেতৃত্বে ক্যান্টনমেন্ট থেকে সামরিক অফিসার ও সৈনিকরা ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া যান ও অন্যান্য সামরিক বাহন নিয়ে শহীদ মিনারে আসবে। একই সময়ে ছাত্র-যুব-শ্রমিকরাও তখন শহীদ মিনারে উপস্থিত হবে। ছাত্ররা আসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার বিভিন্ন কলেজ থেকে। আর শ্রমিকরা মূলতঃ আদমজি, তেজগাঁও ও পোস্তগোলা থেকে মিছিল করে শহীদ মিনারে আসবে। ওখানেই 'বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিল' গঠন ও ঘোষণা করা হবে। পরবর্তী ধাপে কমান্ড কাউন্সিলের অধীনে সকল রাজনৈতিক দল, সৈনিক, শ্রমিক ও ছাত্র-যুবকদের নিয়ে 'জাতীয় সরকার' গঠন করা হবে।

ক্যান্টনমেন্টের ব্যারাকগুলোতে এ সময় 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' ছাড়াও স্বার্থান্বেষী আরো কিছু গোষ্ঠী অতিদ্রুত সক্রিয় হয়ে উঠলো। বাইরে মাহবুবুল আলম চাষীসহ একদল আমলাও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যমে সমগ্র ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। কার্যত তারাই জিয়াউর রহমানকে তাদের পক্ষে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এ সময় ক্যান্টনমেন্টের বাইরের চিত্র হলো, সময়মতো ছাত্র-যুব-শ্রমিকরা শহীদ মিনারে সমবেত হয়ে ক্যান্টনমেন্টের দিকে তাদের এগিয়ে যাবার পরিকল্পনাও বাস্তবায়ন করতে পারলো না। ছাত্র-যুবক-শ্রমিকদের সমবেত করার জন্য নির্দিষ্ট করে যাদের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারাও তা কার্যকর করতে পারেনি। আমাদের প্রধান প্রধান নেতারা সেই সময় জেলে ছিলেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাঁদের যোগ্যতা প্রমাণে চরমভাবে ব্যর্থ হন। পরবর্তী সময়েও এ ব্যর্থতাকে অতিক্রম করার সুযোগ না নিয়ে একটি অসময়োপযোগী সিদ্ধান্তের ফলে সবকিছুই এক পর্যায়ে আমাদের হাতের বাইরে চলে যায়।

৯ নভেম্বর ১৯৭৫ জলিল-রব মুক্তিলাভ করেন। এরপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আমরা আলোচনায় বসি। আলোচনার গতি দেখে আমি বুঝলাম, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দুটি স্পষ্ট ভাগ। একটি ভাগের মত হলো : দুই-চারদিনের মধ্যেই ৭ নভেম্বরের মতো করে সিপাহী-জনতার আরেকটি অভ্যুত্থান ঘটানো। দ্বিতীয় মতটি হলো : জিয়াউর রহমানকে তাঁর ক্ষমতা সংহত করার সুযোগ দিয়ে আরও সংগঠিতভাবে অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করা। দুটি ভিন্ন মতামতের কারণে আমি ক্ষুদ্রাকারের একটি 'অ্যাকশন কমিটি' গঠনের প্রস্তাব দিলাম। অবস্থা বুঝে এই 'অ্যাকশন কমিটি' জাসদ ও 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'র হাই কমান্ডের কাছে রিপোর্ট করবে এবং তার আলোকে ও বাস্তবতার নিরিখে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। নভেম্বরের ১৫ কি ১৬ তারিখে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২৩ নভেম্বর হঠাৎ করে আমার কাছে সংবাদ এলো, কোনো একটি সভা থেকে মেজর জলিল, আ স ম রব ও কর্ণেল তাহেরকে গ্রেফতার করা হবে। ঐ দিনই এসএম হলের হাউজ

টিউটরের বাসা থেকে তাঁদেরকে গ্রেফতার করা হয়। পরে ইনুও গ্রেফতার হলো। এঁদের গ্রেফতারে আমি বিস্মিত হলাম। গ্রেফতার হবার মতো এমন কোনো ঘটনা বা সিদ্ধান্ত তো হয়নি।

এ ঘটনার প্রায় ৩০ বছর পরে (২০০৫ সালে) আমি জানতে পারলাম, আমার অনুপস্থিতিতে, আমাকে না জানিয়ে বা আমার মতামত না নিয়ে, মাত্র কয়েকজন মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, আবারও কয়েকদিনের মধ্যে ক্যান্টনমেন্টে অভ্যুত্থান ঘটানো হবে। সেই প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন কর্নেল তাহের ও মেজর জলিল। বলা বাহুল্য জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতাচ্যুত করতেই এই অভ্যুত্থান ঘটানোর চিন্তা করা হয়েছিল।

ক্ষুদ্রাকারের সেই 'অ্যাকশন কমিটি'তে ছিলেন মেজর জলিল, আ স ম আবদুর রব, কর্ণেল তাহের, হাসানুল হক ইনু ও আমার অনুরোধে অন্তর্ভুক্ত করা শরীফ নূরুল আম্বিয়া। আমার অনুপস্থিতিতে, আমাকে না জানিয়ে দ্বিতীয় অভ্যুত্থান ঘটনানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার এই বিষয়টি আমি পরে শরীফ নূরুল আম্বিয়ার কাছ থেকেই জানতে পারি।

বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলের জন্য যে সংগঠিত শক্তি ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে সৈনিক ও অফিসারদের মধ্যে এবং বাইরে ছাত্র-যুব-শ্রমিকদের মধ্যে থাকা দরকার, মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে তা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত হয়ে পড়েছিল। সর্বোপরি ক্ষমতায় যারা থাকে তাদের সঙ্গে ক্ষমতার বাইরে থাকা জনগণের যে পরস্পর বিরোধী অবস্থান থাকা প্রয়োজন—যার ভিত্তিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানো সম্ভব—তাও একেবারেই অনুপস্থিত ছিল।

আমার অনুপস্থিতিতে যে সভাটিতে দ্বিতীয় অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত হয়েছিল তার পূর্বেকার একটি সভায় যখন কথাটা উঠেছিল, আমি জানতে চেয়েছিলাম, সেনাবাহিনীর মধ্যে (অফিসারসহ) সমর্থন এবং সাজ-সরঞ্জামের দিক থেকে অভ্যুত্থানের পক্ষে কী পরিমাণ প্রস্তুতি আছে। তার উত্তরে বলা হয়েছিল, 'একটি ট্যাঙ্ক' আমাদের পক্ষে থাকবে। সৈনিক ও অফিসারদের কোনো সংখ্যা কেউ দিতে পারলেন না। শুধু বললেন, যেহেতু ইতিপূর্বে সৈনিকরা আমাদের পক্ষে ছিল অতএব তাদেরকে সংগঠিত করতে বেশি সময় লাগবে না। আমি ছাত্র-

যুব-শ্রমিক সংগঠনের অবস্থা উল্লেখ করতে গিয়ে বললাম, পুনরায় এদেরকে সংগঠিত করতে হলে কমপক্ষে ছয় মাস সময় লাগবে। এ সভার পরেই আমাকে ছাড়া দ্বিতীয় অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

## জাসদ রাজনীতিতে তাহেরের অন্তর্ভুক্তি

মুক্তিযুদ্ধের সময় কামালপুরে পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে বাংলাদেশের নিয়মিত সেনাবাহিনীর মুখোমুখি যুদ্ধে কর্ণেল তাহের গুরুতর আহত হন, তার একটি পা কেটে বাদ দিয়ে দিতে হয়। ভারতে প্রশিক্ষণ চলাকালেই আমি কর্ণেল তাহেরের নাম শুনি। জাসদ গঠনের সময়ই আমাদের সেনাবাহিনীর যারা স্বাধীনতার সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তাঁদেরকে নতুন এ দলে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা আমার মাথায় ছিল। জাসদে 'বিএলএফ' সদস্যদের, আগরতলা মামলার অভিযুক্তদের এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনা সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টিকে আমরা সাংগঠনিক কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। সে অনুযায়ী মেজর জলিল, কর্ণেল তাহের, মেজর জিয়াউদ্দিন, সুলতানউদ্দিন আহমদসহ অনেকেই জাসদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। কর্ণেল তাহের তখনও নিয়মিত সেনাবাহিনীর সদস্য থাকার কারণে জাসদের প্রথম জাতীয় কমিটিতে তিন নম্বর ভাইস প্রেসিডেন্ট (যে-পদটা শূন্য দেখানো হয়েছিল) হিসেবে তাঁর নাম দেখানো সম্ভব হয়নি। *গণকণ্ঠ* অফিসে একদিন তাঁকে আসতে দেখলাম। আলোচনা প্রসঙ্গে আমি যে তাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত, সে কথা বললাম। তিনিও আমার সঙ্গেই দেখা করার জন্য এসেছেন বলে জানালেন। এরপর থেকে আমরা ঘনিষ্ঠ হই।

বহুদিন পর একদিন তিনি আমাকে বললেন, 'সিরাজ ভাই, যদি কোনোদিন সুযোগ আসে আমাকে একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাবার কাজে লাগাতে পারবেন।' আমি বললাম, 'সে কাজটি আপনি যদি কখনো করেনও, ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে বসে করতে পারবেন না।'

তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পর তাঁর অনেক ইচ্ছের কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন। যেমন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে তিনি একটি

উৎপাদনমুখী জনগণের সেনাবাহিনী (People's Army) হিসেবে গড়ে তুলতে চান। শুনে আমি বলেছিলাম, স্বাধীন হবার পরপরই মুজিব ভাইকে আমি এরকম 'পিপল্‌স আর্মি' করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম।

এ ধরনের আরও বহু ইচ্ছের কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রায় চার-পাঁচ বছরের আসা-যাওয়া, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। জলিল ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার সূত্রে তিনি জাসদ রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে এসে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময় ড. আখলাকের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। এভাবে সব মিলিয়ে তিনি জাসদ রাজনীতির অংশ হয়ে পড়েছিলেন। তাকে আমি একজন অত্যন্ত সাহসী এবং দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে দেখেছি। তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে নামী কমান্ডো ছিলেন। জনগণের জন্য তাঁর গভীর দরদ ও আবেগময় ভালোবাসা ছিল।

আমাদের আলাপ-আলোচনায় সব সময় তিনি তাঁর সামরিক প্রশিক্ষণকে কীভাবে জনগণের স্বার্থে ব্যবহার করা যায় তার উপায় বের করার উপর গুরুত্ব দিতেন। তাঁর অনুপ্রেরণায়ই তাঁর সকল ভাইবোন সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এভাবে একটি পরিবারের সবার স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের নজির খুবই কম। আর এ দেশে সূর্যসেনের পর কর্নেল তাহেরই প্রথম ব্যক্তি রাজনৈতিক কারণে যাঁর ফাঁসি হয়েছে।

ছাত্রলীগের দ্বিধা বিভক্তির পরও আমি রব-গ্রুপ ছাত্রলীগকে শেখ মুজিবের রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে আনার কোনো চেষ্টাই করিনি। ছাত্রলীগ (রব) তখন এবং পরবর্তী সময়েও বেশ কয়েক বছর দেশের বৃহত্তম ছাত্র সংগঠন হিসেবে অবস্থান করছিল। ছাত্রলীগের নূরে আলম সিদ্দিকী গ্রুপ এবং ছাত্র ইউনিয়নের দুই গ্রুপ মিলেও ছাত্রলীগ রব-গ্রুপের মোকাবেলা করার সামর্থ্য রাখতো না। মোটকথা, সারা দেশে রব-শাহাজান সিরাজের নেতৃত্বে ছাত্র সমাজ একটি স্বাধীন ও স্বকীয় সত্তা নিয়ে ছিল। আমি কোনো অবস্থাতেই তাকে ছাত্রলীগ নূরে আলম সিদ্দিকী গ্রুপের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দিকে যেতে দিতে চাইনি। আমি

এর ঘোর বিরোধী ছিলাম। একইভাবে আমিও মুজিব ভাই থেকে কোনভাবেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইনি। আমি নিজে শ্রমিক লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলাম। শ্রমিক সংগঠন দ্বিধাবিভক্ত হোক সেটাও কখনো আমার মাথায় আসেনি।

কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছিল। পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী কোনো কারণ ছাড়াই দেশের বহুস্থানে রব-গ্রুপ বিরোধী অভিযান চালাতো। অর্থনীতিতে তখন অব্যবস্থা দেখা দিয়েছিল। রেশনে চাল ও কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়া শুরু হলো। সঠিকভাবে এ ব্যবস্থা চলছে কিনা তা দেখার জন্য সেনাবাহিনী নামানো হয়। কিন্তু দেখা গেল আওয়ামী লীগের সমর্থক এক পরিবারের কাছেই দশ-বারটা রেশন কার্ড। পরিস্থিতি যেন আয়ত্বের বাইরে চলে না যায় তার জন্য অবৈধ রেশন কার্ড উদ্ধারের কাজে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হলো। এর ফলে খাদ্য পরিস্থিতি আরও নাজুক অবস্থায় চলে গেল। মুজিব ভাই তখন প্রতি ইউনিয়নে লঙ্গরখানা চালু করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু দেখা গেল লঙ্গরখানার জন্য বরাদ্দ চাল-গম ও অন্যান্য তৈজসপত্রও দায়িত্বপ্রাপ্তরা আত্মসাৎ করে ফেলছে। এ সময় ভারত ও বার্মা (এখনকার মিয়ানমার) থেকে খাদ্য আমদানি করাও সম্ভব হলো না।

এ সময় আবার আমেরিকা মাঝ সমুদ্র থেকে বাংলাদেশে পাঠানো তাদের খাদ্যশস্যবাহী জাহাজ ফিরিয়ে নিয়ে যায়। তাদের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বাংলাদেশ এ সময় কিউবায় কিছু পরিমাণ চটের বস্তা রপ্তানি করেছিল। তারই শাস্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র পিএল ৪৮০ চুক্তির অধীনে পাঠানো ঐ গম ফেরত নেয়। ১৯৭৪ এর খাদ্যাভাবে সরকারি হিসাবেই একত্রিশ হাজার মানুষ মারা য়ায়। বেসরকারি হিসাবে এ সংখ্যা অনেক বেশি।

এ হলো একদিকের চিত্র। অন্যদিকের চিত্র হলো দলের কিছু লোকজন রাতারাতি বিপুল অর্থ-সম্পদের মালিক হয়ে গেল। চোরাকারবারি, মজুতদারি, মুনাফাখোরি এসবের মাধ্যমে তারা অর্থবিত্তের পাহাড় গড়ে তুললো। সংবাদপত্রে এসব দুর্নীতি ও

অনিয়মের খবর প্রকাশিত হলেও সরকার থেকে তা নিয়ন্ত্রণের কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হলো না।

১৯৭৩ সালে জরুরি অবস্থা জারির ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করে সংবিধান সংশোধন করা হয়। বিনাবিচারে আটক রাখার বিধানসহ নিরাপত্তা আইন জারি করা হলো। মাত্র ৪ টি ছাড়া সব সংবাদপত্র বন্ধ ও সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হলো। রাষ্ট্রপতির হাতে সর্বময় ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি হয়ে যান। 'বাকশাল' ঘোষণার আগে মুজিব ভাইয়ে সঙ্গে আমার দুবার দেখা হয়। তিনি জাসদকে 'বাকশাল'-এর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। পরিবর্তে আমি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সব রাজনৈতিক দল ও সমাজশক্তিকে (সেনাবাহিনী ও আমলাদেরসহ) একত্র করে একটি 'জাতীয় সরকার' গঠনের অনুরোধ করি। তিনি সরাসরি আমাকে বললেন, কোয়ালিশন ভিত্তিক সরকারের অত্যন্ত খারাপ স্মৃতি তাঁর রয়েছে। আমি বললাম, সেটি ছিল প্রাদেশিক সরকার, আর তা ১৯৫৬ সালে। এখন জাতীয় রাষ্ট্র বাংলাদেশে কোয়ালিশন ভিত্তিক জাতীয় সরকার গঠনের বিশেষ দৃষ্টান্ত আমরা স্থাপন করতে পারি। কিন্তু তিনি আমার কথা আমলে নিলেন না।

এমনি ধরনের অনেক ভুল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত সারা দেশে জনগণের মধ্যে আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব তৈরি করে। এ সময় আবার মানুষের মধ্যে সামরিক অভ্যুত্থানের গুঞ্জন সৃষ্টি হয়। এ বিষয়টিও মুজিব ভাইকে বলা হয়েছিল। গোয়েন্দা রিপোর্টেও এ ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা তাঁকে জানানো হয়েছিল বলে জানি। কিন্তু তিনি সে সব কোনো কিছুকেই গুরুত্ব দিলেন না। ক্রমাবনতিশীল পরিস্থিতিকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। এরই মধ্যে ঘটলো ১৫ আগস্টের নির্মম ঘটনা।

## আমার গ্রেপ্তার ও মুক্তি

৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান লক্ষ্যচ্যুত হবার পর পুনরায় আরেকটি অভ্যুত্থান ঘটানোর অবিবেচনাপ্রসুত ও অপ্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে জাসদ, গণবাহিনী ও শ্রমিক লীগ নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হয়ে

যান। এ ধরনের একটি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন যে তখন একেবারেই অসম্ভব ছিল তা নেতাদের পক্ষে বোঝাও সম্ভব হয়নি। জিয়াউর রহমানের নির্যাতন এরপর সংগঠন হিসেবে জাসদকে প্রায় অস্তিত্বহীনতার পর্যায়ে নিয়ে যায়।

গোপন আদালতের বিচারে প্রধান আসামি কর্ণেল তাহেরকে প্রাণদণ্ড এবং বাকি সবাইকে আজীবন কিংবা দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ২১ জুলাই ১৯৭৬ ফাঁসিতে কর্নেল তাহেরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ঐ বছরেরই ২৬ নভেম্বর আমি গ্রেফতার হই। দীর্ঘ পাঁচ বছর কারাবাসের পর ১৯৮১ সালের ১ মে আমি মুক্তি লাভ করি। আ স ম আবদুর রব অসুস্থ থাকায় চিকিৎসার জন্য তাকে জার্মানি পাঠানো হয়েছিল। সেও ১ মে জার্মানি থেকে মুক্তি লাভ করে।

## পরিশিষ্ট : ১

# সিরাজুল আলম খান সম্পর্কে আ স ম রব

*[সিরাজুল আলম খানের সাক্ষাৎকার গ্রহণের পরে আমি তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারী ও দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মী আ স ম আবদুর রবের সঙ্গে জনাব খানকে নিয়ে কিছু আলোচনা করি। আমার উদ্দেশ্য ছিল এই আলোচনার মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক দীক্ষাদাতা বন্ধু-দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক সম্পর্কে জনাব রবের অভিজ্ঞতাজাত মূল্যায়ন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। ২০১৮ সালের ৭ মে তারিখে নেওয়া জনাব রবের সাক্ষাতকারটির সারাংশ এখানে দেওয়া হলো [শা.পে.]।*

সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৬২ সালে। তাঁর বাবার মৃত্যুর পর জেল থেকে সাত দিনের প্যারোলে বেরিয়ে আসা জনাব খানের সঙ্গে আমার দেখা হয় নোয়াখালী বেগমগঞ্জের আলিপুর গ্রামে। আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন খালেদ মোহাম্মদ আলী। আমি, মাহমুদুর রহমান বেলায়েত ও শামসুজ্জামান চৌধুরী বাবুল একসঙ্গে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি সেখানে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী গিজগিজ করছে। খালেদ ভাই তাঁকে বললেন, 'আপনি যাদের খুঁজছেন তাদের দুজনকে আমি নিয়ে এসেছি।' একথা বলে তিনি আমাকে ও বেলায়েতকে দেখিয়ে দিলেন। সিরাজুল আলম খান সম্পর্কে খালেদ ভাই পূর্বেই আমাকে ব্রিফ করেছিলেন। জানিয়েছিলেন বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য তিনি একটি গোপন সংগঠন গড়ে

তুলেছেন। বলেছিলেন, 'তোমরা এটির সদস্য হবে। কাজ করবে। তোমরা দুজন ছাড়া আর কেউ যেন না জানে। সংগঠনের নিয়ম হলো, যে যার মাধ্যমে 'রিক্রুট' হবে সে ও রিক্রুটার—এ দুজন ছাড়া আর কেউ এ ব্যাপারে কিছু জানতে পারবে না।'

আমি তখন চৌমুহনি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। বেলায়েতও তাই। এরপরে জেলা পর্যায়ে আমরা নোয়াখালীতে এবং থানা পর্যায়ে ফেনী ও লক্ষীপুরে 'রিক্রুট'-এর কাজ শুরু করি। শর্ত ছিল সাহসী, ভালো বক্তা, স্লোগান দিতে পারে, পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি করতে পারবে, দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থাকার মনোবল আছে, জেল-জুলুমসহ সব ধরনের অত্যাচার সয়ে দেশ 'স্বাধীন' করার কাজে লিপ্ত থাকার মানসিকতা সম্পন্ন এমন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হতে হবে। এছাড়া তারা বিয়ে করবে না। লোভ-লালসা এবং পরিবারের প্রতি বিশেষ আনুগত্যের উর্ধ্বে থাকবে। মিথ্যা কথা বলবে না। ফাঁকিবাজি, ধোঁকা দেওয়া, অসততা, কারও প্রতি অবিচার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে এবং কেন্দ্রের যে কোনো নির্দেশকে জীবনবাজি রেখে হলেও বাস্তবায়িত করার জন্য কাজ করে যাবে। সিরাজ ভাইয়ের নির্দেশে ১৯৬২ সালে হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে দেশের অন্যান্য এলাকার মতো আমরা নোয়াখালীতেও ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলি।

১৯৬৪ সালে মিস ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচন। তিনি ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন। আমরা মনে করলাম, এ নির্বাচনকে কাজে লাগিয়ে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হাসিলের জন্য উপযুক্ত নেতা-কর্মী তৈরি করা যাবে। তাদের খুঁজে বের করে 'রিক্রুট' করতে হবে। ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিতে আমরা নোয়াখালী থেকে এক বিরাট দল নিয়ে চট্টগ্রামে গিয়েছিলাম। ছাত্রলীগের জেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হানিফ ও খালেদ মোহাম্মদ আলী, আমি ও বেলায়েতসহ জেলার বিভিন্ন থানা থেকে কলেজ ও স্কুলের ছাত্রসহ কয়েকশত কর্মী ও সদস্য আমরা চট্টগ্রামে গিয়েছিলাম। তখন বাংলাদেশের সর্বত্র স্কুল-কলেজ পর্যায়ে ছাত্রলীগের তেমন শক্তিশালী সংগঠন না থাকলেও, নোয়াখালীতে আমরা সকল কলেজ ও স্কুলে, এমনকি প্রাইমারি স্কুলে পর্যন্ত ছাত্রলীগের ইউনিট গঠন করতে সক্ষম হই।

এর আগে ঢাকার পাকিস্তান মাঠে অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলনেও (১৯৬০-'৬২) আমি নোয়াখালি জেলার একজন প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলাম। ঐ সম্মেলনে সিরাজুল আলম খান (দাদা) সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে শামসুজ্জামান বাবুল আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। সেদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, তিনি ভিন্ন ধরনের চিন্তা করেন। তবে সেবারে ঐ পরিচয় ছাড়া তাঁর সঙ্গে আর ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়নি।

১৯৬৪ সালে মোনায়েম খানের উপস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান ভণ্ডুল করার অপরাধে সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, রাশেদ খান মেনন ও আসমত আলী শিকদারসহ বেশ কয়েকজন ছাত্র নেতাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। এ বহিষ্কারাদেশের বিরুদ্ধে সারাদেশের মতো নোয়াখালীতেও আমরা ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলি।

## ছাত্রলীগ সম্মেলনে যোগদান

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের দুদিন আগে অনুষ্ঠিত হয় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলন। ঐ সম্মেলনে ডেলিগেট হিসেবে যোগ দিতে আমরা নেয়াখালী থেকে ঢাকায় আসি। সে সময় সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। তিনি বিভিন্ন জেলা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে গোপন সংগঠনের জন্য আরও নতুন কর্মী রিক্রুট করতে বললেন। তখন ওবায়দুর রহমান ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট ও সিরাজুল আলম খান সাধারণ সম্পাদক। সে সময় শুনেছিলাম যে, ছাত্রলীগের সভাপতি কিংবা সাধারণ সম্পাদকের যে-কোনো একজন মুজিব পরিবারের হতে হবে। ১৯৭০ সালে আমিও অনুরূপ বাধার সম্মুখীন হয়েছিলাম। সেবার তোফায়েল আহমদের কারণে সে বাধা টেকেনি। বঙ্গবন্ধু যখন তোফায়েলকে ডেকে বললেন, 'তোমাকে ছাত্রলীগের সভাপতি হতে হবে', তখন তোফায়েল বলেছিলেন, 'তাহলে রব হবে সাধারণ সম্পাদক।' অবশ্য সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে কাজ করবার যে শপথ আমি নিয়েছিলাম, তা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করতে গিয়ে সারাদেশে আমার যে ব্যাপক যোগাযোগ ও পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল, আমার এই সাধারণ সম্পাদক হবার পেছনে তারও একটা বড় ভূমিকা ছিল।

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু তাঁর ৬-দফা ঘোষণা করলেন। এরপর দাদার সঙ্গে ঢাকায় দেখা হতে তিনি বললেন, '৬-দফাকে নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সারা দেশে সভা, মিছিল, ধর্মঘট, হরতাল ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করা হবে। তোমরা নিজ নিজ এলাকায় এসব কর্মসূচির প্রতি সমর্থন দেবে ও তা সফল করার জন্য কাজ করবে।' এসব সভা-সমাবেশ থেকে আমরা '৬-দফা না হলে ১-দফা' এই কথাটি বলতাম। তবে সে 'এক'-দফাটা কী সেটা ব্যাখ্যা করা হতো না। যারা বোঝার তারা বুঝতো।

১৯৬৬ সাল। রূপ ভারতী সিনেমা হলে নোয়াখালী জেলা ছাত্রলীগের সম্মেলন। শাহ মোয়াজ্জেম, ওবায়দুর রহমান, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও সুধীর কুমার হাজরা এ সম্মেলনে উপস্থিত হন। ছাত্রলীগের এত বর্ণাঢ্য সম্মেলন ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। সে সময়ে নোয়াখালী ছিল ছাত্রলীগের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি। সম্মেলন থেকে আমাকে নোয়াখালী জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। আমি এই দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলাম। দাদা বললেন, 'রব স্টিয়ারিং হুইল তো সাধারণ সম্পাদকের হাতে। তোমাকে ঠিক জায়গায় রাখা হয়েছে।' আমি তখন সম্মত হলাম।

ঐ বছরেরই শেষের দিকে আমি ঢাকায় আসি। তোফায়েল ভাই তখন ডাকসুর ভিপি। তাঁর সহায়তায় আমি বাংলা বিভাগে ভর্তি হই। তখন থেকে প্রতিটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আমি সিরাজুল আলম খানের নির্দেশ মেনে চলে আসছি। আজ পর্যন্ত এর ব্যতিক্রম হয়নি।

১৯৬৭ থেকে '৬৯ সাল পর্যন্ত আমি ইকবাল হলের (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) অনাবাসিক ছাত্র ছিলাম। সে সময়ে দাদাও ঐ হলে থাকতেন। আমি ও শাজাহান সিরাজ তখন হলের ১১৬ নম্বর কক্ষে থাকি। খালেদ মোহাম্মদ আলীকে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক করার প্রশ্নে দাদার নির্দেশে আমি বিশেষ ভূমিকা পালন করি। জেলা

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের মবিলাইজ করি। কারণ খালেদ মোহাম্মদ আলী ছিলেন আমাদের গোপন সংগঠনের সদস্য।

১৯৬৬-'৬৯ সময়ে ৬-দফা ও ১১-দফা আন্দোলন এবং তারপর গণঅভ্যুত্থানের জন্য ছাত্র সমাজকে সংগঠিত করা, তাদের পরিচালনা করা, নানা নির্দেশনা দেওয়া, বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন, সবই করা হতো সিরাজুল আলম খানের নির্দেশে। ১১-দফা প্রণয়নের পেছনে তাঁর অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। তিনি ছিলেন এ আন্দোলনের নেপথ্য সংগঠক। ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের তো বটেই, এমনকি রেল-সড়ক-লঞ্চসহ পরিবহন ও অন্যান্য খাতের শ্রমিকদের সংগঠিত করা; তাদেরকে আন্দোলনে আনা এবং পরিচালনার ব্যাপারেও মূল পরিকল্পনাকারী ও নির্দেশক ছিলেন সিরাজুল আলম খান।

'আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলা'য় আটক বঙ্গবন্ধুকে আইয়ুবের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করানোর জন্য তাঁকে প্যারোলে বের করে নিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছিলেন *ইত্তেফাক* সম্পাদক মানিক মিয়া ও অ্যাডভোকেট আবদুস সালাম খানসহ কয়েকজন। এক সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি বঙ্গবন্ধুর গাড়ির চালক ইকবাল হলে আমার রুমের দরজায় টোকা দিচ্ছেন। তিনি বললেন, বেগম মুজিব গাড়ি পাঠিয়েছেন সিরাজ ভাইকে নিয়ে যাবার জন্য। সিরাজ ভাই তখন রুমে ছিলেন না। আমি তাঁকে খুঁজে বের করে ৩২ নম্বরে পাঠিয়ে দিলাম। দাদা ফিরে আসার পর পুরো ঘটনা আমাদের বললেন।

শেখ মুজিবের প্যারোলে মুক্তির ব্যাপারে বেগম মুজিব কী করতে হবে তা বুঝতে পারছিলেন না। দাদা তাঁকে বললেন, 'ওভাবে মুজিব ভাইকে বের করার মানে হবে তাঁকে জাতির কাছে বেইমান ও বিশ্বাসঘাতক প্রমাণ করা। তাঁর প্যারোলে মুক্তির প্রশ্নই ওঠে না। তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েই জেল থেকে বেরিয়ে আসবেন।'

বেগম মুজিব দাদাকে বললেন, 'তা হলে আপনি এক টুকরা কাগজে কথাটা লিখে দেন। আমি উকিলদের মারফত তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেব।' দাদা তখন কিংস্টর্ক সিগারেটের প্যাকেটের কাগজ ছিঁড়ে তার ওপর লিখে দিলেন, 'আপনি কিছুতেই প্যারোলে আসবেন না—সিরাজ'। দাদার এই কথাকে গুরুত্ব দিয়ে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সরকারের প্যারোলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৭০-এর নির্বাচনে দাদা আমাদের নির্দেশ দিলেন, আমরা যেন আওয়ামী লীগের আয়োজিত কোনো জনসভায় যোগদান না করি। তবে ছাত্রলীগের আয়োজিত সব জনসভায় যেন আওয়ামী লীগ নেতাদের আমন্ত্রণ জানাই এবং সেসব সভায় ৬-দফা আদায় না হলে এক-দফা অর্থাৎ 'স্বাধীন বাংলা'র জন্য সংগ্রাম করা হবে বলে ঘোষণা দিই। তাঁর নির্দেশ মতো ছাত্রলীগের আয়োজিত জনসভাগুলোতে আমরা যেসব স্লোগান দিতাম তার মধ্যে ছিল : '৬-দফা না ১-দফা'— '১-দফা, ১-দফা।'

১৯৭০-এর নির্বাচনকেও আমাদের লক্ষ্য অর্জনের কাজে লাগানো হয়। সিরাজুল আলম খানের নির্দেশে আমরা আওয়ামী লীগ যাতে পূর্ব পাকিস্তানের সবগুলো আসনে জিততে পারে তার জন্য জীবন বাজি রেখে কাজ করি। তাঁর নির্দেশে এভাবে ছাত্রলীগের ব্যাপক কর্মীবাহিনীর সার্বক্ষণিক শ্রম ও সম্পৃক্তি ছাড়া ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয় সম্ভব হতো না। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও, বাঙালি মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবীসহ শিক্ষিত সমাজের নেতারা সেদিন বুঝে ফেলেন যে, নির্বাচনে যদি পাকিস্তান সরকার কোনো বাধা সৃষ্টি করে তাহলে সে আন্দোলন গণতান্ত্রিক এলাকা ছাড়িয়ে সশস্ত্র রূপ নেবে। বাস্তবে হয়েছেও তাই। নির্বাচনে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা জনগণের রায় মেনে না নেওয়ায় তা সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়।

বঙ্গবন্ধু যখন 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'য় অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে তখন আওয়ামী লীগ অফিসে বাতি জ্বলতো না। বিল দিতে না পারার কারণে বিদ্যুতের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছিল। আমেনা বেগম তখন আওয়ামী লীগের কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক। আমি ও দাদা পলাশি মোড় থেকে বাসে পুরনো পল্টন যেতাম। ভাড়া ছিল ১৫ পয়সা। আমার ও দাদার পকেটে কোনো পয়সা নেই। ইকবাল হলের ক্যান্টিনের সামনে এর-ওর কাছ থেকে চেয়ে চার আনা পয়সা জোগাড় করতে পারলেই তা নিয়ে পুরনো পল্টন আওয়ামী লীগ অফিসে চলে যেতাম। বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হবার পর এমনই আর্থিক অনটনে পড়ি যে, সাতদিন বলতে গেলে প্রায় উপবাসের মতোই কাটে আমাদের। এ সময়ে অনেকটা পানি খেয়েই দিন কাটিয়েছি। ইকবাল হলের তিন

তলায় আবু বকরের রুমে লেপ গায়ে দিয়ে দিনভর শুয়ে থাকতাম। গ্রেফতারের সম্ভাবনা এড়াতে প্রায়ই রুম বদলাতাম।

ইকবাল হলের এক কর্মচারী ছিল, তাকে সবাই 'ল্যাবা' বলে ডাকতো। তখর রোজার মাস। সে ইফতারের সময় আমাদেরকে 'বুট-বড়া' এনে দিতো। সেটাই ছিল আমাদের একমাত্র খাবার। যেদিন আওয়ামী লীগ অফিসে যেতাম, সেদিন আমেনা বেগম এক টাকার মুড়ি ও দুই টাকার ছোলা ও পেঁয়াজ মেখে সকলের জন্য যে ইফতার বানাতেন তা থেকে আমরাও খেতাম।

সার্জেন্ট জহুর যেদিন মারা যান, সে সন্ধ্যায় দাদার নির্দেশে নীলক্ষেত এলাকার 'পথশিশুদের'দের নিয়ে একটি মিছিল বের করি এবং সে মিছিল থেকেই প্রথম স্লোগান দিই : 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'জহুরের রক্ত, স্বাধীনতার মন্ত্র।' সে রাতে দাদা আমাকে আরও সাবধানে থাকতে বললেন। এ সময় তিনি আমার ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিলেন। আমি গ্রেফতার হলে বিপদ হতো। আমার প্রতিদিনের সকল কার্যকলাপ তখন তাঁর নির্দেশ মতোই চলতো। আগের রাতে তিনি বলে দিতেন পরদিন আমাকে কী করতে হবে। আমিও সে অনুযায়ী চলতাম।

## ১ মার্চ ও তারপর

১৯৭১-এর ১ মার্চ দুপুরে ইয়াহিয়া খান তার বেতার ভাষণে ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেন। ভাষণের পর দাদা আমাকে সরাসরি বায়তুল মোকাররম চলে যেতে বললেন। মাখনকেও তাই বললেন। পল্টন ময়দানে তখন মওলানা ফরিদ আহমদের নেজামে ইসলাম পার্টির একটি সভা হচ্ছিল। আমরা সেই মঞ্চ দখল করে বক্তৃতা দিলাম। একই সময়ে বঙ্গবন্ধু পূর্বাণী হোটেলে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করছিলেন। ইয়াহিয়ার বক্তৃতার পর তিনিও সে বিষয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে প্রেস কনফারেন্স করলেন। 'আমরা সেখানে গিয়ে পাকিস্তানের পতাকা পোড়ালাম ও বঙ্গবন্ধুর কাছে 'স্বাধীনতা' ঘোষণার দাবি জানালাম। তিনি আমাদের বললেন, 'আমার কাজ আমি করছি, তোমাদের কাজ তোমরা করো'।

সে রাতে দাদার নির্দেশে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। ২ মার্চ কলাভবন চত্বরে আমি স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করি। এটা সেই পতাকা যা ইতিপূর্বে পল্টন ময়দানে শ্রমিক লীগের সংবর্ধনা সভা ও '৭১-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুর বাহিনীর (পরে 'জয়বাংলা বাহিনী' ও শেষে 'মুজিব বাহিনী') মার্চপাস্টে ব্যবহার করা হয়। একই পতাকা স্বাধীন বাংলার পতাকা হিসেবে দাদার নির্দেশে ২ মার্চ আমার হাতে হস্তান্তর করেন ঢাকা শহর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ জাহিদ হোসেন। 'জয়বাংলা বাহিনী'র প্রধান হিসেবে পতাকাটা আমি বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দিই। এই পতাকাই ২৩ মার্চ 'পাকিস্তান দিবসে' (আমরা যে-দিনটি 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালন করি) সারাদেশে পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে স্বাধীন বাংলার পতাকা হিসেবে উত্তোলিত হয়। ২৪ মার্চ রাতে ইকবাল হলের প্রভোস্টের টেলিফোনে আমার কাছে একটি গোপন টেলিফোন আসে। তা থেকে বলা হয় ২৫ মার্চ রাত ৮টায় আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়া হবে, আমি যেন সে সময়ে টেলিফোনের কাছে থাকি। আমি দাদাকে বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেন, 'সে সময় আমি ও রাজ্জাক মুজিব ভাইয়ের বাসায় থাকবো। তুমি খবরটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে ৩২ নম্বরে চলে আসবে।' পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হামলার আশঙ্কায় আমি আগে থেকেই ঢাকা শহর থেকে চলে যাওয়ার সকল প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলাম। সে রাতে ঠিক ৮ টায় ফোনটি এলো। ও প্রান্ত থেকে কেউ একজন বললো, আমি কে বা কোথা থেকে বলছি, জানার চেষ্টা করবেন না। আজ রাত ১২টা ১ মিনিটে আর্মি 'ক্র্যাকডাউন' হবে এবং শেখ মুজিব এবং আপনাদের সকল ছাত্রনেতাকে মেরে ফেলবে। এর পরেই তিনি লাইন কেটে দিলেন। আমি তক্ষুণি ৩২ নম্বরে চলে গেলাম। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহকারী মোহাম্মদ হানিফ (পরবর্তীকালে ঢাকার মেয়র) আমাকে গাড়ি বারান্দার দোতলায় যেখানে চালকরা ঘুমান, সেখানে চলে যেতে বললেন। গিয়ে দেখি সেখানে বঙ্গবন্ধু, দাদা, মনি ভাই, তোফায়েল ভাই ও রাজ্জাক ভাই আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি বলার পর বঙ্গবন্ধু বললেন, 'এ তথ্য আমিও জানি। তার জন্য আমার প্রস্তুতিও আছে।'

আমি বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আমাদের মধ্যে বোধ হয় আমিই সর্বপ্রথম ঢাকা শহর ত্যাগ করি। ২৫ মার্চ রাত ১২টায় ক্র্যাকডাউনের পর 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ','স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' ও আওয়ামী লীগের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে এবং জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তর না করলে পরবর্তী করণীয় কী হবে তা নিয়ে দাদার আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল, তাঁদের অনেকে কেরানিগঞ্জে রতন-গগনদের বাড়িতে একত্রিত হলাম। সেখানে দাদা ছাড়াও শেখ মনি, রাজ্জাক, তোফায়েল ও আরেফসহ অনেকে ছিলেন। ঐ বাড়িতে বসেই সিদ্ধান্ত হয়, চার যুবনেতা অর্থাৎ দাদা, মনি, রাজ্জাক ও তোফায়েল ভারতে চলে যাবেন এবং সেখানে অস্ত্র ও ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করবেন। দাদা আমাকে ভারতে না গিয়ে আপাতত দেশে থাকতে বললেন। বললেন, অস্ত্র পাঠানো হবে। একটি সংকেত দেওয়া হলো। সেটি ছিল, যেদিন রাত ৮টায় আকাশবাণী কোলকাতা থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গলায় বিশেষ একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজানো হবে, বুঝতে হবে ভারত থেকে অস্ত্রের চালান রওয়ানা হয়ে গেছে। তারা আমাকে খুঁজে বের করবে। আমাকেও রাজশাহীর কাছে পদ্মা নদীতে তাদেরকে খুঁজতে হবে।

মে মাসের প্রথমদিকেও অস্ত্র না আসায় রায়হান ফিরদাউস মধুকে সঙ্গে নিয়ে আমি আগরতলা হয়ে কলকাতায় যাই। পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চিত্ত সুতারের বাসায় দাদার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। দাদা ছাড়াও মনি ভাই, রাজ্জাক ভাই ও তোফায়েল ভাইকে সেখানে পেলাম। দাদার কাছ থেকে জানলাম ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। অস্ত্র, ট্রেনিং, রসদ সব কিছুরই ব্যবস্থা হবে। আমাকে তিনি আগরতলায় ফিরে যেতে বললেন। আমি আগরতলায় ফিরে এলাম।

সম্ভবত আগস্ট কি সেপ্টেম্বরে আমি আবার কলকাতায় যাই। আগরতলায় আমার কাজ করতে কিছু অসুবিধা হচ্ছিল। তবু দাদা আমাকে আগরতলায় থেকেই কাজ করবার নির্দেশ দিলেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ফেনী ও বরিশাল অঞ্চলের 'বিএলএফ' ('মুজিব বাহিনী') সদস্যদের দেশের ভেতর থেকে নিয়ে এসে একত্র করে প্রশিক্ষণ শেষে অস্ত্রসহ তাদেরকে আবার দেশের ভেতরে গেরিলা যুদ্ধের জন্য পাঠাতে হবে। দেশের ভেতরে গিয়ে একজন দশজনকে 'রিক্রুট' করবে। তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেবে।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে। এসব নির্দেশনা তিনি আমাকে দিলেন।

অক্টোবর-নভেম্বরে আমি আরেকবার কলকাতা যাই এবং দেশের ভেতরে গিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছে প্রকাশ করি। দাদা জানালেন, ডিসেম্বরের মাঝামাঝির আগে আমার কোনোক্রমেই দেশের ভেতরে যাওয়া চলবে না। গেলে আমাদের নিজেদের ভেতরের লোকরাই আমাকে মেরে ফেলবে।

১৬ ডিসেম্বরের পর কয়েকদিন দাদার সঙ্গে যোগাযোগবিচ্ছিন্ন ছিলাম। বঙ্গবন্ধুর নিকট মুজিব বাহিনীর অস্ত্র হস্তান্তরের পূর্বে তিনি আমাকেসহ অনেককে বললেন, 'মনে রেখো যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। সমাজ পরিবর্তনের ঘোষিত লক্ষ্য সশস্ত্র যুদ্ধের আদর্শ অর্জন ও মুক্তিযোদ্ধাদের সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের লড়াই চলবে।'

## জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠন

সঠিক তারিখটা আমার মনে নেই। তবে ১৯৭২-এর প্রথমদিকে হবে। সেদিন আওয়ামী লীগের অর্থবিষয়ক সম্পাদক ইসলাম ভাই (নুরুল ইসলাম)-এর বাসায় দাদা (সিরাজুল আলম খান), মোহাম্মদ শাহজাহান, নূরে আলম জিকু ভাই, আমি, শাজাহান সিরাজ, নূরুল ইসলাম ভাই এবং আরও দুই-একজন (যাঁদের নাম এখন মনে করতে পারছি না) এক সভায় মিলিত হই। সেখানে দাদা বললেন, 'স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য ও স্বপ্ন সমাজতন্ত্র আওয়ামী লীগের দলীয় সরকার দিয়ে অর্জন করা সম্ভব হবে না। অতএব সমাজতন্ত্রের আদর্শভিত্তিক একটি রাজনৈতিক দল গড়ে তুলতে হবে।' তারপর এ বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে ঐ বাসায় ও আরও নানা জায়গায় ধারাবাহিকভাবে আমরা আলোচনায় মিলিত হতে থাকি। আমাদের ছাড়াও দাদা আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ করতেন। তাঁদের মধ্যে রুহুল আমিন ভুঁইয়া ও রহমত আলী ছিলেন অন্যতম।

১৯৭২-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে মেজর জলিল কারামুক্ত হবার পর তাঁর যে কোনো একটি রাজনৈতিক দলে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছে প্রকাশ করে পত্র-পত্রিকায় নানা সাক্ষাৎকার প্রকাশ হতে থাকে। সম্ভবত সেপ্টেম্বর মাসের এক সময়ে মুক্তিযোদ্ধা 'বিচ্ছু আলম'

(বরিশাল) দাদা ও আমাকে এসে বললো, আজ রাতে বা আগামীকাল মেজর জলিল কাজী জাফরের সঙ্গে দেখা করে ভাসানী ন্যাপে যোগ দেবেন। আমরা চাই না মেজর জলিল ভাসানী ন্যাপে যোগ দিন। আমরা চাই, সিরাজুল আলম খান ও আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বে কোনো রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটলে তিনি তার সঙ্গে থাকুন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাত্রলীগের অন্তর্দ্বন্দ্বের সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে।

বিচ্ছু আলম বলল, আজ রাতেই দাদা ও আপনার সঙ্গে মেজর জলিলের বৈঠক হওয়া প্রয়োজন। সে একটি বৈঠকের আয়োজন করলো। বৈঠক হলো। মেজর জলিল তখন পুরানা পল্টনে বরিশালের অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের পুত্র মনিরুল ইসলাম মনির বাসায় থাকতেন। ওখানে দাদা ও আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তিনি ভাসানী ন্যাপ-এ যোগ না দিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকতে রাজি হন। তার ন্যাপে যোগদান স্থগিত হয়ে যায়।

৩০ অক্টোবর ১৯৭২-এর সন্ধ্যায় এলিফেন্ট রোডে উড়োজাহাজ মার্কা মসজিদের পাশের বাড়িতে দাদা ও কাজী আরেফের উপস্থিতিতে মেজর জলিলকে সভাপতি করে শাজাহান সিরাজ, রহমত আলী, জিকু ভাই ও ইসলাম ভাইসহ জাসদের প্রথম কমিটি গঠন করা হয়। ঐ রাতেই তাজউদ্দীন আহমদের মন্ত্রিপাড়ার বাসায় সম্ভবত কমলাপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ময়েজউদ্দিন ( মেহের আফরোজ চুমকির বাবা) ও পুরনো ঢাকার রিয়াজুদ্দিন এ দুজনের সঙ্গে রাত ১২টা থেকে শুরু করে ভোর ৫টা পর্যন্ত বৈঠক চলে। এরা দুজন আওয়ামী লীগের মধ্যে তাজউদ্দীন সাহেবের সমর্থক ছিলেন। তাজউদ্দীন ভাইয়ের স্বভাব ছিল দীর্ঘ সভা চললে তিনি মাঝে মাঝে একটু ঘুমিয়ে নিতেন। ভোর হবার আগে আগে তাজউদ্দীন ভাই বললেন, 'সিরাজ সাহেব, শেখ মুজিব যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন আমার পক্ষে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল করা সম্ভব হবে না।'

একথা সত্য যে, সে সময়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের রাজনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল। পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের নজরদারি এড়াবার জন্য আমরা সূর্য ওঠার আগে আগেই তাজউদ্দীন ভাইয়ের বাসা থেকে বেরিয়ে আসি।

৩০ অক্টোবর আওয়ামী লীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা সিদ্দিক মস্টারকে গুলি করে মেরে ফেলে। দাদার পরামর্শ অনুযায়ী ৩১ অক্টোবর সিদ্দিক মাস্টারের লাশ পাশে রেখে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মেজর জলিলকে সভাপতি, আমাকে সাধারণ সম্পাদক ও শাজাহান সিরাজকে যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক করে জাসদের কমিটি ঘোষণা করা হলো। জাসদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে দলের আন্দোলন-সংগ্রাম সম্পর্কিত সকল বিষয়ে দাদার সঙ্গে আলোচনা ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। শুধু তাই নয়, আমি যতদিন এ দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছি এবং দাদা যতদিন বেঁচে থাকবেন জাতীয়-আন্তর্জাতিক কোনো বিষয়েই তাঁর মতামত ছাড়া আমার পক্ষে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাবনা নেই। কারণ, বাংলাদেশের সমাজ বিশ্লেষণে—বাঙালি সমাজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত বিচারে তাঁর চেয়ে বাস্তবধর্মী পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আর কারও আছে বলে আমার মনে হয় না।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ না করলেই নয়। সেটি গণবাহিনী প্রসঙ্গ। গণবাহিনীর সঙ্গে অনেকেই সিরাজুল আলম খান ও জাসদের সম্পৃক্ততার কথা বলে থাকেন। এ বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তিগতভাবে জাসদের কোনো কোনো নেতা বা কর্মী গণবাহিনীর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন, কিন্তু সাংগঠনিকভাবে জাসদের এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। যখন গণবাহিনী গঠিত হয় তখন আমি কারাগারে ছিলাম। আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। ব্যক্তিগতভাবেও আমি 'গণবাহিনী' গঠন ও এর কার্যক্রমের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতাম। আমি মনে করি, আমাদের দেশের মতো সমতল ভূমিতে রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর সমান্তরাল কোনো সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটানো, মুক্ত এলাকা গঠন ও তা টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

অনেকে বলেন, ১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ির সামনে রক্ষীবাহিনীর ওপর রমনা পার্কের ভেতর থেকে গুলি করা হয়েছিল। বলা হয় জাসদের লোকজনই তা করেছিল। ১৬ মার্চ রাতে দাদার সঙ্গে আমাদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হয়েছিল, আমরা পল্টন ময়দান থেকে মিছিল

নিয়ে প্রথমে খাদ্যমন্ত্রী ফণীভূষণ মজুমদারের বাড়িতে যাব। পরে সে সিদ্ধান্ত পাল্টানো হয়। ফণী বাবু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ, ফলে তাঁর বাড়িতে মিছিল নিয়ে যাওয়ার বিরূপ রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে ভেবে আমাদের কর্মসূচিতে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়। সিদ্ধান্ত হয় রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনের প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ মিছিলের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে। এর বাইরে কোনো সিদ্ধান্ত জাসদের ছিল না, এবং জাসদের মিছিল থেকে সেদিন কেউ কোনো গুলিবর্ষণ করেনি।

## পরিশিষ্ট : ২

# প্রশ্নোত্তর : আমেরিকায় শ্যামলিপি শ্যামার সঙ্গে

**প্রশ্ন :** আপনার পুরো নাম সিরাজুল আলম খান, কিন্তু রাজনৈতিক অঙ্গনে আপনি 'দাদা' নামেই অধিক পরিচিত। এ বিষয়ে আপনার অনুভূতি কী?

**উত্তর :** হ্যাঁ, এখন তো মনে হয় আমার আসল নাম সিরাজুল আলম খানের বদলে 'দাদা' নামটিই বেশি ব্যবহৃত হয়। আমি আরও লক্ষ্য করেছি, আমার পরিবার এবং অন্য পরিবারের অনেক বাবা-মা যেমন আমাকে 'দাদা' বলে ডাকে, তাদের ছেলেমেয়েরাও 'দাদা' ডাকে। বলতে পারো 'দাদা' শব্দটা এখন আমার নাম হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। আমার জন্ম ১৯৪১ সালের ৬ জানুয়ারি। নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার আলিপুর গ্রামে। বর্তমানে এটি চৌমুহনী পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের এখনকার বাড়িটিকে আমার বয়স দিয়ে হিসেব করা হয়। এর আগে আমাদের বাড়ি ছিল নোয়াখালীর দক্ষিণে শেষ প্রান্ত শান্তাসীতায়। সম্ভবত জায়গাটি এখন বঙ্গোপসাগরের তলদেশে কিংবা কোনো চরে পরিণত হয়েছে। 'শান্তাসীতা'র নাম অনেক বিখ্যাত লেখকের লেখায় পাওয়া যাবে। বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী লেখক বুদ্ধদেব বসুর বাল্য-কৈশোরের দিনগুলো কেটেছে সাগরবিধৌত নোয়াখালীর 'শান্তাসীতায়'।

আমার বাবার নাম খোরশেদ আলম খান। তাঁর জন্ম ১৯০৩ সালে। মৃত্যু ১৯৬৫ সালের ২৮ মার্চ। তিনি ছিলেন বিভাগীয় স্কুল

ইন্সপেক্টর। আমার মার নাম সৈয়দা জাকিয়া খাতুন। তাঁর জন্ম ১৯২১ সালে, মৃত্যু ১৯৯৬ সালের ২৬ নভেম্বর। আমরা ৬ ভাই ও ৩ বোন। ভাইবোনদের মধ্যে আমার স্থান দ্বিতীয়।

**প্রশ্ন :** আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সশস্ত্র যুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে লেখা বইগুলো সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?

**উত্তর :** যারা সশস্ত্র যুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে বই লিখেছেন বলতে গেলে তাঁদের কেউই ১৯৭১-এর মার্চ মাসের আগে পর্যন্ত স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়টি মাথায় রেখে রাজনীতি করতেন না বা সে লক্ষ্যে কোনো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেননি। একটি জাতির স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে দর্শন এবং আদর্শিক পটভূমির প্রয়োজন হয়, আমাদের তৎকালীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীরা কেন তা তৈরি করতে পারলেন না অথবা সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করলেন না, এটি তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিক সীমাবদ্ধতা নাকি জাতি হিসেবে বাঙালির তৃতীয় জাগরণকে অস্বীকার করা, তা এখনও নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না।

**প্রশ্ন :** 'তৃতীয় জাগরণ' বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?

**উত্তর :** বাঙালির'প্রথম জাগরণ'-এর কাল হোসেন শাহ ও শ্রীচৈতন্যের সময়—যা বেশীদিন ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। 'দ্বিতীয় জাগরণ' বা 'বেঙ্গল রেনেসাঁ'র সময় হলো উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংরেজি শিক্ষা চালু হবার পরে। কিন্তু তা-ও বেশীদিন ধরে রাখা যায়নি। সমাজবিদরা প্রায় ধরেই নিয়েছিলেন বাঙালির জীবনে আর জাগরণ আসবে না। পাকিস্তানি অথবা ভারতীয় হিসেবেই বাঙালির পরিচিতি এবং পরিণতি ঘটবে। কিন্তু বাঙালির স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে যুব সমাজের উদ্যোগে গঠিত 'নিউক্লিয়াস' তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদ ও সংস্কৃতিসেবীদের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের সীমাবদ্ধতা এবং তাদের মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে অতিক্রম করে বাঙালিকে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে মুখ্য ভূমিকা রাখে।

**প্রশ্ন :** 'মধ্যবিত্ত মানসিকতা' বলতে কী বোঝাতে চাইছেন?

**উত্তর :** ১৯৬০-'৭০ দশক ছিল বাঙালি জীবনে উজ্জীবনের 'দশক'। জাতিগত বিচ্ছিন্নতা এবং সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে উন্নত

জাতিগোষ্ঠীর জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে বিশ্বপরিসরে বাঙালি জাতিকে তুলে ধরার দশক। কিন্তু তৎকালীন বুদ্ধিজীবী মহল এ সহজ-সরল বিষয়টি উপলব্ধি করতে কেন যেন দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। সুতরাং স্বাধীনতার প্রশ্নে ছাত্র-যুব সমাজের যে উদ্যোগ গ্রহণ এবং চূড়ান্ত পরিণতিতে স্বাধীনতা অর্জন তা ছিল এক ধরনের সীমাবদ্ধতা নিয়ে গড়া স্বাধীন দেশের কাঠামো মাত্র। তার ওপর রয়েছে প্রত্যন্ত প্রদেশ হিসেবে এক হাজার বছর ধরে বাংলার অবস্থানগত বাস্তবতা। যে কারণে স্বাধীন রাষ্ট্রের উপযোগী শাসন কাঠামো বা নীতি প্রণয়নে বাঙালির যে দক্ষতার প্রয়োজন ছিল তা তখনও সৃষ্টি হয়নি। দেশ শাসন, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বা পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে এই সমস্যা দেখা যায়। ১৯৭১ সালের পর সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনায় অনভিজ্ঞ এবং অদক্ষ লোকেরা স্থান পেল। সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল শক্তি ও পেশার সমন্বয়ের পরিবর্তে শুধুমাত্র দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেশ পরিচালনার চেষ্টা চললো। একদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক সীমাবদ্ধতা, অপরদিকে রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় প্রাদেশিক এবং ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণার প্রভাব নিয়ে স্বাধীন দেশের যাত্রা শুরু হলো। একদিকে অনভিজ্ঞতা, অন্যদিকে রাজনীতির লক্ষ্য মানে কেবলমাত্র শাসক বা শাসকদলের পরিবর্তন—এই ধারণা নিয়ে পরিচালিত হলো একটি দেশ। আমরা আজো সেই ধারায় চলেছি। আমরা নিজেরাও এই সীমাবদ্ধতার ঊর্ধে নই। আবার আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যে এ সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন, তাও না।

**প্রশ্ন :** এর জন্য আমাদের সমাজব্যবস্থার ভিত্তিমূলে কোন দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতাকে আপনি চিহ্নিত করবেন?

**উত্তর :** আমাদের ব্যাপক জনগোষ্ঠী নিম্নবিত্ত অবস্থান থেকে উঠে আসা মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এটি অবশ্য সামগ্রিক অর্থে কোনো অপরাধ বা অন্যায় নয়। প্রত্যেক জাতির বেলায়ই এমনটি ঘটে থাকে। কিন্তু যারা এই সীমাবদ্ধতা ও দুর্বল সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থানের কথা অস্বীকার করে, তাদের জীবন আচ্ছন্ন হয় ঘোর অমানিশায় কিংবা এক ধরনের বিচ্ছিন্নতায়। এর ফল খুবই মর্মান্তিক। বাংলাদেশের ৪৭ বছরের অসহনীয় বাস্তবতাকে আমাদের এভাবেই বিচার-বিবেচনা

করতে হবে। আমাদের জনগণকে এ বিষয়টি স্মরণে রাখতে হবে যে, আমাদের নিম্নবিত্ত মানসিকতাকে স্বীকার করে এবং একে যোগসূত্র হিসেবে ধরে নিয়েই মধ্যবিত্ত অবস্থা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-চেতনাকে ধারণ করে আমাদের জীবনমান সাজাতে হবে। তাহলেই আমরা আমাদের সঠিক ইতিহাস খুঁজে পাবো। আর তখনই আমরা সামনের দিকে এগুতে পারবো। আমাদের ইতিহাসের অনেক খণ্ডিত দিক আছে। ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রেও রয়েছে অসংলগ্নতা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে লক্ষ্যহীন অনুকরণের ফলে তা জোড়াতালির রূপ নিয়েছে। এসব কিছুকে স্বীকার করে আমাদের অবস্থান নির্দিষ্ট করতে হবে।

আজকে পৃথিবীব্যাপী বাঙালিরা ছড়িয়ে আছে। কম বেশী সব দেশেই আমাদের অবস্থান রয়েছে। কিন্তু বাঙালির দেশ একটিই—সে হলো বাঙালির এই 'জাতিরাষ্ট্র' বাংলাদেশ। সুতরাং আমরা বাঙালিরা যে যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের এই নৃতত্ত্বভিত্তিক জাতিত্বকে স্বীকার করেই আমাদের অবস্থান। এমনিভাবে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছে চীনা ভাষাভাষী, ইংরেজ ভাষাভাষী, স্প্যানিশ ভাষাভাষী, আরব ভাষাভাষীরাসহ আরও অনেক জনগোষ্ঠী। এখন চলছে বাঙালির 'তৃতীয় জাগরণ'-এর কাল। এই 'তৃতীয় জাগরণ'-এর কালে আমরা যদি আমাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অর্থাৎ বাঙালি জাতিত্বকে সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে পারি, তাহলে আমরাও অন্যসব জাতির মতো একবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা গঠনে অংশীদার হতে পারবো।

স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সশস্ত্র যুদ্ধ বিষয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে, এ কথা সত্য। কিন্তু যেহেতু এসব বইয়ের রচয়িতারা কেউই ২৫ মার্চের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত 'স্বাধীনতা'র কথা ভাবতে পারেননি তাঁদের লেখায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়ে গেছে। এটা স্বাভাবিক। তাঁরা নিজের মতো করে যা দেখেছেন বা ভেবেছেন তাঁদের লেখায় সেসব বিষয়ই স্থান পেয়েছে। সশস্ত্র যুদ্ধের ইতিহাস লেখা অনেক বিশাল কাজ এবং তা অনেক সময়সাপেক্ষও। দীর্ঘদিনের গবেষণার মধ্য দিয়ে যদি কোনো লেখক-গবেষক বা ইতিহাসবিদ এ কাজে হাত দেন তবে অবশ্যই তাঁর পক্ষে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের যথার্থ ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস লেখা সম্ভব।

**প্রশ্ন :** বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে 'নিউক্লিয়াস'-এর সম্পর্ক ছিল কী?

**উত্তর :** ১৯৬০ দশকের মাঝামাঝিতে এমন একজন বাঙালি বুদ্ধিজীবীকেও পাওয়া যাবে না, যিনি জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে রাজনৈতিক সাহিত্য রচনা করেছেন। ১৯৬৫-এর পর আমাদের কোনো কবি, লেখক বা সাহিত্যিক স্বাধীনতা সংগ্রামকে উজ্জীবিত করতে পারে এমন একটি গল্প, উপন্যাস, কবিতা এমনকি একটি ছড়াও লিখেছেন এমন উদাহরণ পাওয়া যাবে না। যেসব লেখা পাওয়া যায় সেগুলো হলো শ্রেণীভিত্তিক লেখা। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লেখা। ১৯৭১-এর মার্চ মাসের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোনো লেখা দেখা যায়নি। 'নিউক্লিয়াস' ও 'বিএলএফ'-এর প্রভাবে সে সময়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের তরুণ সাহিত্য-সংস্কৃতি কর্মীরা এ দিক থেকে ব্যতিক্রম ছিল। তারা যেসব রাজনৈতিক সাহিত্য সৃষ্টি করেছে সেগুলোই ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রধান কাজ। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে কার্টুন তৈরি, পোস্টার লেখা, নিয়মিত দেয়াল পত্রিকা ও বিভিন্ন সম্মেলন উপলক্ষে ম্যাগাজিন প্রকাশ, জাতীয় দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ঢাকার আর্ট কলেজে শিল্পকর্ম প্রদর্শন—এসব কর্মকাণ্ডই ছিল ছাত্র-যুব সমাজের মতামত প্রকাশের প্রধান বাহন।

'নিউক্লিয়াস' নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দুজন বুদ্ধিজীবী সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তাঁরা হলেন, এডভোকেট কামরুদ্দীন আহমদ এবং ড. আহমদ শরীফ। ১৯৬০-এর দশকের প্রথম থেকে ১৯৭০-এর ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে যেসব বুকলেট, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ও পত্রিকা প্রকাশ হয় তার সবকিছুর তত্ত্বাবধানে ছিল 'নিউক্লিয়াস'। 'নিউক্লিয়াস'-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গাড়ির নাম্বার, দোকান-পাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড বাংলায় লেখার আন্দোলন সংঘটিত হয়। এ সময় গোপনভাবে 'বিপ্লবী বাংলা' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ হতো।

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতিতে বক্তব্য-বিবৃতি ও দলীয় সকল কার্যক্রম 'নিউক্লিয়াস'-এর উদ্যোগেই পরিচালিত হতো। এমনকি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মূল বক্তব্য 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' তিনি 'নিউক্লিয়াস' নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করেই দিয়েছিলেন। এ নিয়ে আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে 'নিউক্লিয়াস' নেতৃবৃন্দের মতবিরোধও হয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ভেঙে পড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বিভিন্ন ব্রিগেড বা কর্মী বাহিনী দিয়ে পরিচালনা করা, বিডিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসা সৈন্যদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা ও আস্তানা গড়ে তোলার উদ্যোগও গ্রহণ করেছিল 'নিউক্লিয়াস' ও 'বিএলএফ'। 'বিএলএফ' ছিল 'নিউক্লিয়াস'-এর রাজনৈতিক উইং।

**প্রশ্ন :** সশস্ত্র যুদ্ধ সম্পর্কে যে সব লেখালেখি হয়েছে সেই বিষয়ে আপনার অভিমত কী?

**উত্তর :** মধ্যবিত্ত মানসিকতায় আচ্ছন্ন কোনো লোকের পক্ষে আত্মজীবনীমূলক রচনা বা ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। প্রায় সবার ক্ষেত্রেই এ কথাটি প্রযোজ্য। এখানে যে সীমাবদ্ধতা কাজ করে তা হচ্ছে স্বভাবজনিত কারণেই আমাদের ভুলত্রুটি, দুর্বলতা, দৈন্য, সঙ্কীর্ণতা—মোটকথা যে-কোনো বিষয় বা ঘটনাকে বাড়িয়ে বলা বা ছোট করে দেখা। একইভাবে আবার কাউকে 'দেবতা' বানানো। এ জাতীয় দুর্বল মানসিকতাপূর্ণ আমাদের চিন্তা-চেতনা। বাস্তব সামাজিক অবস্থাকে অস্বীকার করে, নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া ও বিষয়বস্তুর গভীরতাকে আত্মস্থ না করে আত্মজীবনীমূলক রচনা বা ইতিহাস লেখা কি আদতে সম্ভব? আমাদের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে গুণগত শিক্ষা ও মানের যে অনগ্রসরতা, পশ্চাদপদতা ও দুর্বলতা রয়েছে তা কি আমরা জানি বা স্বীকার করি? দেশ-কাল-সমাজভেদে মূল্যবোধের যে ভিন্নতা হয় তা কি সত্যিসত্যি আমরা বুঝি? ধর্মীয় বা সামাজিক মূল্যবোধ যে সমার্থক নয়, সে ধারণা কি আমাদের আছে? এসব সীমাবদ্ধতা নিয়ে আত্মজীবনীমূলক রচনা বা ইতিহাস বিষয়ক লেখাকে আমি সাজানো বা সুন্দরভাবে গুছিয়ে মিথ্যা কথা বলার সমতুল্য বলে মনে করি। তবে কেউ যদি তার জীবনের কিছু ঘটনা নিয়ে জীবনকাহিনী লেখেন সেটি ভিন্ন কথা। পৃথিবীতে সেরকম স্মৃতিকথা বা আত্মজীবনী লেখকের সংখ্যা হাতে গোণা মাত্র। এসব কিছু বুঝেই আমি যদি কখনো কিছু লিখি তার শিরোনাম হবে 'আমার সীমাবদ্ধতা'।

**প্রশ্ন :** বাংলাকে কেন একটি প্রকৃত স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারা গেল না?

**উত্তর :** ১৯৪৭ সালের ভারতবিভক্তি সর্বস্তরের নেতৃত্বের মধ্যে এ ধারণা জন্ম দিয়েছিল যে, ধর্মই হচ্ছে উপমহাদেশের জনগণের জাতীয়তার ভিত্তি, ভাষা বা সংস্কৃতি নয়। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান জাতিভিত্তিক ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টি এ উপমহাদেশের রাজনীতিতে জাতিভিত্তিক নতুন দেশ সৃষ্টির শেষ কথা। এর অনেক আগেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু হয়েছে। সুভাষ বসু ১৯৪০ সাল পর্যন্ত থেকেও উঠতি পুঁজিপতি ও সম্প্রদায়িক শক্তি নিয়ন্ত্রিত ভারতের রাজনীতির ষড়যন্ত্রের শিকার। শের-এ-বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, শরৎ বসু, আবুল হাশিমদের রাজনীতি জিন্নাহ ও গান্ধীর রাজনীতির কাছে তখন পরাজিত। অবিভক্ত বাংলা গঠনের প্রথম চেষ্টা নিষ্ফল হওয়ায় পাকিস্তান ও ভারতকে মেনে নিয়েই রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত নিলেন সকলে। বুদ্ধিবৃত্তির জগতেও হিন্দুত্ব বা মুসলমানিত্বের প্রবণতা রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জগৎকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। পরপর কয়েকবার ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বিষয়টিকে আরও জটিল করে তোলে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিও ভারত-পাকিস্তানকে মুখোমুখি দাঁড় করাবার প্রতিযোগিতায় নামলো। একদিক থেকে এটি ছিল পাকিস্তান ও ভারতের জন্য বৃহত্তর অর্থে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। শিক্ষাব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও গণতান্ত্রিক পরিবেশের অভাব দুটি দেশের দূরত্বকে আরও বাড়িয়ে দিল। উপমহাদেশের শাসন পদ্ধতির ভিন্নতা, সর্বোপরি বুদ্ধিবৃত্তির শূন্যতা, আর সেই শূন্যতা পূরণ করার জন্য ভারতে বৈদিক হিন্দুত্ব আর পাকিস্তানি শাসকদের স্বকপোলকল্পিত ইসলামী ভাবধারা আমদানি করা হলো। ফলে উপমহাদেশের সার্বিক উন্নয়নে সৃষ্টি হলো জটিলতা, দেখা দিল রাজনৈতিক সংকট ও অস্থিরতা।

এতসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রাজনীতির একটি ভিন্ন ধারা কিন্তু প্রবহমান ছিল। উপরন্তু পূর্ব বাংলার উপর পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ আর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত এখানকার মধ্যবিত্তের চিন্তা-চেতনায় বাঙালি জাতিত্বের বিষয়টি আবার জাগিয়ে তুললো। অপরদিকে পশ্চিম বাংলার বাঙালিরা নিজেদের বাঙালির চাইতে

ভারতীয় হিসেবে পরিচয় দিতে বেশি গর্ববোধ করতো। তেমনি একটি পরিস্থিতিতে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার গণচেতনায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করলো। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের রায় বাঙালিত্বের পক্ষে যেন একটি ম্যান্ডেট হিসেবে ঘোষিত হলো। ভাষা যে জাতিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হতে পারে, অতীতের জাতিত্বের সংজ্ঞার সঙ্গে তা একটি নতুন বিষয় হিসেবে যুক্ত হলো। কিন্তু দলীয় কোন্দল, ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব এবং সামরিক শাসনের ফলে পুনরায় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাটি চাপা পড়ে যায় এবং উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো এবং সঠিক সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচির অভাবে বাঙালি জাতীয়তাভিত্তিক রাজনীতি পেছনে পড়ে যায়। এ পর্যায়ে পাকিস্তানভিত্তিক রাজনীতি করার বিষয়টি আবার প্রাধান্য পেতে থাকে।

**প্রশ্ন :** স্বাধীন বাংলা 'নিউক্লিয়াস'-এর শুরু কী করে হয়?

**উত্তর :** ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তানে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের দাবিতে বছর ধরে ছাত্র আন্দোলন চলে। কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী এ আন্দোলন আমার মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। এ আন্দোলন চলাকালেই আমি, আবদুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমদ আমরা তিনজন একে অপরের ঘনিষ্ঠ হই। স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা পরাধীন পাকিস্তানে সম্ভব নয়—এই উপলব্ধি আমাদের তিনজনের সম্পর্ককে আরও গভীর করে তোলে। আলোচনার এক পর্যায়ে স্বাধীনতার চিন্তাটি আমাদের আলোচনায় চলে আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সে সময়টিতে পরাধীন দেশগুলোর স্বাধীনতার জন্য আর্তি, এশিয়া-আফ্রিকার অনেকগুলো দেশের স্বাধীন জাতি হিসেবে অভ্যুদয়ের ঘটনাও আমাদের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। প্রাথমিক পর্যায়ে তৎকালীন পল্টনের আউটার স্টেডিয়ামে গভীর রাতে আমাদের বৈঠক হতো। সেসব বৈঠকের সূত্র ধরে পরে ইকবাল হলের মাঠে (টেনিস গ্রাউন্ড) স্বাধীনতা আন্দোলনের অঙ্কুর হিসেবে 'নিউক্লিয়াস' গঠন করা হয়। শুরুতে এতে আমরা চারজন সদস্য ছিলাম—আমি, রাজ্জাক, আরেফ ও আবুল কালাম আজাদ। আজাদ দুই বছর 'নিউক্লিয়াস'-এ সক্রিয় থাকার পর পারিবারিক প্রয়োজনে নিজেই অব্যাহতি নেয়।

অব্যাহতি নেওয়ার পরেও ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সে গ্রুপের একজন আন্তরিক ও একনিষ্ঠ সমর্থক হিসেবে আমাদের সহায়তা করেছে।

**প্রশ্ন :** 'নিউক্লিয়াস' ও ছাত্রলীগের পারস্পরিক সম্পর্ক কী ছিল?

**উত্তর :** ছাত্রলীগের অভ্যন্তর থেকে 'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য ছিল মূলত ছাত্রলীগকে শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে দাঁড় করানো। ছাত্রলীগকে 'নিউক্লিয়াস'-এর ছাতা হিসেবে ব্যবহার করা হতো এবং এর ছায়ায় থেকে গোপন কাজ করা অনেক সহজ ছিল। ১৯৬৫ সালে আমি জেল থেকে বেরোনোর পর 'নিউক্লিয়াস'-কে একটি রাজনৈতিক ছাপ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি। আর তা থেকেই 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' গঠন করা হয়। 'নিউক্লিয়াস' ও 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' ছিল আসলে একই সংগঠন। কাজের সুবিধার জন্য কখনও 'নিউক্লিয়াস', আবার কখনও 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নাম ব্যবহার করা হতো।

প্রথম দুই-তিন বছর বিপ্লবী পরিষদের কাজ ছিল সদস্য সংগ্রহ। মামুলি ধরনের রাজনৈতিক (মিছিল-মিটিং) কাজে সীমাবদ্ধ না থেকে তখন জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। স্বাধীনতার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে বই-পুস্তক সংগ্রহ ও পড়া বাধ্যতামূলক ছিল। সে সময়ে এসব বিষয়ের ওপর লেখা বইপত্র ছিল ইংরেজিতে, তা দুষ্প্রাপ্যও ছিল।

এ পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও ভিয়েতনামসহ কমিউনিস্ট আন্দোলনের ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ কম ছিল। এসব দেশ ও তাদের সমাজতন্ত্রের নীতিমালা স্বাধীন চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে সহায়তা না করলেও এসব দেশের ঘটনাবলী এবং তাদের সাহিত্য পাঠে আমি ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহী ছিলাম, অন্যদেরও পড়ার পরামর্শ দিতাম। তবে কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না।

**প্রশ্ন :** 'পূর্ণ স্বাধীনতা' ও পাকিস্তানের কাঠামোতে থেকে 'স্বায়ত্তশাসন'— ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে এই 'দুই ধারা' কীভাবে চলতো?

**উত্তর :** আমাদের কৌশল ছিল ছাত্রলীগের প্রধান নেতৃত্বেও পদ (সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক) যাতে স্বাধীনতার পক্ষের দখলে থাকে তা নিশ্চিত করা। দুজন না হলেও, একজন তো হতেই হবে। এই কৌশল 'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিও পক্ষে খুবই সহায়ক

হয়েছিল। ছাত্রলীগের তরফে তাদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিষয়টি প্রচারের ওপর গুরুত্ব দিতে বলতাম। জেলা পর্যায়ের ছাত্রলীগ সম্মেলনের পর ছোটখাট জনসভা করে পাকিস্তানি শাসকদের এই বৈষম্য-বঞ্চনার কথা প্রচার করতে বলতাম। সে সময় অন্য কোনো ছাত্র বা রাজনৈতিক সংগঠন আমাদের মতো করে এ বক্তব্য দিত না।

১৯৬৫ থেকে ৭১ সালের মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিরা পাকিস্তানভিত্তিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা উত্থাপন করার পর বামপন্থী রাজনীতিবিদরা ৬-দফাকে সমর্থন করা তো দূরের কথা, ৬-দফাকে সিআইএ-ও কর্মসূচি এবং শেখ মুজিবকে ভারতের এজেন্ট হিসেবে চিত্রিত করতো। এ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে একমাত্র ছাত্রলীগই পূর্ব পাকিস্তানের স্বতন্ত্র রাজনীতির পক্ষে শিল্প-সাহিত্য ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিল। ছাত্র ইউনিয়নেরও অনেকে যেমন আহমদ ছফা, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা প্রমুখ বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রামী ধারার শিল্প-সাহিত্য চর্চার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের তরুণ সংস্কৃতি কর্মীদের এই তৎপরতার মুখে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীরা এক রকম রাজনীতির আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। স্বাধীনতার পরে অবশ্য এই শ্রেণীটি তাঁদের অতীত কলঙ্ককে আড়াল করে আওয়ামী লীগের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডলে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। এ হলো সাপের খোলস বদলানোর মতো ব্যাপার।

**প্রশ্ন :** সে সময় শেখ মুজিব স্বাধীনতা সম্পর্কে কী ভাবতেন?

**উত্তর :** মুজিব ভাই ও আমার সম্পর্কেও গভীরতা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। যে কোনো আলোচনায় আমার অন্তর্ভুক্তি এবং তাঁর সার্বক্ষণিক সাহচর্যেও সুযোগ আমাকে বলতে গেলে তাঁর পরিবারের একটি অংশে পরিণত করেছিল। আলাপ-আলোচনায় তাঁকে আমি কোনোদিনই 'স্বাধীনতা' শব্দটি উচ্চারণ করতে শুনিনি। তাঁর আলাপ-আলোচনার বিষয় ও ধরন এত গভীর ও বহুমুখী ছিল যে, তিনি 'স্বাধীনতা' শব্দটি ব্যবহার না করলেও বক্তব্যের মর্মবস্তু যে 'স্বাধীনতা' তা বুঝতে কখনোই আমার অসুবিধা হয়নি। যে বুদ্ধিজীবীরা বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার ক্ষেত্রে দাস্য মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন, স্বাধীনতা'র বিরুদ্ধে

থেকেছেন, এখন তাঁরাই দেখি 'স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি'। এঁরা বলতেন, 'শেখ মুজিব তো স্বাধীনতা চাননি, ছাত্রদের চাপের মুখে তিনি স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যান।' মুজিব ভাইয়ের ব্যাপারে এই ধারণার আমি শুধু বিরোধীই নই, মুজিব ভাইয়ের কূটনৈতিক কৌশল অনেক সময় আমাকে অবাক করেছে। *গার্ডিয়ান* পত্রিকার এক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন : 'Do you declare Independence'? উত্তরে মুজিব ভাইয়ের দুই শব্দের 'Not yet' আমাকে অবাক করে দিয়েছিল। আমি কখনেই তাঁকে 'ধন্যবাদ' ইত্যাদি শব্দ দিয়ে কোনোকিছু বলতাম না। সাংবাদিক সম্মেলনের পর একই সঙ্গে মুজিব ভাই, আমিনুল হক বাদশা ও আমি ৩২ নম্বরে তাঁর বাসায় ফিরে আসি। আমি নিজেই তাঁর 'Not yet' প্রসঙ্গটি তুলতেই তিনি বললেন, 'খুশি হয়েছিস তো?'

মুজিব ভাই আমাকে কখনো কোনো কাজের জন্য ফরমায়েশ দিতেন না। তিনি বুঝতেন আমার চব্বিশ ঘণ্টাই ছিল রাজনীতির জন্য। জেল থেকে মুক্ত হয়ে রেসকোর্স ময়দানে জনসভার পর তাঁকে আমি আদমজি নগরে জনসভা করতে বললাম। জনসভা শেষে ফিরে আসার সময় আমি তাঁর জিপের বনেটের সামনে বাম্পারের ওপর বসে ছিলাম। আসার পথে দু'পাশে সারিবদ্ধ মানুষের হাততালি এবং মাঝে-মধ্যে ড্রাইভার ব্রেক কষে গাড়ির গতি হ্রাস করার এক পর্যায়ে আমি পড়ে গিয়ে গাড়ির তলায় চলে যাই। আমার হাত-পা কেটেছিড়ে যায়। পায়ের গোড়ালিতে বড় ধরনের ব্যথা পাই। তিনি চিৎকার করে গাড়ি থামাতে বললেন। আমাকে তুলে এনে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন। আমি তাঁর পাশে দাঁড়ানো। গাড়ি চলছে। আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে বললেন, 'সিরাজ, আজ যদি তোর কিছু হতো, আমার রাজনীতি শেষ হয়ে যেত।'

গাড়ি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এলো। এক্সরে ও ব্যান্ডেজ করা পর্যন্ত তিনি থাকলেন এবং গাড়িতে করে আমাকে এসএম হলে নামিয়ে দিয়ে দুদিন বিশ্রাম নিতে বললেন।

**প্রশ্ন :** ১৯৭০-এর নির্বাচনে কী ভূমিকা রেখেছিলেন?

**উত্তর :** ১৯৭০-এর নির্বাচন নিঃসন্দেহে ছিল আওয়ামী লীগের পক্ষে বিরাট গণরায়। মওলানা ভাসানী সে নির্বাচন বর্জন করার ঘোষণা

দিয়েছিলেন। ন্যাপ (মুজাফফর) নির্বাচনে অংশ নিলেও তারা ছিল শক্তিহীন। নির্বাচনী প্রচারণার শেষদিকে তারা অনেক জায়গায় আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের প্রতি সমর্থন দিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। ইয়াহিয়ার নির্বাচন ঘোষণার পরপরই আমরা (নিউক্লিয়াস) সিদ্ধান্ত নিলাম, গণআন্দোলনে জনগণের উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি ঘটে থাকে, সেটা প্রকৃত অর্থে জনমত নয়। জনমতের প্রমাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় নির্বাচন। অন্য কেউ নির্বাচনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের' পক্ষ থেকে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করি। আমাদের এই ঘোষণায় মুজিব ভাই খুবই খুশি হয়েছিলেন। নির্বাচনটা ছিল আমাদের রাজনীতির এক জটিল অধ্যায়, বিশেষ করে সে সময়কার নির্বাচন। এই নির্বাচনকে আমরা '৬-দফা ও ১১-দফা—না হলে ১-দফা' এ বক্তব্য ছড়িয়ে দেওয়ার উপযুক্ত সময় ও কৌশল হিসেবে গ্রহণ করি।

'নিউক্লিয়াস' ও 'বিএলএফ'-এর তিন হাজার সদস্যকে আমরা সে সময় প্রার্থীদের নির্বাচনী এলাকায় সার্বক্ষণিকভাবে থাকার নির্দেশ দিই। তাদের নির্বাচনী এলাকায় যাবার খরচটি আমরা সংগ্রহ করে দিতাম। তাদেরকে নির্বাচন পর্যন্ত বাকি সময়টুকু এলাকাতে থেকে একেবারে নির্বাচন শেষ করে ঢাকায় আসতে বলা হয়। মনিরুল ইসলামের (মার্শাল মনি) নেতৃত্বে ঢাকা থেকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এ কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়েছিল। ঢাকা শহরের দায়িত্বে ছিল কাজী আরেফ। নির্বাচনের সাত দিন আগে আমি মুজিব ভাইকে বলেছিলাম, আমরা ১৬৯ সিটের মধ্যে ১৬৭টিই পাবো। বিশ্বাস করার কথা নয়। তবে মুজিব ভাই মনে হয় বিশ্বাস করেছিলেন।

আমাদের আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল, এ নির্বাচনে ছাত্রলীগ থেকে বেরিয়ে আসা বড় একটি অংশকে মনোনয়ন দেওয়া। আমাদের পরামর্শ মতো মুজিব ভাই তাও করেছিলেন।

ঐ সময় আমার মনে হতো জনগণকে সংগঠিত করা ও জনসমর্থন আদায় করার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণভাবে আমাদের ওপর নির্ভর করতেন। আমি তখন তাঁকে আমার কোনো বক্তব্যের বিরুদ্ধে কিছু বলতে বা করতে শুনিনি বা দেখিনি।

আমি এও দেখেছি সংগঠনসহ বহু বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্নে তিনি বলতেন, 'ওটা সিরাজের কাছ থেকে জেনে নিস।'

**প্রশ্ন :** তখন আপনারা কোথায় কোথায় বসতেন?

**উত্তর :** ছাত্রলীগের এক বিরাট অংশ যারা 'নিউক্লিয়াস' ও 'বিএলএফ'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদেরকে নিয়ে প্রতিদিন গভীর রাতে গ্রুপ আকারে আমি, রাজ্জাক, মার্শাল মনি, মাহবুব, ইনু, আম্বিয়াসহ অনেকেই আমরা ভাগ ভাগ করে নীলক্ষেতের আনোয়ার হোটেল, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী হাসিনা হোটেল, পপুলার রেস্টুরেন্ট, কাফে কাশ রেস্টুরেন্টে বসতাম। সেক্রেটারিয়েটের পেছনে কিসমত ও আরেকটি রেস্টুরেন্টও আমাদের আলাপ-আলোচনার জন্য ব্যবহৃত হতো।

**প্রশ্ন :** জেনারেল জিয়াউর রহমানকে আপনি কীভাবে দেখেন?

**উত্তর :** ২৭ মার্চ, ১৯৭১-এ চট্টগ্রামের কালুরঘাট থেকে মেজর জিয়ার আহ্বান সে সময়ে হতাশাগ্রস্ত জনগণকে স্বাধীনতার ব্যাপারে আশান্বিত করে তোলে। স্বাধীনতা যুদ্ধেও পরিকল্পনা প্রণয়নের একেবারে প্রথম পর্যায়ে সেনাপ্রধান জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীর সঙ্গে তৎকালীন সেনাধ্যক্ষরা ও 'বিএলএফ' হাই কমান্ডের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় মেজর জিয়াউর রহমানও উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধ তখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। কেবল তারাই নন, আমরাও যে যুদ্ধেও জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, সে কথা ঐ সভায় তাদেরকে জানানো হলো। এ ছাড়াও ২৫ মার্চেও আগে 'বিএলএফ'-এর কার্যকলাপের প্রাথমিক ধারণাও সেনাপ্রধান ওসমানী সাহেব তাঁদের কাছে তুলে ধরেন।

যুদ্ধ চলার সময় জিয়াউর রহমানের সঙ্গে আমার আর কোনো দেখাসাক্ষাত হয়নি। ১৯৮১ সালের ৯ মে তিনি যখন প্রেসিডেন্ট তখন আরেকবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। সে মাসের ৩০ তারিখেই তিনি নিহত হন।

**প্রশ্ন :** জেনারেল এরশাদ সম্পর্কে কী বলবেন?

**উত্তর :** এরশাদের সঙ্গে আমার সব মিলিয়ে চারবার দেখা হয়েছে। প্রথম সাক্ষাতেই আমার ১৪-দফা কর্মসূচির প্রাথমিক খসড়া নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়। উপজেলাভিত্তিক প্রশাসন ব্যবস্থা আমার ও তাঁর উভয়েরই প্রস্তাবিত কর্মসূচি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁরই

দলের সংসদ সদস্যদের চাপে তিনি উপজেলা ব্যবস্থার বহু কিছুতে সংসদ সদস্যদের প্রভাব খাটানোর সুযোগ করে দেন, যা ছিল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য-বিরোধী।

পরের তিনবারের মধ্যে দুবার তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতে আলোচনার বিষয় ছিল, সংসদে উচ্চকক্ষ গঠন। মুখে মুখে তিনি এ বিষয়ে রাজি হলেও কোনো কিছুই করেননি।

আমাদের দেশের বড় বড় সেনাধ্যক্ষরা যুদ্ধ না করেই সেনাবাহিনীতে দীর্ঘদিন চাকুরিরত থাকার ফলে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে প্রমোশন পেয়ে পেয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল পর্যন্ত হয়ে যান। জেনারেল এরশাদকে আমার কাছে অন্য সেনাপ্রধানদের মতোই একজন বলে মনে হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমার তৃতীয় বৈঠকটি হয়েছিল প্রথম কুয়েত যুদ্ধের সময়। আমি তাঁকে বলেছিলাম, ভারতকে না জানিয়ে ঐ যুদ্ধে বাংলাদেশের পাঁচ হাজার সেনাসদস্যকে সৌদি আরবে পাঠানো এক বড় ধরনের ভুল সিদ্ধান্ত এবং এতে আন্তর্জাতিকভাবে কেউ কেউ খুশি হলেও তা ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তি বিরোধী। আর তাতে ভারত অসন্তুষ্ট হবে। পরবর্তীকালে এরশাদের পতনের পেছনে সুক্ষ্মভাবে হলেও এটি কাজ করেছিল। এ প্রসঙ্গে একটু বিশদভাবে জানতে চাইলে আমি এরশাদকে বলেছিলাম, আর এক মাস পর ভারত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বিকল্প সদস্য হবে। আমেরিকার কাছে আমাদের পাঁচ হাজার সৈন্যে পাঠানোর চাইতে নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের সমর্থনের প্রয়োজন অনেক বেশি।

শেষবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় তাঁর ক্ষমতা ত্যাগের একদিন আগে। বললেন, তিনি পদত্যাগ করছেন। আমি ঐ সাক্ষাতের সময় তাঁকে দুবার সেনাপ্রধান নূরুদ্দিনের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। দুবারই তিনি নূরুদ্দিনকে সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতা দখল করতে বলেন। নূরুদ্দিন তাঁর কথা শোনেননি।

## পরিশিষ্ট : ৩

# প্রশ্নোত্তর : শামসুদ্দিন পেয়ারার সঙ্গে

**প্রশ্ন :** প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কেমন ছিল?

**উত্তর :** প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আমাদের (বিএলএফ) সবার সম্পর্ক একই ধরনের ছিল না। শেখ মনি তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে আপোসহীন মনোভাব পোষণ করতো। কী কারণে তাঁর এ অবস্থান আমি আজ পর্যন্ত জানি না। অথচ মুজিব ভাই নিজেই আমাদের চারজনকে ডেকে তাজউদ্দীন ভাইয়ের সামনে বলেছিলেন, আমার অবর্তমানে তোমরা তাজউদ্দীনের সঙ্গে আলোচনা করে কাজকর্ম করবে।

অনেকে বাইরে থেকে আমার ও মনির মধ্যে শীতল সম্পর্কের আভাস পেতেন। কিন্তু কার্যত মনির সঙ্গে আমার শীতল সম্পর্ক অথবা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কোনো কারণই ঘটতো না। যুদ্ধের সময় তাঁর দায়িত্ব ছিল পূর্বাঞ্চলে। আমার দায়িত্ব ছিল উত্তরাঞ্চলে। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের দায়িত্বে ছিল আবদুর রাজ্জাক ও পশ্চিমাঞ্চলে তোফায়েল আহমেদ।

আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধের সব অর্থ সংস্থান করতো ভারত। ট্রেনিং দিত ভারত। অস্ত্র দিত ভারত। এফএফ-এর জন্য কত বাজেট, তা আমরা জানতাম না। 'বিএলএফ'-এর বাজেট আমরা তৈরি করেছিলাম সর্বমোট ৭৮ (আটাত্তর) লাখ ভারতীয় রুপি। এর মধ্যে ৫৬ (ছাপান্ন) লাখ আমাদের মাধ্যমে খরচ হয়েছিল।

অভ্যন্তরীণ সংকট কাটিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠনের প্রক্রিয়ায় আমরা ('বিএলএফ') সরাসরি জড়িত হয়ে তাজউদ্দীন আহমদ ও খন্দকার মোশতাক আহমেদের দ্বন্দ্ব সাময়িকভাবে হলেও নিরসন করেছি। প্রবাসী সরকারের প্রথম দিককার সবকটি সভায় আমরা (বিএলএফ-এর চারজন) উপস্থিত থাকতাম, যদিও সরকারের কোনো প্রকার পদ বা পদবি আমরা ধারণ করতাম না।

প্রবাসী সরকার গঠন এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয় গঠনের এক পর্যায়ে আমি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সামনে স্বাধীনতায় বিশ্বাসী আরও কয়েকটি দলকে নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করা সম্ভব কি না—এ বিষয়ে আলোচনা তুলতেই সৈয়দ নজরুল বলে বসলেন, 'কেন তারা সরকারে থাকবে?' আমি বললাম, তাতে স্বাধীনতার বিষয়টি দলের উর্ধে জাতীয় রূপ পাবে। আমি দুই-তিনবার কথাটা বললাম। তিনি আমার কথার উত্তর তো দিলেনই না, বরং বললেন, 'যাদের দশজন সমর্থকও নেই, তাদেরকে তুমি সরকারে নিতে বলো?' আমি তখন ন্যাপ (উভয়)-এর কথা বলতেই তিনি কটা করে বললেন, সরকারে যোগ দিতে হলে তাদের সাইনবোর্ড নামিয়ে আওয়ামী লীগে আসতে হবে। এক সময় মুজিব ভাইও এ কথাই বলতেন। কিন্তু মুজিব ভাইয়ের বলা এবং সৈয়দ নজরুলের বলার মধ্যে পার্থক্য ছিল। আমি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে বললাম, যুদ্ধ শুরুর দু'মাস পরে উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের চাইতে যুদ্ধের শুরুতে প্রবাসী সরকারের মধ্যে ন্যাপকে অন্তর্ভুক্ত করলে আজ ভারত-রাশিয়ার ডিকটেশনে চলতে হতো না।

আমরা চারজন বিভিন্ন বেইস এলাকা থেকে যখনই কলকাতায় আসতাম, প্রবাসী সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করতাম। তাজউদ্দীন আহমদ ছাড়া আর কাউকে খুব বেশি কাজে ব্যস্ত থাকতে কখনও দেখিনি। বাদবাকি মন্ত্রীরা যাঁর যাঁর এলাকার এমপিদেরকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। আমরা কোনো বিষয়ে মন্ত্রীর পরামর্শ চাইলে বলতেন, 'এসব ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনা না করে বলতে পারবো না।' এতে তাঁদের নিজেদের অক্ষমতা ছাড়াও ভারত সরকারের কাছে তাঁরা যে অস্তিত্বহীন সেটাই প্রমাণিত হতো। তাজউদ্দীন ভাইয়ের বিষয়টি ছিল একেবারে আলাদা। সকাল ৮টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত

বিরতিহীনভাবে কাজ করার দক্ষতা তাঁর ছিল। ভারত সরকার তাঁর সঙ্গেই নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করতো।

১৭ এপ্রিল প্রবাসী সরকারের মন্ত্রিসভা শপথ নেবার পরে কোলকাতায় ফিরে এলে আমি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর বক্তৃতা রাষ্ট্রপতির উপযুক্ত বক্তৃতা হয়েছে কিনা। আরও বললাম, তাঁর বক্তৃতায় মুজিব ভাইয়ের প্রসঙ্গটা কী ধরনের ছিল?

আমার প্রশ্নটা শেষ না হতেই তিনি যা বললেন, তাতে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। আমি এক কথায় বোকা বনে গেলাম। তাঁর সঙ্গে কথা বলার এক পর্যায়ে আমি উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। সে সময়ে আমার সঙ্গে তোফায়েল আহমেদও ছিলেন। আমরা দুজনেই বেরিয়ে এলাম। এরপর সৈয়দ নজরুলের সঙ্গে প্রায় দুই মাস পর দেখা। আমি একটু অসৌজন্যমূলকভাবে সালাম না দিয়েই সোফায় বসলাম। সৈয়দ নজরুল বললেন, 'সিরাজ কতদিন পরে আসলা? তোমার রাগ ভাঙতে এতদিন লাগলো?' এবার আমরা দুজন ছিলাম। কিছু জরুরি কথা বলে চলে এলাম।

প্রবাসী সরকারের অন্য মন্ত্রীদের সঙ্গেও দাওয়াত খাওয়া ছাড়া আর কোনো প্রয়োজনে আমার যাওয়া হতো না। মন্ত্রী হিসেবে তাঁদেরও কোনো কাজ ছিল বলে মনে হতো না। তাজউদ্দীন ভাইয়ের সঙ্গেই আমার যোগাযোগ ছিল। নিয়মিত আলাপ-আলোচনা হতো। রাত ১০টায় সাক্ষাৎ করার সময় দিয়ে কখনোই রাত একটার আগে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে পারতেন না। এতই ছিল তাঁর ব্যস্ততা। ওনার অফিসেই আমি সোফায় বসে আমি এ দুই-তিন ঘণ্টা কাটাতাম। প্রায় সাক্ষাতের দিনই এ রকম হতো। কাজ শেষ করে গোসল করতেন। খাবারে বসতেন আমাকেসহ। সামান্য খাবার খেতেন। তারপর দুই ঘণ্টার মতো কথা হতো। অফিস রুমের পেছনেই ছিল তাঁর শোয়ার ঘর। একটি পালঙ্ক। পরিপাটি বিছানা। এসব কাজে সহায়তা করার জন্য তাঁর একজন সহকারী ছিল। সকাল ৮টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে নাশতা খেয়েই কাজে বসে যেতেন। কোনরকম অবান্তর বা অবাস্তব কথা বলতেন না। আমাদের কাজ কেমন হচ্ছে বিস্তারিত জানতে চাইতেন না। ভালো হচ্ছে কি না এঁাই শুধু জিজ্ঞেস করতেন।

সরকার পরিচালনায় ভারতের সঙ্গে তাঁর সুবিধা-অসুবিধার কথা জিজ্ঞেস করলেই বলতেন, 'সিরাজ সাহেব, পরের উপর নির্ভর করে সংসারও চলে না, দেশ চালানো তো আরও অনেক বিরাট চ্যালেঞ্জ।' একটু বিস্তারিত জানতে চাইলে বলতেন, 'সুবিধার চাইতে অসুবিধাটাই বেশি। তবু কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।'

প্রত্যেক বারই আমি চলে আসার সময় বলতেন, 'সময় হয়তো বেশি দিতে পারি না। আসবেন। জরুরি কিছু করতে হলে জানাবেন।'

প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সে সময় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন নূরুল কাদের খান, মওদুদ আহমেদ, আনিসুজ্জামান, জেনারেল নূরুল ইসলাম শিশু (প্রধানমন্ত্রীর এডিসি) ও আমিনুল হক বাদশাসহ কয়েকজন।

**প্রশ্ন :** ভারতে 'বিএলএফ'-এর ট্রেনিং কীভাবে হয়েছিল? এর দায়িত্বে কে ছিলেন?

**উত্তর :** রতন-গগনদের বাড়িতে সিদ্ধান্ত হওয়ার পর আমি পিরোজপুর-পটুয়াখালী হয়ে খুলনার মোরলগঞ্জ থানায় সুমন মাহমুদ বাবুলকে রেখে (তার বাবা মোরলগঞ্জ থানার ওসি ছিলেন) লঞ্চে রাজবাড়ি ও কুষ্টিয়া হয়ে চুয়াডাঙ্গা গেলাম। সেখানে আবু ওসমান ও তৌফিক ইলাহি চৌধুরী (সাদি) আমাকে বললো, আপনাকে জরুরিভিত্তিতে কোলকাতা যেতে বলা হয়েছে। গেদে বর্ডার দিয়ে প্রথম পশ্চিম বাংলা যাই, সেখান থেকে ট্রেনে করে শেয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে কোলকাতায় পশ্চিম বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ (রাজ্য বিধানসভা) সদস্যদের আবাসিক হোস্টেলে যেতে প্রথমে নূরে আলম সিদ্দিকীকে পেলাম। আমাকে দেখে সে হতচকিত হয়ে গেল। তারপর আবদুল মালেক উকিল আমাকে নিয়ে ২১ ড. রাজেন্দ্র রোডে গেলেন। সেখানে আমি রাজ্জাক, তোফায়েল ও মনির দেখা পেলাম। এ ঠিকানাটি আগেই আমাদের ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য নির্দিষ্ট করা ছিল।

সাত-আট দিন পর মনি ও আমি আগরতলা গেলাম। সেখানে 'বিএলএফ'-এর অনেক সদস্যের সঙ্গে দেখা হলো। আমাদের সাময়িক যোগাযোগের ঠিকানা হিসেবে 'শ্রীধর ভিলা'কে ঠিক করা হলো। তিন-চারদিন পর আমি আবার কোলকাতায় ফিরলাম। তখন আমার গায়ে জ্বর। কোলকাতায় পৌঁছে বুঝলাম আমার জলবসন্ত হয়েছে। একটি

আলাদা রুমে আমাকে কোয়ারেন্টাইন করে রাখা হলো। খুব ছোট বেলায়, আমার বয়স যখন দশ-এগারো বছর, আমার একবার গুটিবসন্ত হয়েছিল। মনে আছে সুস্থ হবার আগে পর্যন্ত আমাকে মশারির নিচে থাকতে হয়েছিল।

চিত্তদার বাড়িতে তো আমাকে পুরোপুরিভাবে আলাদা করে রাখা হলো। দুজন নার্স সেখানে আমার দেখাশোনা করতো। বৌদি (মিসেস চিত্তরঞ্জন সুতার) খাবার তৈরি করে পাশের ঘরে দিয়ে যেতেন। মাছের ঝোল, ডিম—বসন্ত রোগীর খাবার যেমন হয়। একুশ দিন এভাবে আলাদা ছিলাম। বার-তের দিনের মাথায় চিত্তদার কাছ থেকে জানলাম দিল্লি থেকে একজন জেনারেল আসছেন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য। আমি, রাজ্জাক ও তোফায়েল একই বাসায় থাকি। চার-পাঁচদিন পর খবর পাঠিয়ে মনিকে আগরতলা থেকে আনা হলো। জেনারেল সুজন সিং উবান দূর থেকে আমাকে দেখে বললেন, তিনি দশ দিন পর এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন। এর মধ্যে আমি সুস্থ হলাম। ঠিক দশ দিনের মাথায় তিনি আসলেন। ইতিমধ্যে চিত্তদা আমাদের জানিয়েছেন, দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে জেনারেল উবানকে আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। আমাদের সবকিছুর দায়িত্বে থাকবেন তিনি।

আমরা তিনদিন ধরে ম্যারাথন সিটিং দিলাম। চিত্তদাও তাতে উপস্থিত থাকতেন। সামরিক বাহিনীর কোনো জেনারেলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ আমাদের জীবনে এই প্রথম। আলোচনার শুরুতেই আমরা বললাম, 'যুদ্ধ করার কোনো অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। কিভাবে কী করতে হবে তাও জানি না।'

হাসিমুখে জেনারেল বললেন, 'আমিও এক সময় কিছুই জানতাম না। শিখেছি। আপনারাও সব শিখে ফেলবেন।'

তাঁর এই কথায় এবং কথা বলার ধরনে আমরা কেবল আশ্বস্তই হলাম না, অবাক হবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস ও মনে অনেক জোরও পেলাম। তিনি সাদা কাগজে আমাদের কিছু করণীয় সম্পর্কে লিখে দিলেন। বুঝিয়েও দিলেন।

তিনি বলে গেলেন, আমাদের প্রাথমিক কাজ হবে বাংলাদেশের চারপাশ ঘিরে ভারতের যেসব এলাকা এবং বাংলাদেশ থেকে যে-যে

এলাকা দিয়ে ভারতে আসার স্বীকৃত সহজপথ রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করা। পূর্ব পাকিস্তানের একটি বড় ম্যাপ সংগ্রহ করা। ট্রেসিং করে ম্যাপ তৈরি করা। এবং বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন দিয়ে বর্ডার এরিয়ার বাংলাদেশের জেলাগুলো মার্কিং করা।

তিনি যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়গুলো এত সহজ করে আমাদের কাছে তুলে ধরলেন যে মনে হলো, দেশ যেন স্বাধীন হয়ে গেছে। তিনি আরও বললেন যে কোনো দেশের সেনাবাহিনীকে এভাবেই গড়ে তোলা এবং তাদের যুদ্ধের কৌশল এভাবেই ঠিক করা হয়। তাঁর কথা শুনে আমরা নিজেদেরকে অনেকটা হালকা ও আত্মবিশ্বাসী বোধ করলাম।

আলোচনা শেষে তিনি বললেন, সাত দিনের মাথায় তিনি আবার একদিনের জন্য আসবেন। বললেন, 'get ready for your war of Independence'। তিনি জাতিতে ছিলেন শিখ। ছয়ফুট দুই-তিন ইঞ্চি লম্বা। বয়স মধ্য-পঞ্চাশ। চুল-দাড়ি শিখদের মতো। সুঠাম দেহ। সুন্দর ইংরেজিতে কথা বলেন।

তিনি চলে যাওয়ার পরদিন চিত্তদা আমাদের জানালেন, দিল্লি থেকে বার্তা আছে। আপনাদের বিষয়টি দিল্লি অনুমোদন করেছে।

জেনারেল উবান আমাদের কাছে যে তথ্যগুলো জানতে চেয়েছিলেন তার একটা খসড়া ফিরিস্তি নিচে দেওয়া হলো :

১. বর্ডার এলাকার কোনো অঞ্চল দিয়ে ভারতে যাওয়া ও সেখানে 'রিক্রুট সেন্টার' করা হবে?
২. কতজনকে ট্রেনিং দেওয়া হবে?
৩. রিক্রুটমেন্ট সেন্টারের জন্য কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে?
৪. রিক্রুটমেন্ট সেন্টার থেকে কলকাতা, গোহাটি, আগরতলা, শিলিগুড়ি পর্যন্ত বিএলএফ সদস্যদের যাতায়াত খরচ ও খাবার বাবদ কত টাকার প্রয়োজন হবে?
৫. এই চার-পাঁচটি প্রধান কেন্দ্রে থাকা ও খাওয়া ছাড়াও অন্যান্য কী কী খাতে আনুমানিক কত খরচ হতে পারে?
৬. সশস্ত্র যোদ্ধাদের প্রত্যেককে জরুরি খরচের জন্য কত টাকা করে দিতে হবে?

৭. বর্ডার থেকে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত আর বিশেষ কাজে কত খরচ লাগতে পারে?

৮. বর্ডার এরিয়ার যারা শান্তি কমিটির সদস্য অথচ একই সঙ্গে আমাদের যুদ্ধের 'সহায়ক' তাদের জন্য কী পরিমাণ টাকা লাগতে পারে?

যোদ্ধাদের জন্য ট্রেনিং, অস্ত্র ও খাদ্য সরবরাহ ভারত সরকার করবে বলে ঐ খসড়াতে উল্লেখ করা হয়। বাকি ব্যাপারে যেন একটি খসড়া বাজেট আমরা আগে থেকে তৈরি করে রাখি।

সাত দিনে এসব কাজ সম্পন্ন করা প্রথমে আমাদের কাছে খুব দুরূহ মনে হলো। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের একটি ম্যাপ সংগ্রহ করতে আমাদের হিমশিম খেতে হয়েছিল। উপরন্তু সে ম্যাপের ট্রেসিং করা, জায়গা চিহ্নিত করার কাজগুলো তো ছিলই।

আমার এবং মনির ওপর সার্বিক দায়িত্ব পড়লো। বর্ডার এরিয়ার বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ক্যাম্প খোলার জন্য স্থান নির্ধারণের দায়িত্ব রাজ্জাক ও তোফায়েলকে দেওয়া হলো। জিপ গাড়ি, তেল, পথের খরচ, রাতে অবস্থান—এ সব ব্যবস্থাই রেডি করে দেওয়া হলো রাজ্জাক ও তোফায়েলকে। ম্যাপ সংগ্রহের পরে ট্রেসিং পেপারে তাদেরকে ম্যাপ-এর এক কপি দিয়ে দেওয়া হলো। আমরা চারজনই তখন দারুণ উত্তেজিত। ওরা দুজন বেরিয়ে পড়লো। তিনদিন পর ওদের ফিরে আসার কথা। এদিকে আমরাও কাজ শুরু করলাম। চিত্তদা সব সময়ের জন্য আমাদের সঙ্গে আছেন। ভারত সরকারের একজনকে আমাদের সাহায্যের জন্য দেওয়া হলো। পরে বুঝলাম তিনি খুবই একজন দক্ষ ব্যক্তি।

আমাদের কাজগুলো যে সহজ নয় তা বুঝলাম। কিন্তু কাজ করতে নেমে আমরা দারুণ উৎসাহ পেলাম। কাজ এগিয়ে চললো। ম্যাপ সংগ্রহ এবং ট্রেসিং পেপারে সুন্দর ও সামরিক অভিযানের পক্ষে ব্যবহারোপযোগী করে তা কপি করার কাজে ভারত সরকারের ঐ ব্যক্তির সহযোগিতা ভুলবার নয়।

তিনদিন পর রাজ্জাক ও তোফায়েল ফিরে এলো। চিত্তদাসহ আমরা চারজন বসলাম। হিসেব করে দেখা গেল, আমাদের সর্বমোট

৭৮ লক্ষ ভারতীয় রুপির প্রয়োজন হবে। এ হিসেবটি তৈরি করতেও ঐ ভারতীয় ব্যক্তি আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করেন। প্রথমে টাকার অঙ্ক বেশি ধরলেও চূড়ান্ত বাজেটে তা নামিয়ে আনা হয়।

দুদিনের মধ্যে দিল্লি থেকে খবর এলো আমাদের এই প্রাথমিক কাজের অনুমোদন পাওয়া গেছে। বাজেট ৭৮ লক্ষ ভারতীয় রুপি থেকে কমিয়ে ৫৬ লক্ষ রুপি ধরা হয়েছে। মনি ও রাজ্জাক এরপর আগরতলা ও গৌহাটি চলে গেল। আমি শিলিগুড়ির পাংগায় বাংলাদেশ সীমান্তের ৫০ গজের মধ্যে ক্যাম্প করলাম। এ জায়গাটিতে আগে বিএসএফ-এর ক্যাম্প ছিল। তেঁতুলিয়া বর্ডারের পাশেই ছিল এই পাংগা ক্যাম্প।

এই ব্যবস্থায় আমরা সর্বমোট সাত হাজার (৬,৮০০) 'বিএলএফ' সদস্যকে ট্রেনিং দিতে সক্ষম হয়েছিলাম।

**প্রশ্ন :** ৭ নভেম্বরের 'সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান' ব্যর্থ হলো কেন?

**উত্তর :** জাসদের বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবেই 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' ও পরবর্তীতে 'গণবাহিনী' গড়ে উঠেছিল। 'সিওসি' (সেন্ট্রাল অর্গানাইজেশন কমিটি) ছিল এসব কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র। জাসদের পরিকল্পনা অনুযায়ীই ৭ নভেম্বর 'সিপাহী অভ্যুত্থান' হয়েছিল। কিন্তু এই অভ্যুত্থান স্বল্প সময়ের মধ্যেই জাসদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সে সময়ে ক্ষমতার শীর্ষে বেশ কয়েকটি শক্তি অবস্থান করছিল। ১৫ আগস্টের নায়করা এক প্রকার আত্মসমর্পণ করে দেশ ছেড়ে চলে যায়। খন্দকার মোশতাক আহমেদের আশাও ভেস্তে যায়। জিয়াউর রহমান তৎকালীন সামরিক বাহিনীর মধ্যস্থলে গড়ে ওঠা ক্ষমতা কেন্দ্রের মধ্যে অবস্থান করে তাঁর শক্তিভিতকে সুদৃঢ় করেন। এই ক্ষমতা সংহত করার ক্ষেত্রে যাকে যাকে তাঁর বাধা মনে হয়েছে তাদেরকে তিনি নির্মূল করলেন। এভাবে ক্ষমতার লড়াইয়ে জাসদ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জাসদের রাজনীতিতে না হলেও বিস্তৃত সংগঠনে নেমে আসে বিশৃঙ্খলা। আমাদের দীর্ঘ পাঁচ বছরের কারাবাসকালে সংগঠনের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তা ও গ্রুপ-কেন্দ্র গড়ে ওঠে। রব ও জলিল তো আরও বেশি দিন কারাগারে ছিলেন।

**প্রশ্ন : আপনি 'কমিউনিস্ট লীগ' নামে কোনো সংগঠন গড়ার কথা ভেবেছিলেন কি? কিংবা এই নামে কখনো কোনো সংগঠন গড়েছিলেন?**

**উত্তর :** এ ধরনের কোনো সংগঠন গড়া তো দূরের কথা, আমি এর নামও শুনিনি।

**প্রশ্ন :** 'অখণ্ড স্বাধীন বাংলা' গঠনের সম্ভাবনায় কি আপনি তত্ত্বগতভাবে বিশ্বাস করেন?

**উত্তর :** 'অখণ্ড স্বাধীন বাংলা' একটি অলীক ধারণা। নেপাল-ভুটান, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহ, বাংলাদেশ, চীনের কুনমিং এবং মিয়ানমারের উল্টরাঞ্চল মিলিয়ে অর্থনৈতিক সহযোগিতামূলক ধারণাকে 'যুক্ত বাংলা', 'বৃহৎ বাংলা' ইত্যাদি গঠনের ষড়যন্ত্র নাম দিয়ে ও তার সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে অনেক কথাই বলা হয়েছিল। এই অভিযোগে ১৯৯২ সালে আমাকে কারারুদ্ধ করা হয়। আমার এই গ্রেফতারের ব্যাপারে বিএনপি, আওয়ামী লীগ এবং ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার একমত হয়েছিল। অবাক কাণ্ড, এখন বাংলাদেশ ও ভারত সরকার উভয়েই বিভিন্ন উপআঞ্চলিক জোট গঠন করছে এবং আমার প্রস্তাবিত সে সহযোগিতাভিত্তিক উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

প্রসঙ্গত ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতার লড়াইয়ের বিরাট অংশ জুড়ে আছে কলকাতা শহর ও সেখানকার মানুষের অবদান। ১৯৮১ সালে আমি যখন ইংল্যান্ডে যাই তখন লন্ডনকেও আমার কলকাতা শহরেরই ক্ষুদ্র একটি রূপ বলে মনে হয়েছে। এসব বিবেচনায় কলকাতাকে আমার ভালো লেগেছে। সেখানকার মানুষদের সঙ্গে মিশে বাঙালিকে কলকাতার চরিত্র দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছি। তাতে আমার জন্য শিক্ষণীয় অনেক কিছু ছিল। একই বাংলাভাষা, হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় পার্থক্য থাকলেও, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের প্রচুর মিল রয়েছে। কলকাতা আজ অবাঙালিদের দাপটের শিকার। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা সবকিছু তাদের দখলে। এমনকি বাংলাদেশের তুলনায়ও পশ্চিম বাংলা অনেকদিক থেকে পিছিয়ে আছে। যেমন : কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলাদেশ

আজ এগিয়ে। আলাদা স্বাধীন দেশ হওয়ায় বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি বাংলাদেশকে পশ্চিমবঙ্গের চাইতে অনেক দ্রুত গতিতে বিশ্বায়নের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এসব দিক বিবেচনায় বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক এগিয়ে আছে। যদিও সংস্কৃতি চর্চায় কলকাতা আমাদের তুলনায় নানাভাবে এগিয়ে আছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাসে এবং তারপরও আমি কলকাতাসহ সমগ্র উত্তর ভারত ভ্রমণ এবং হিমালয় পর্বতমালা দর্শন করি। বাংলাদেশের ছোট আঙিনা থেকে বেরিয়ে বৃহৎ পরিসরে এই পরিভ্রমণ আমার জ্ঞান ও চিন্তার পরিধি বিস্তারে সাহায্য করে। ১৯৯০ সাল থেকে আমি প্রতি বছরই (১৯৯২ বাদ দিয়ে) যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম এসব দেশে গিয়েছি। প্রত্যেকবারই এই সফরে বহুদিন কাটিয়েছি।

যেহেতু আমার এসব ভ্রমণ ছিল ব্যক্তিগত পর্যায়ে, ফলে সে সব দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং শিল্প-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ ধারণা লাভের সুযোগ হয়েছে। উত্তর আমেরিকায় 'বেঙ্গল স্টাডি কনফারেন্স' (বিএসসি)-এর সম্মেলনে যোগ দিয়ে আমার রাষ্ট্রবিষয়ক ধারণা ও চিন্তাকে বিদেশী পণ্ডিত ও বিদ্বানদের সামনে তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছি। এসব কনফারেন্সে আমি লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেছি। কনফারেন্স চলাকালে শ্রোতারা আমার বক্তব্য গভীর আগ্রহ সহকারে শুনেছেন ও আমার সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। এ রকম ঘটনা প্রতিবারই ঘটেছে, যতদিন পর্যন্ত বিএসসি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিএসসি-ও সর্বশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৬ সালে বাংলাদেশে। এর আগে বিএসসি কখনো যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে সম্মেলন করতো না। আমার এবং ড. জিল্লুর রহমান খানের প্রচেষ্টায়ই ঢাকায় প্রথমবার বিএসসি অনুষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে বিএসসি বন্ধ আছে। বিএসসি উপলক্ষ্যে দেওয়া আমার লিখিত বক্তব্য এ বছর (২০১৮) 'নির্বাচিত রাজনৈতিক রচনাবলী' আকারে প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় সাত বছরের নির্জন কারাবাস, তাছাড়া দীর্ঘকালব্যাপী আহার-নিদ্রার অনিয়মের কারণে কিছু কিছু কঠিন রোগ

আমার শরীরে প্রবেশ করেছে। শরীরে সর্বক্ষণই ব্যথা-বেদনা অনুভব করি। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে যাওয়া-আসার ফলে আমার সে সব রোগের চিকিৎসা করানো সুযোগ হয়েছে। বিদেশে এসব রোগের উন্নত চিকিৎসা আছে। গত ৩০ বছরে প্রতি বছরই আমি দেশের বাইরে গিয়েছি এবং এখনও যাই। এসব সফরকালে বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধ্যাপক এবং অন্য জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা থেকেও আমি অনেক কিছু জেনেছি ও শিখেছি। এসব দেশের কোনো সরকার বা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমি কোনদিনই কোনো যোগাযোগ করিনি। প্রয়োজনও বোধ করিনি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে ভারতের সঙ্গে আমার বা আমাদের যোগাযোগ, সেটার প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। স্বাধীন হবার পর ভারতের সঙ্গেও আমার সেরকম কোনো যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি।

এত বছর ধরে এভাবে বিদেশে যাওয়া-আসা এবং দীর্ঘদিন সেখানে থাকার জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে আমি আমার রাজনৈতিক সহকর্মীদের ওপরই নির্ভর করেছি। কোনো দেশের কোনো সরকারি অর্থায়ন আমার প্রয়োজন হয়নি। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিএসসি' হতো, সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে সম্মানী পেতাম। এটা শুধু আমার জন্য নয়, এসব কনফারেন্সে যাঁরা উপস্থিত হতেন সবাইকেই দেওয়া হতো। দেশের ভেতরে আমি যেমন খুব সাধারণ জীবন-যাপন করি দেশের বাইরেও আমার জীবন-যাপন ছিল সে-রকম।

**প্রশ্ন :** মওলানা ভাসানীকে কীভাবে দেখেন?

**উত্তর :** মওলানা ভাসানী এক ভিন্ন ধাঁচের মানুষ। ভিন্ন ধরনের রাজনীতিবিদ। ক্ষমতায় না গিয়েও রাজনীতির মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ সাধন মওলানা ভাসানীর অনন্য বৈশিষ্ট্য। পাকিস্তান সৃষ্টির আগে তিনি আসামের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। পাকিস্তান হবার পর রাজনীতিতে গণদরদী নেতা হিসেবে এমন নজির সৃষ্টি করলেন যার তুলনা অন্য কোনো দেশের রাজনীতিতেও দেখা যায় না। পাকিস্তান হবার পর পাকিস্তানিদের চক্রান্ত যদি একজন মানুষও বুঝে থাকেন তিনি হলেন মওলানা ভাসানী।

আমি তাঁর সঙ্গে মোট চারবার দেখা করেছি। কোনোটাই রাজনৈতিক বৈঠক ছিল না। সবগুলোই ছিল অনির্ধারিত। তিনি কী কারণে আমার চেহারা চিনে রেখেছিলেন, আমি বলতে পারবো না। চতুর্থবার দেখা হওয়ার সময় যাদু মিয়া ও তোয়াহা সাহেবের সামনে মওলানা ভাসানী বলেন, 'তোমরা যদি একজনও সিরাজের মতো হতে পারতা তাহলে আমি অনেক কিছু করতে পারতাম।' তিনি আরও বললেন, 'মুজিবের শক্তিই তো হলো সিরাজ'। তিনি কীভাবে এ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন আমি জানি না। ১৯৬৯ সালে অসুস্থতার কারণে তিনি ধানমন্ডিতে ডা. রাব্বির একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে এসেছিলেন। যাদু মিয়া নিয়ে এসেছিলেন। আমি তখন আদমজির শ্রমিক নেতা সাদুকে নিয়ে ঐ ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলাম। সে সময় তিনি ঐ মন্তব্য করেন।

মওলানা ভাসানী মানুষ হিসেবে অবশ্যই সৎ ও চরিত্রবান। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। রাজনীতিতে কাউকে তোয়াক্কা করে কিছু বলতেন না। শেখ মুজিবকে তিনি পূর্ব বাংলার রাজনীতির পক্ষের মানুষ হিসেবে গণ্য করতেন। শেষদিন পর্যন্ত তিনি মুজিব ভাইকে সাহস যুগিয়েছিলেন।

পল্টনের জনসভায় তাঁর বক্তৃতা আমি শুনেছি অনেকবার। জনসভায় তাঁর বক্তৃতা ছিল জনগণকে রাজনীতির 'কোচিং' করানোর মতো। কোনোরকম দুর্বোধ্যতার আশ্রয় না নিয়ে একজন ভালো অধ্যাপকের মতো তিনি রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে পারতেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিসহ নানা বিষয়ে তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারেও তিনি ভূমিকা রেখেছিলেন।

**প্রশ্ন :** হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

**উত্তর :** পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর স্বল্পকালীন কার্যকালে তিনি যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন ও ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে সফল হন। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। আইনজীবী হিসেবে ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। ছিলেন 'বিসিএল' ডিগ্রিধারী। তাঁর আগে

পূর্ব পাকিস্তানে আর কেউ বোধহয় 'বিসিএল' ছিলেন না। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা ছিলেন কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। মা ছিলেন মুসলমানদের মধ্যে প্রথম স্নাতক ডিগ্রি ধারিণী।

সবশেষে বলতে চাই, আমার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম ভাগে অর্থাৎ স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে সকল দল, মত ও পথের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমার পরিচয় ও সুসম্পর্ক ছিল। আমি তাঁদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করতাম। তারাও আমার সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন।

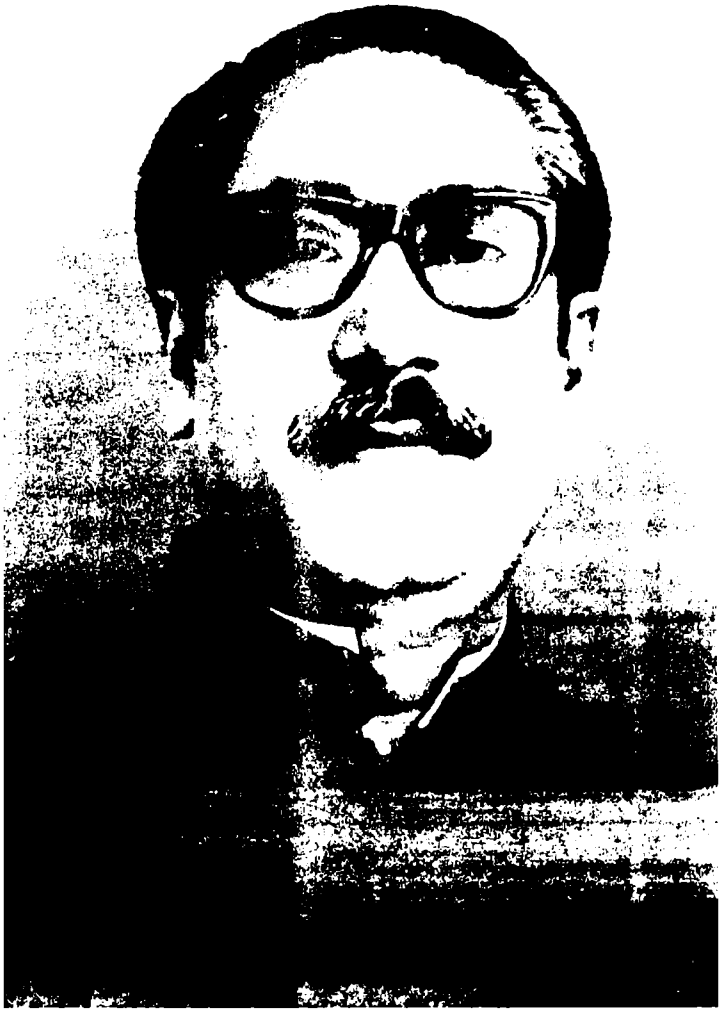

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সিরাজুল আলম খান ১৯৮০ -এর দশকে

শেখ ফজলুল হক মনি

আবদুর রাজ্জাক

কাজী আরেফ আহমদ

তোফায়েল আহমেদ

আ স ম আবদুর রব

আবদুল কুদ্দুস মাখন

নূরে আলম সিদ্দিকী

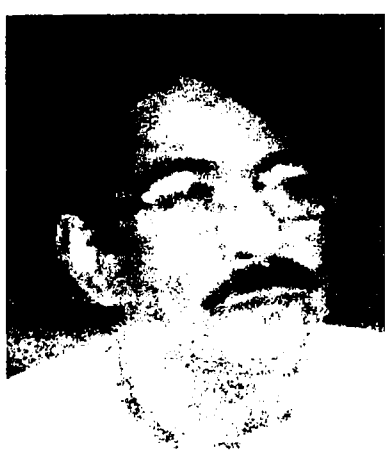

শাহজাহান সিরাজ

বঙ্গবন্ধুর সাথে (বাঁ থেকে) আবদুর রাজ্জাক,
সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমেদ ও শেখ ফজলুল হক মনি

ঢাকা স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধুর নিকট বিএলএফ -এর অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে

(বাঁ থেকে) সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি,
মেজর জেনারেল সুজন সিং উবান, তোফায়েল আহমেদ ও আবদুর রাজ্জাক

জেল থেকে মুক্তির পর ট্রেনে (১৯৮১)

কর্নেল আবু তাহের

সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে লেখক (২০১৮)